অগ্নিগর্ভা কাশ্মীর

এই লেখকের বই

হে অতীত কথা কও

হিমাদ্রির কোলে কোলে

বীক্ষণ

কিন্নর থেকে কাশ্মীর [যন্ত্রস্থ]

অগ্নিগর্ভা কাশ্মীর

অলকরঞ্জন পাল

সা হি ত্য লো ক

৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট । ক লি কা তা ৬

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৪০২ । অগাস্ট ১৯৯৫

প্রচ্ছদ : সত্যব্রত অধিকারী

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক । ৩১/৭ বিডন স্ট্রীট । কলিকাতা ৬

মুদ্রক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স । ৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলিকাতা ৬

কাশ্মীর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী
ভারতমাতার বীর সেনানীদের
উদ্দেশে

পরিচায়িকা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদানের উপস্থিতি খুবই বিরল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের জন্য মাত্র চারখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ! এগুলি হচ্ছে থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের জন্য বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিতম', পালরাজ রামপালের জন্য সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মণের (কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সমসাময়িক) সভাকবি বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহো', ও কাশ্মীররাজ হর্ষের জন্য কহ্লন লিখিত 'রাজতরঙ্গিণী'। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা অবশ্য ভুল হবে যে প্রাচীন ভারতে ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনার একেবারে অস্তিত্ব ছিল না। কেননা, কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' থেকেই আমরা জানতে পারি যে কহ্লন তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী রচনার জন্য এগারখানি প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছিলেন। তম্মধ্যে সুব্রত, হেলারাজ, ছবিল্লাকর ও ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থাদি প্রসিদ্ধ। সেগুলি সবই লুপ্ত। একমাত্র উল্লেখিত 'নীলমতপুরাণ' গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায়।

ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানে অবস্থিত কাশ্মীর রাজ্য প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানকালেও স্বাধীনতা লাভের পর কাশ্মীর রাজ্য রাজনৈতিক কলহের লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষিতটা আমাদের সকলেরই জানা উচিত বলে মনে করি। কাশ্মীরের ভাষা ইন্দো-ইরানীয় ভাষা-গুচ্ছের দরদীয় উপশাখার দক্ষিণতম উপশাখা। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃতের সংস্পর্শের কারণে, কাশ্মিরী দরদীয় বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণসমূহ থেকে মুক্ত।

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে ককেশীয় নরগোষ্ঠী তাদের আদিম বাসস্থান থেকে নানাদিকে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিল। ১৯৬৪-৬৫ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরের শ্রীনগরে নবোপলীয় যুগের আবিষ্কৃত এক কঙ্কাল থেকে আমরা জানতে পারি যে সে সময় তারা কাশ্মীরে এসেও উপস্থিত হয়েছিল। কেননা কাশ্মীরের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের (racial) সন্ধান পাওয়া যায়, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লম্বা মাথা, উন্নত নাসিকা, গোলাপী আভাবিশিষ্ট ফর্সা গায়ের রঙ। এগুলি সবই ককেশীয় জাতির লক্ষণ। নবোপলীয় যুগের প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে কাশ্মীরের বুরজাহোমে। রেডিয়ো কারবন-১৪ পরীক্ষায় এগুলির বয়স নির্ণীত হয়েছে ১৪১৮—১০৯০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। বুরজাহোমের নবোপলীয় যুগের লোকেরা মাটির তলায় গুহাগৃহে বাস করত। অন্তিম দশায় ধনুকে ব্যবহারের জন্য তামার বাণমুখ তৈরি করত। মৃতের সঙ্গে কুকুরকেও তারা সমাধিস্থ করত। (তুলনীয়, মহাভারতের

জতুগৃহে মাটির তলায় গুহাগৃহ ও পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে কুকুরের অনুগমন)।

আমাদের আলোচ্য পুস্তকখানির সূত্রপাত খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের তৃতীয় শতাব্দী থেকে। গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ অনুশীলনের সহিত বইখানি লিখিত। পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে লেখক পরপর হিন্দু রাজত্বকাল, মুসলমানদের আগমন, পুনরায় হিন্দু ও শিখদের আগমন এবং বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন।

গ্রীক অধিকার, মৌর্য অধিকার, যবন অধিকার, কুশান অধিকার, কারকোট (নাগ) বংশ, উৎপল রাজবংশ, যশস্কর ও গুপ্ত রাজবংশ, লোহার রাজবংশ, দেববংশ প্রভৃতি ১৫০০ বৎসরের হিন্দু রাজত্বের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করেছেন। ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান সামসুদ্দিনের আমলে কাশ্মীর মুসলমানদের হাতে চলে যায়। ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে কাশ্মীর মোগলদের হস্তগত হয়। মোগল শক্তি দুর্বল হলে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে রণজিৎ সিংহের আধিপত্যে শিখরা সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর দখল করে নেয়। পরে ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সন্ধি অনুযায়ী সিন্ধু নদের পূর্ব থেকে ইরাবতী নদীর পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল রণজিৎ সিংহের সেনাপতি ডোগরা বংশের গোলাব সিংহের হস্তগত হয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন কাশ্মীর ডোগরা বংশীয় নৃপতিদের হাতেই ছিল। ডোগরা বংশীয় নৃপতিরা পাকিস্তান বা ভারত কোন পক্ষে যোগদান করেনি। কিন্তু ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হলে, ১৯৪৭ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে ভারত সরকারের সহিত চুক্তি করে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এই নিয়েই পাকিস্তানের সহিত ভারতের বিবাদ ঘটে, এবং ভারত বিচারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হয়। ঠিক হয় যে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে উভয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করবে। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কাশ্মীরেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বিধানসভা গঠন করে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে সেই বিধানসভার অনুমোদনে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধে পাকিস্তানের সংগে ভারতের বিবাদ আজও চলছে। লেখক বিশেষ সমীচীনতার সঙ্গে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির যুক্তিসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

বইখানার এক চিত্তাকর্ষক অধ্যায় হচ্ছে ভারতে যীশুখ্রীস্ট। এই অধ্যায় থেকে যীশুখ্রীস্টের জীবনাবসানের উত্তরকালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে বলি বইখানি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে লেখা। কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকবৃন্দের কাছে বইখানি বিশেষ সমাদৃত হবে।

অতুল সুর

কৌতূহলও অতি বিষম বস্তু। কাশ্মীরকে নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে উদ্দেশ্যমূলক বিতর্ক চলছে, তার উৎস বুঝতে গিয়ে কাশ্মীরের সামগ্রিক ইতিহাস ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী একনজরে জানার মতো তেমন নির্ভরযোগ্য পুস্তক পেলাম না। যা আছে, তা প্রায় সবই বিভিন্ন সময়ের খণ্ডিত ইতিবৃত্ত সম্বলিত আকর পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা। তাই বর্তমানের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা কাশ্মীরের একটি অখণ্ড অথচ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনার খেয়াল চাপে। ফলে ইতিহাসের রত্নদ্বীপে আমার এই অনধিকার প্রবেশ। অনধিকার প্রবেশকারী হিসাবে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনে বলি, সেরকম যদি কিছু ঘটে, তা ঘটবে আমার আন্তরিকতার অভাবের জন্যে নয়,—আমার অজ্ঞতার জন্যে। উপদেশসহ ভুল-ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞ পাঠকের আদালত লেখককে ক্ষমা করে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রাখবেন—সেই আশাতেই এই জবানবন্দি।

কাশ্মীর নিয়ে কালবৈশাখীর সূত্রপাত ভারতভাগের কালবেলা থেকে। বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে কাশ্মীর নামক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরের অনুসন্ধানে উপত্যকার অখণ্ড সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে হয়েছে বর্তমানকে বোঝার প্রয়োজনে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির সময় এবং স্বাধীনোত্তরকালে সৃষ্ট গ্রন্থিগুলির রহস্যানুসন্ধানই এই গ্রন্থের মূলে উদ্দেশ্য। আমি যেহেতু কোনও দলের বা কারও তল্পিবাহক নই, নির্ভীক ও নিরপেক্ষদৃষ্টিতে আমার উপলব্ধি অনুসারে সমস্যাগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি,—কাউকে বা কিছুকে অকারণ আঘাত দেবার বা অমর্যাদা করার জন্যে নয়। সুতরাং আমার এই গ্রন্থের অন্তর্গত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ কোন ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল, জাতি, সম্প্রদায় বা কোন সরকারের কখনও পক্ষে,—কখনও বিপক্ষে যেতে পারে। আমি নিরপেক্ষ ও নির্ভীক হিসাবে তাদের সন্তুষ্টিমতে লিখতে গিয়ে আমার উপলব্ধিসঞ্জাত সত্যকে অস্বীকার করতে পারব না বলে কেবলমাত্র দুঃখ প্রকাশ করতে পারি।

আমার এই গ্রন্থ কোনও আকর পুস্তকের পর্যায়ে পড়ে না, কিংবা গবেষক ছাত্রদের প্রয়োজনেও লেখা হয়নি, অতি সাধারণ ভাষায়, সাধারণ বর্ণনা দিয়ে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে লেখা হয়েছে কাশ্মীর বিষয়ে সাধারণ বোধোদয়ের জন্যে; তা দিয়ে যদি কাশ্মীর রহস্য বুঝতে সুধী পাঠকমণ্ডলীর কিছুটাও সাহায্য হয়,—তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক।

সুদূর মফঃস্বলের একটি গণ্ডগ্রামে বসে এই ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার জন্যে দুর্লভ উপকরণ সংগ্রহ করা যে কি কঠিন কাজ তা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে

পারছি। আমার সেই দিশেহারা অবস্থা থেকে অনেকটা উদ্ধার করেছেন, বন্ধুবর নিরভিমান পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও গবেষক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র পাল এবং অগ্রজপ্রতিম শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ তাঁদের নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি সরবরাহ করে এবং পথনির্দেশ দিয়ে; তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত মর্ত্য ও অমর্তবাসী দিক্‌পাল ঐতিহাসিকদের, যাঁদের গবেষণালব্ধ রচনার সাহায্য না নিলে কিছুতেই এই গ্রন্থ আমি রচনা করতে পারতাম না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত বিজ্ঞজনের লেখার সাহায্য নেওয়ার জন্যে তাঁদের কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করছি।

জ্ঞানতপস্বী ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, শ্রদ্ধেয় ডঃ অতুল সুর মহাশয় একটি মূল্যবান পরিচায়িকা লিখে এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এছাড়াও, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের, যাঁরা আমাকে কেবল অতি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করেই ক্ষান্ত থাকেননি,—আমাকে পথনির্দেশ দিয়ে সঠিক পথে চলতে সাহায্যও করেছেন।

আজীবন সাহিত্যসেবী, নিরহঙ্কার স্থানীয় মাসিক পত্রিকা 'বন্দনা'র সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ ঘোষ, যিনি পাণ্ডুলিপির সংশোধনে, বিষয়বস্তুর অলঙ্করণে সাহায্য করে এবং গুরুসম উপদেশ দিয়ে আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে কাশ্মীর সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করে দেওয়ার জন্যে অগ্রজাপ্রতিম সহকর্মী শ্রীমতী গায়ত্রী ঘোষকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং একই কারণে আমার পুত্র শান্তনুকুমার পাল ও কন্যা মণিমালা পালকে আমার স্নেহাশিস জানাই। এছাড়াও লেখায় উৎসাহ ও সহযোগিতা দেওয়ার জন্যে সহকর্মী ও বন্ধু শ্রীনিমাইচাঁদ অধিকারী, শ্রীশক্তিসাধন ঘোষ, শ্রীনয়নরঞ্জন বসু, শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী পাল (রাউত)—এঁদেরকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

'সাহিত্যলোক' যে জ্ঞানের হাট বসিয়েছেন, সেখানে আমার মতো এক দীন পশারীকে এই অকিঞ্চিৎকর পশরা নিয়ে বসতে সুযোগ দেওয়ার জন্যে স্বত্বাধিকারী নিরহঙ্কার ও সদাশয় শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ মশায় আমাকে আজীবন ঋণী করে রাখলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চিত্রগুলি মুদ্রণের অনুমতির জন্যে আমি মুদ্রণপূর্ব নাম 'অবগুণ্ঠনবতী কাশ্মীর' হিসাবে চিত্রগুলির অধিকারী-দের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু মুদ্রণের সময় গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর নিরিখে প্রকাশক মশায়ের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রন্থটির বর্তমান নামকরণ হয়েছে। সুতরাং চিত্রমুদ্রণের অনুমতির ক্ষেত্রে 'অবগুণ্ঠনবতী কাশ্মীর' অর্থে 'অগ্নিগর্ভা

কাশ্মীর' বুঝতে হবে।

সবশেষে সুধী পাঠকমণ্ডলীর কাছে আমার বিনীত নিবেদন, এই গ্রন্থের মধ্যে যা কিছু মতামত প্রকাশ করেছি, তা একান্তই আকর পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভর করে। তা সত্ত্বেও যদি কোথাও ভুল-ত্রুটি ঘটে, তা ঘটবে আমার অজ্ঞতা তথা উপলব্ধির ত্রুটির জন্যে, যা আগেই বলেছি। তাই বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ,—আমার ভুল-ত্রুটিগুলি উল্লেখ করে নিচের ঠিকানায় মতামত জানালে তা সাদরে গৃহীত হবে, এবং পরবর্তী সংস্করণের সংশোধনে সেগুলি সহায়ক হবে।

জন্মাষ্টমী ১৪০২। অগাস্ট ১৯৯৫

গ্রাম: আকবপুর। পোস্ট: রাধানগর
জেলা: মেদিনীপুর। পিন: ৭২১ ২১২

অলকরঞ্জন পাল

বিষয়সূচি

মানচিত্রসূচি

চিত্রসূচি

১—৬ চিত্র মেসার্স ডি. বি. তারাপোরভালা
সন্স এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ বোম্বাই এবং
৭—১০ চিত্র আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী (প্রাঃ) লিঃ-র
সৌজন্যে প্রকাশিত।

প্রথম অধ্যায়

পৌরাণিক যুগ

(আনু: ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ—৩২৭ খ্রীঃ পূঃ)

পাণ্ডব ও পৌরববংশ (ঊর্ধ্বতন সম্রাট)

এবং

গোনর্দ বা গোনন্দবংশ (অধীনস্থ করদ রাজ্য)

রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে মহাস্থপতি ময়দানব নির্মিত-বিবিধ রত্ন ও চিত্রশোভিত স্ফটিক-নির্মিত সুবিশাল সভাগৃহে মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির মণিময় দেবদুর্লভ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট। সভায় উপস্থিত পরিবার সখা যদুপতি কৃষ্ণসহ অনুজগণ, মন্ত্রিগণ এবং অনুগত রাজন্যবর্গ। সভায় সর্বসম্মতভাবে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। উদ্দেশ্য,—খণ্ডিত ও পরস্পর বিরোধে লিপ্ত রাজশক্তিগুলিকে একই পতাকাতলে এনে এক অখণ্ড মহাভারত গঠন করা। এই মহান কর্মে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিরোধী রাজ্যগুলিকে পাণ্ডব অধিকারে নিয়ে আসা। সুতরাং মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর চার সহোদর ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে প্রত্যেককে চতুরঙ্গিণী সৈন্যসহ দিগ্বিজয়ের আদেশ দিলেন।

ভীম গেলেন পূর্বে। পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডক, চেদি, অযোধ্যা, কোশল, কাশী, মগধ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জনপদকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলেন। সেনাপতি নকুল পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে রোহিতক, মরুভূমি সৈরীষক, ত্রিগর্ত, মালব, পুষ্কর, দ্বারকা, মদ্র প্রভৃতি জনপদগুলিকে পাণ্ডব অধিকারে আনেন। সেনাপতি সহদেব দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে মথুরা, মৎস্য, নিষাদভূমি, কুন্তিভোজ, অবন্তী, কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, ওড্র, কেরল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ, উষ্ট্র, কচ্ছ প্রভৃতি রাজ্য জয় করে পাণ্ডব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

আর সেনাপতি অর্জুন? তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর গাণ্ডীবী তাঁর চতুরঙ্গিণী সেনাসহ উত্তর দিকে যাত্রা করে কুলিন্দ, কালকট, অমর্তদেশ, প্রাগজ্যোতিষ, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উপগিরি, বৃহন্তরাজ্য, উত্তরউলূক, মোদাপুর, বামদেব, সুদামন, দেবপ্রস্থ প্রভৃতি রাজ্য জয় করে কাশ্মীর দেশের উপকণ্ঠে এসে যখন স্কন্ধাবার স্থাপন করলেন, সেদিনের সূর্য তখন অস্তাচলগামী।[১]

এই সেই কাশ্মীর, কিংবদন্তী অনুসারে যার নাম ছিল কাশ্যপভূমি বা কাশ্যপ-মীর, যা কালক্রমে কাশ্মীর নামে রূপান্তরিত হয়েছে। মহামুনি কশ্যপের স্মৃতিতে এই ভূখণ্ডের নামকরণ। মহাভারত যুদ্ধের কত হাজার বৎসর পূর্বে কেউ জানে না, এই কাশ্মীর উপত্যকা ছিল একটি বিশাল হ্রদ; যেমন হিমালয় পর্বতের অবস্থান যেখানে, সেখানে ছিল টেথিস নামে সাগর। এই হ্রদের নাম ছিল

'সতী-সর' বা সতী-সাগর, যেখানে কশ্যপমুনি ও তাঁর স্ত্রী কদ্রুর সন্তান 'নাগ'গণ বাস করতেন। এবং এই হ্রদের জলেই মহাদেব-জায়া সতী শিবলোক থেকে জলবিহার ও স্নান করতে আসতেন। এখান থেকে শিবলোক বেশী দূরেও নয় [মৎলিখিত 'হিমাদ্রির কোলে কোলে' দ্রষ্টব্য]। এই হ্রদের নাম ছিল সতীসায়র বা সতীসর। কিন্তু নাগদের শান্তিতে বিঘ্ন দেখা দিল যখন 'জলোদ্ভব' নামে এক জলদৈত্য ঐ সতীসায়রে এসে নাগদের উপর অত্যাচার শুরু করল। তখন নাগরা মাতা কদ্রুর কাছে বিপদ থেকে রক্ষার প্রার্থনা জানালে মাতা কদ্রু স্বামী কশ্যপ মুনিকে তাদের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন। মহামুনি কশ্যপ তখন শুরু করলেন শিবের তপস্যা। শিব তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এবং কশ্যপের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে তাঁর ত্রিশূল দিয়ে পর্বতবেষ্টিত সতীসায়রের তলদেশে আঘাত করলে যে ফাটল সৃষ্টি হয়, তা দিয়ে সতীসায়রের জল বেরিয়ে গিয়ে যে বিশাল ভূভাগ সৃষ্টি হয়, তাই বর্তমানের 'কাশ্মীর উপত্যকা'।[২] সতীসায়রের জল বের হয়ে যাবার পর মাতা সতী একটি পর্বত তুলে নিয়ে জলোদ্ভবের মস্তকে আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। সেই পর্বতটিই বর্তমানের 'হরিপর্বত'। সেই নাগদের স্মৃতি বহন করে চলেছে অনন্তনাগ, ভেরীনাগ, শেষনাগ প্রভৃতি স্থানগুলি, যাদের উল্লেখ আমরা মহাভারতেও পাই। কিন্তু নীলমতপুরাণ অনুসারে জলোদ্ভব দৈত্যকে 'বিষ্ণু' হত্যা করেছিলেন।[৩]

সতীসায়রের জল সরে যাবার পর মহামুনি কশ্যপ এখানে ব্রাহ্মণদের এনে বাস করান। 'রাজতরঙ্গিণী'কে অনুসরণ করে 'আইন-ই-আকবরী'তে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তার কিয়দংশ এইরূপ, "...এই জল সরিয়া গেলে কশ্যপ চারিজন ব্রাহ্মণ আনিয়া কাশ্মীরে বাস করান। তাহার পরে ক্রমে যখন দেশে লোকসংখ্যা অধিক হইল, তখন একজন রাজার আবশ্যক হইল। তখন তাহাদের মধ্য হইতে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন একজনকে তাহারা রাজা করিল। সেই সময় হইতেই কাশ্মীরে রাজতন্ত্র প্রণালী স্থাপিত হয়।"[৪] এই সেই রূপকথার রাজ্য যেখানে রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দুর্গে সৈন্য-সামন্ত। রাজধানীতে মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র-পারিষদ। কোষাগারে মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। মাঠ-ঘাট-বাগান-বাগিচা ফুলে-ফসলে উপচীয়মান। অরণ্য ও লতাকুঞ্জ গায়ক পাখির সুমধুর স্বরে আকাশ-বাতাস সুরের আবেশে পরিপূর্ণ। প্রকৃতিরাণী তার বসন্তের অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে রাজ্যে চিরবন্দিনী। সেই রূপকথার রাজ্য, স্বপ্নের রাজ্যটির নাম 'কাশ্মীর', যাকে সমভূমির অধিবাসীরা মর্তের স্বর্গ বা 'ভূস্বর্গ' বলে। আইন-ই-আকবরীতে এই-ভাবে লিপিবদ্ধ আছে, "এই সুবায় চিরবসন্ত বিরাজমান। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এখানকার জল উৎকৃষ্ট, নানাজাতীয় পুষ্প সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকে, পৃথিবীর মধ্যে এমন সুন্দর ও মনোহর এমন উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই...।"[৫]

সেই কাশ্মীর উপকণ্ঠে মহাবীর অর্জুন যখন স্কন্ধাবার স্থাপন করলেন, তখন

সময় বরাহমিহিরকে অনুসরণ করে আনুমানিক ২৪৪৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দ।[৬] তবে রাজ-তরঙ্গিণীর সূত্র ধরে আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত এই মহাযুদ্ধের সময়কাল আনুমানিক ২৮৫৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। এ বিষয়ে 'আইন-ই-আকবরী'-তে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে তার কিয়দংশ, "…গোনান্দ বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৪৪৪* বৎসর পূর্বে রাজত্ব করেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মগধরাজ জরাসন্ধের মথুরায় যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে কৃষ্ণের ভ্রাতা বলদেবের হস্তে গোনান্দ নিহত হয়। পিতৃহন্তাকে শাস্তি দিবার জন্য গোনান্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ হারান। সে সময়ে তাঁহার মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। কৃষ্ণ সেই সন্তানের গর্ভস্থ সন্তানকেই রাজ্য দান করেন। এই পুত্রের নাম লব; ইনি লবপুর নগর সংস্থাপন করেন…।"[৭] এখানে উল্লেখ্য যে, গোনর্দবংশে লব একজনই আছেন এবং তিনি বংশের চল্লিশতম পুরুষ। গোনর্দ দ্বিতীয়ের পর ৩৫ পুরুষ শাসকের নাম কলহন উদ্ধার করতে পারেননি। সুতরাং গোনর্দের পুত্র লব কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ থেকে যায়। যাহোক, অর্জুন যখন কাশ্মীর বিজয়ে আসেন, তখন সম্ভবত কাশ্মীরে গোনর্দ দ্বিতীয় রাজত্ব করতেন। কারণ আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত গোনর্দ ও তার পুত্র যদি যথাক্রমে বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হন, তাহলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে গোনর্দ নিহত হন, তিনি গোনর্দ দ্বিতীয় হওয়াই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত কাদিয়ান কিছুটা ভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন বলেই মনে হয়।[৮]

কাশ্মীর বিজয়ের উদ্দেশ্যে সেনাপতি অর্জুন যখন কাশ্মীর উপত্যকায় আনুঃ ২৪৪৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে মতান্তরে আনুঃ ২৮৫৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে স্কন্ধাবার স্থাপন করলেন, পৃথিবী তখন জাগেনি; বর্তমান সভ্যতা তখন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। পাণ্ডবদের রথচক্র নির্ঘোষে কাশ্মীর থেকে দ্রাবিড়, গান্ধার থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ যখন প্রকম্পিত হচ্ছে, তখন একমাত্র ভারতবর্ষেই বর্তমান ছিল অতি সুপ্রাচীন প্রাক্‌মহাভারতীয় সুসভ্য আদিবাসী অনার্য সভ্যতা বা প্রাগার্যসভ্যতা, যার কিছু অংশের অবলুপ্তি হয়েছে এবং কিছু অংশ অন্তর্লীন হয়েছে যাযাবর আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে[৯]। অনার্য-আর্য মিশ্রিত এই নতুন ভারতীয় সভ্যতারই ধারক ও বাহক তখন মহাভারতে উল্লিখিত জনপদগুলি। পৃথিবীর অন্য কোনও অংশেই তখন সৃষ্টি হয়নি ধর্ম, যা এখন ধর্মব্যবসায়ীদের জ্বালায় পৃথিবীর মানুষের দিনের আহার ও রাতের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। সৃষ্টি হয়নি হিন্দু কি মুসলমান, জৈন কি বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কি ইহুদী। সৃষ্টি হয়নি জাত-পাত বিচার, শোষণ ও পুঁজিবাদ; সৃষ্টি হয়নি রাজনৈতিক দল, তাদের জটিল তত্ত্বের জটিলতম ফর্মুলা ও ধাপ্পাবাজ। জ্ঞানগর্ভ বুলি।

সে সময়ে কাশ্মীরে রাজত্ব করতেন গোনর্দ বা গোনন্দবংশীয় ক্ষাত্রবীর

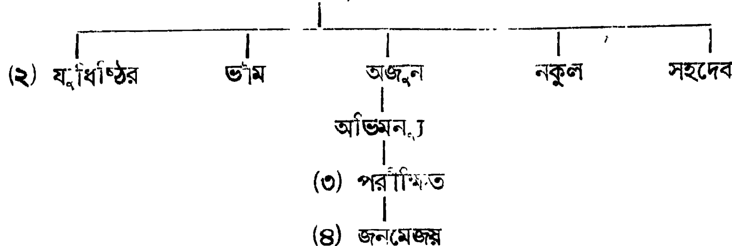
* আইন-ই-আকবরীর রচনাকাল ১৫৮৬ খ্রীঃ—১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। ধরা যাক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীতে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাহলে মহাভারতে উক্ত ঘটনাকাল (৪৪৪৪-১৫৯০) বা ২৮৫৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ।

গোনন্দ দ্বিতীয়। অনুমান করতে হয় তিনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে কর প্রদানে স্বীকৃত হলে কাশ্মীর রাজ্য পাণ্ডব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে গোনন্দ দ্বিতীয় পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করে বীরগতি লাভ করেন। গোনন্দের বংশধরগণ পাণ্ডব সম্রাট যুধিষ্ঠিরের পর অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত ও তৎপুত্র জনমেজয় পর্যন্ত 'পাণ্ডববংশের' অধীনে এবং জনমেজয়ের পর তিরিশ পুরুষ 'পৌরববংশের' অধীনে তথা ইন্দ্রপ্রস্থের অধীনে আনুঃ ৩২৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করে গেছেন।

মহাভারতে উল্লিখিত ও অর্জুন-বিজিত কাশ্মীর-ই যে আজকের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা কাশ্মীর,—এ বিষয়ে সন্দেহ কিংবা দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। সেদিনের ইন্দ্রপ্রস্থই যে আজকের দিল্লী, এ কথা স্বীকৃত সত্য। এই দিল্লীর উত্তরে 'কাশ্মীর' নামের দ্বিতীয় কোনও ভূখণ্ড নাই যেটা ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ মতান্তরে ২৮৫৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অর্জুন কর্তৃক বিজিত ও ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কাশ্মীরের অন্তর্গত যে স্থানগুলির নামের উল্লেখ দেখতে পাই, মহাভারতীয় যুগেও সেই সমস্ত স্থানের নাম মহাভারতে পাই। সুতরাং এ কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, মহাভারতে উল্লিখিত অর্জুন বিজিত কাশ্মীর রাজ্যই আজকের কাশ্মীর; যেখানে মহাভারতীয় তথা পৌরাণিক যুগ থেকে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের (আজকের দিল্লী) অধীনে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে রাজত্ব করে গেছেন ক্ষাত্রবংশসম্ভূত ভূপালগণ। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেও কাশ্মীর যে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, এ কথা অস্বীকার করতে হলে মহাভারতের ঐতিহাসিকতাকে, কলহনের কাব্য-ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী-কে, কাশ্মীরের সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারকে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিকে, আইন-ই-আকবরীকে এবং বর্তমানের গবেষকদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদিকে[১০] অস্বীকার করে উড়িয়ে দিতে হবে।

পৌরাণিক যুগ (২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ—৩২৭ খ্রীঃ পূঃ)

পাণ্ডববংশ / রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ



পৌরবংশ

(৪) জনমেজয়
|
(৭) নিচক্ষু
|
(২৬) উদয়ন

গোনন্দবংশ [ইন্দ্রপ্রস্থের অধীনে করদ রাজ্য]

(১) গোনন্দ প্রথম
|
(২) দামোদর প্রথম
|
(৩) যশোবতী
|
(৪) গোনন্দ দ্বিতীয়

পরবর্তী ৩৫ পুরুষ — নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই
|
(৪০) লব
|
(৪১) কুশ
|
(৪২) খগেন্দ্র
|
(৪৩) সুরেন্দ্র
|
(৪৪) গোধর
|
(৪৫) সুবর্ণ
|
(৪৬) জনক
|
(৪৭) শশীনর (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ)

প্রসঙ্গ পঞ্জী

১. মহাভারত (১ম খণ্ড) / অনুঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ / তুলিকলম / প্রথম সংস্করণ / জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ / পৃ. ২৫৪।

২. The Kashmir Tangle/Rajesh Kadian/Vision Books / Delhi 1992/p. 43.

৩. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society 1957 / p. 170.

৪. আইন-ই-আকবরী / বঙ্গানুবাদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯) / বসুমতী কার্যালয় কলিকাতা / পৃ. ৬৯।

৫. ঐ পুস্তক / পৃ. ৬৪।

৬. হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য / ডঃ অতুল সুর / সাহিত্যলোক / দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৪ / পৃ. ৫৭।

৭. আইন-ই-আকবরী / বঙ্গানুবাদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯) / বসুমতী কার্যালয় কলিকাতা / পৃ. ৬৯।

৮. The Kashmir Tangle / Rajesb Kadian / Vision Books—Delhi 1992 / p. 44.

৯, হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য / ডঃ অতুল সুর / সাহিত্যলোক / দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৪ / পৃ. ৪৮-৬২।

১০. বর্তমান / তাং ১।১১।১৯৯৩।

মহাভারত যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সমস্ত বিজ্ঞ ঐতিহাসিক নিঃসন্দেহ। কিন্তু সময়কাল সম্বন্ধে মতপার্থক্য থেকে গেছে। কবি ঐতিহাসিক কলহনের গণনা অনুযায়ী মহাভারত যুদ্ধের সময়কাল ২৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ; বরাহমিহিরের গণনা অনুযায়ী ২৪৬৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দ; সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের গণনা অনুযায়ী ১৪৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ এবং বি. এম. বিড়লা বিজ্ঞান কেন্দ্রের গবেষকরা প্রমাণ করেছেন বলে দাবি করেছেন যে, ঐ সময়কাল ১৩৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। তাঁরা সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন যে, মহাভারত যুদ্ধের সময় কাশ্মীরের সঙ্গে পাণ্ডবদের যোগ ছিল (বর্তমান / ১-১১-১৯৯৩)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রীক অধিকার

(৩২৬ খ্রীঃ পূঃ—৩২১ খ্রীঃ পূঃ)

বেদ-পুরাণ—মহাকাব্যের যুগে ভাষা-ছন্দ-হরফের প্রচলন হলেও কোনও লেখক-কবি-মহাকবি ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস লিখে রেখে যাননি ; ফলে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মহাভারতীয় যুগের পর ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস চিরান্ধকারেই থেকে গেছে, যা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে কিনা ভবিতব্যই জানে। তবে সীমিত ঐতিহাসিক উপকরণ যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থাদি থেকে যেটুকু জানতে পারা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ গ্রীক অধিকারে আসার পূর্ব পর্যন্ত—কাশ্মীরাধিপতি গোনন্দের বংশধররা ইন্দ্রপ্রস্থের অধীনে খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করে গেছেন ; যখন কাশ্মীর ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্গত গান্ধার (মতান্তরে কম্বোজ) মহাজনপদের অন্তর্গত ছিল। মহীয়সী গান্ধারী এই গান্ধার প্রদেশেরই কন্যা ছিলেন। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত কাশ্মীর ইন্দ্রপ্রস্থের অধীনে ক্ষাত্রবংশীয় রাজাদেরই অধিকারে ছিল।

৩২৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মে মাসে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালীন ক্ষাত্র-বংশীয় রাজা মহাবীর পুরু ঝিলাম ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী স্থানে রাজত্ব করতেন। আর্যাবর্তে প্রবেশ করতে গেলে এর চেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক স্থান ছিল না। তাই আলেকজান্ডার পুরুরাজ্যের উপর দিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। পুরু-রাজ্যের সংলগ্ন উত্তরে অবস্থিত কাশ্মীরে তখন খুব সম্ভবত ক্ষাত্রবংশীয় গোনন্দের কোন বংশধর রাজত্ব করছেন। এ ধারণা করা যায় যে, তৎকালীন কাশ্মীর নৃপতি গ্রীক শক্তির অধীনতা স্বীকার করায় সেখানে অল্প সময়ের জন্য হলেও গ্রীক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ—৩২১ খ্রীঃ পূঃ)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষক ডঃ সুনীলচন্দ্র রায় তাঁর 'Early History and Culture of Kashmir' গবেষণাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগের সময় কাশ্মীরের তদানীন্তন শাসক 'অভিসার'কে কাশ্মীর রাজ্যের শাসনকর্তা যথা-পূর্ব নিযুক্ত করে যান করদ রাজা হিসাবে।[১] কোনও রাজ্য স্বাধীনতা হারিয়ে করদ রাজ্য হতে গেলে সেই রাজ্য অন্য কোনও বৃহৎ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে অথবা বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেছে—এ ব্যাপার ঘটতে হবে। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এর কোনওটিও ঘটেছিল কিনা আমার পঠিত কোন আকর পুস্তকেই পাইনি। তবে যদি বিতর্ক এড়াতে ধরেও নিই যে, কাশ্মীর ঐ সময়ে গ্রীক অধিকারে এসেছিল,

তবে তা ছিল খুবই অল্প সময়ের জন্য, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাশ্মীর গ্রীক অধিকারে এসেছিল—এর প্রকারান্তরে উল্লেখ আছে আইন-ই-আকবরীতে। কাশ্মীরের পরশপুরা নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড দেবমন্দির ছিল। সেটি নাকি সেকেন্দার শাহ ভেঙে দেন। আইন-ই-আকবরীর ভাষায়,। "... পরশপুরায় জাফরাণের ক্ষেত্র আছে। এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড দেবমন্দির ছিল; সেকেন্দর শাহ সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলেন: ভগ্নমন্দিরের মধ্য হইতে একখানি তাম্রফলক বাহির হয়, তাহাতে দেব অক্ষরে এই কথা লিখিত ছিল যে, 'অদ্য হইতে এগারশত বৎসর পরে সেকেন্দর নামে একব্যক্তি এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবে'।"[২]

যদিও কাশ্মীর নন্দরাজাদের অধিকারে কোনদিন এসেছিল কিনা আমি প্রমাণ পাইনি, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে কাশ্মীর অধিকার করেছিলেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ৪৮৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভগবান তথাগতের মহাপ্রয়াণের সময় পর্যন্ত কাশ্মীর সহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এমনকি ৩২৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের ভারতআক্রমণ সময়েও কাশ্মীরে শান্তি বিরাজ করেছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং আনু ৩২০ মতান্তরে ৩২২ খ্রী পূর্বাব্দ নাগাদ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ সময়ে কাশ্মীর পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে প্রথমে পাণ্ডববংশ পরে পৌরববংশীয় সম্রাটদের অধীনে এবং তারপরে আলেকজান্ডারের অধীনে ক্ষাত্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করে গেছেন বলে সিদ্ধান্তে আসা যায়। কাশ্মীরে ঐ সময়ে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও তা হয়েছিল কেবলমাত্র সাতবৎসরের জন্য (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ—৩২০ খ্রীঃ পূঃ), অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটানো পর্যন্ত।[৩]

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society. 1957 / p 31.

২. আইন-ই-আকবরী, বঙ্গানুবাদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯,) বসুমতী কার্যালয় / পৃ. ৬৭।

৩. History of India 6th Edition, / V. Mahajan / S. Chand & Co (p) Ltd. p 167.

তৃতীয় অধ্যায়

মৌর্য অধিকার

(৩২০ খ্রীঃ পূঃ—১৮৭ খ্রীঃ পূঃ)

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অতি প্রাচীন যুগের কাশ্মীরের ইতিহাস কেউ ধারাবাহিকভাবে লিখে রেখে যাননি,—পরবর্তী সময়ে একমাত্র কবি ঐতিহাসিক কলহন ছাড়া। সুতরাং ঐ সময়ের ইতিহাসের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ; অলবেরুনীর 'কিতাব-উল-হিন্দ', মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা ; হিউয়েন সাঙ (৬৩১ খ্রীঃ), ও-কং (৭৫৯ খ্রীঃ), মার্কোপোলো (১২৫০ খ্রীঃ) প্রভৃতি ভ্রমণকারীদের ভ্রমণকাহিনী ; চীনসম্রাট কর্তৃক কাশ্মীরে প্রেরিত রাজপ্রতিনিধি 'চেন-টো-লো-পি-লো' এবং 'মিউ-টো-পি'-র লেখা বিবরণ ; বিভিন্ন সমসাময়িক সংস্কৃত সাহিত্য যেমন—বরাহমিহিরের (৫০০ খ্রীঃ) 'ভারতসংহিতা'. শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী', কাশ্মীরের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য 'নীলমতপুরাণ', ক্ষেমেন্দ্রের 'সময়-মাত্রক', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' ; গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও টলেমীর (১৫০ খ্রীঃ) লেখা বিক্ষিপ্ত বিবরণ ; প্রচলিত কিংবদন্তী ; বৌদ্ধ সাহিত্য এবং বিভিন্ন ভগ্নাবশেষ যেমন—স্থাপত্য, মুদ্রা, শিলালেখ ইত্যাদির ওপর।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ভয়াবহতা থেকে অন্তত একটা শুভ সূচনা হয়েছিল, যার ফল ছিল মৌর্যবংশের উত্থান ; যা পরবর্তীকালের ভারত-বর্ষকে সুদীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন সুশাসনে বেঁধে রেখেছিল। যার ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে অতুলনীয় সমৃদ্ধি ঘটেছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দবংশের শেষ সম্রাট মগধেশ্বর ধননন্দের কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নেন আনুমানিক ৩২২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে, যখন গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস সমগ্র পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানে গ্রীক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু সম্মুখে কোনও প্রবল শত্রু রেখে মগধের শাসন পরিচালনা অবিবেচনার কাজ হবে,—এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি নিয়ে চন্দ্রগুপ্তমৌর্য গ্রীক শাসনকে ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে উৎখাত করবার উদ্দেশ্যে সেলুকাসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে অগ্রসর হন। প্রায় আঠারো বৎসর যাবৎ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে চন্দ্রগুপ্ত ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান। এ বিষয়ে Dr. V. A. Smith-এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়,—"In the course of some eighteen years Chandragupta had expelled the Macedonian garrisons from the Panjab and Sind, repulsed and humbled Seleucus the Conqueror, and established himself as undisputed supreme Lord of at least Northern India and a large part of Ariana. These achievements fairly entitle him to rank among the grea-

test and most successful kings known to history."[১] যদিও Dr. V. A. Smith বিশদভাবে উল্লেখ করে যাননি 'at least Northern India' বলতে তিনি কোন্ কোন্ অংশ বা রাজ্য বলতে চেয়েছেন বা তার মধ্যে কাশ্মীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, তবুও পরবর্তী মৌর্য সম্রাটদের রাজত্বকাল ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী থেকে সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হয় না যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কাশ্মীরে পৌরব শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেখানে মৌর্য শাসনের সূচনা করেছিলেন। সময়টা খ্রীঃ পূঃ ৩২০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দের মধ্যে যে-কোন সময় হতে পারে।

খ্রীঃ পূঃ ২৯৮ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২৭৫ খ্রীঃ পূঃ তাঁর মৃত্যুর পর অন্যতম পুত্র অশোক ২৭২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর এই কয় বৎসর বিলম্বের কারণ হিসাবে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে অশোককে তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হতে এবং তাদের হত্যা করতে হয়েছিল,—তাই এই দেরী। অবশ্য পরবর্তীকালে অশোকের শিলালিপি থেকে এই ঘটনার কোনও আভাস পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ অশোক ভ্রাতাদের প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন—এই ধারণাই সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে কিভাবে 'চণ্ডাশোক' 'ধর্মাশোকে' পরিণত হয়েছিলেন, সে মহিমা প্রচারের জন্যও বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ বাড়িয়ে লেখা থাকতে পারে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস আমি লিখতে বসিনি ; কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কযুক্ত বিবেচনায় অনুষঙ্গ হিসাবে আমি কিছু বিষয়ে লিখতে বা আলোকপাত করতে বাধ্য। কাশ্মীর রাজ্যে শাসনের ধারাবাহিকতা হিসাবে আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি যে, খ্রীঃ পূঃ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর থেকে শুরু করে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থের অঙ্গরাজ্য হিসাবে পাণ্ডব বংশের চার পুরুষ এবং পরে পৌরব বংশের তিরিশ পুরুষ বা কাশ্মীরের স্থানীয় শাসক হিসাবে গোনন্দবংশের সাতচল্লিশ পুরুষ রাজত্ব করেছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অধিকারে আসার পূর্ব পর্যন্ত। কাশ্মীর রাজ্য যে মৌর্য অধিকারে এসেছিল এবং অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ২৩৬ অব্দ নাগাদ তাদের অধিকারে ছিল এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

কাশ্মীর রাজ্য যে গ্রীক অধিকারে এসেছিল এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে Dr. Roy তাঁর Early History and Culture of Kashmir গ্রন্থে McCrindle-এর লেখা 'The Invasion of India by Alexander the Great' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখে গেছেন,— "During the time of Alexander's campaign, Kashmir seems to have been under the rule of the king of Abhisara. He at first helped the chief of Assakenos against Alexander by sending military help but afterwards offered submission to the latter.

It is said that when Alexander, at the close of his campaign was returning from India, he left the king of Abhisara to rule over Kashmira with the state of Arsaces (Urasa Hazara) added to his kingdom."[২] এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় না যে, আলেকজান্ডার কাশ্মীর আক্রমণ করেছিলেন, যদিও আইন-ই আকবরীতে এর পরোক্ষ উল্লেখ পাই। যাহোক, বিতর্ক এড়াতে যদি ধরেও নিই, কাশ্মীরে গ্রীক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; তবে একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, তা খুব সামান্য সময়ের জন্যই হয়েছিল। 'খুব সামান্য সময়ের জন্য' বলা হচ্ছে এই কারণে যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তারপরেই গান্ধারসহ সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে গ্রীক অধিকারের অবসান করেছিলেন। যেহেতু কাশ্মীর তখনকার গান্ধার প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, গান্ধারের উপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ কাশ্মীরের উপরও মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে গ্রীক শাসনের অবসান যে ঘটিয়েছিলেন, একথা Dr. R C. Majumder তাঁর 'Ancient India' গ্রন্থে বলেছেন, "... it may be said, with far greater logic, that the triumph of Chandragupta over Seleucus demonstrated the inherent weakness of the greatest Hellenic armies when confronted with Indian skill and discipline."[৩] সুতরাং কাশ্মীর সহ সমগ্র গান্ধার-ই সেলুকাসের কাছ থেকে চন্দ্রগুপ্ত পেয়েছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার (খ্রীঃ পূঃ ২৯৯-২৭৫) পিতার সাম্রাজ্য বর্ধিত করতে না পারলেও রক্ষা করে গেছেন। যদিও তাঁকে 'অমিত্রঘাত' বা শত্রুদমন উপাধিতে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ভূষিত করে গেছেন, কিন্তু তিনি কোনও শত্রুকে দমন করে তাঁর পিতার সাম্রাজ্য বাড়িয়েছিলেন এ কথার প্রমাণ মেলেনি।

বিন্দুসারের পর তাঁর অন্যতম পুত্র অশোক (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩৬) মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। আমি কেবল তাঁর রাজত্বের সঙ্গে কাশ্মীর সম্পর্কিত বিষয়ের উপরই আলোকপাত করব। কাশ্মীর রাজ্য যে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। Dr. V. A Smith-কে অনুসরণ করে বলা যায়,—" ...The empire comprised the countries now known as Afganisthan, as far as the Hindukush, Beluchistan and Makran, Sind, Cutch (Kachchh), the Swat (Suwat) valley, with adjoining tribal territories, Kashmir, Nepal, and the whole of India proper, excepting Assam ; as far south as the northern districts of Mysore and part of north-west Madras—.[৪]"

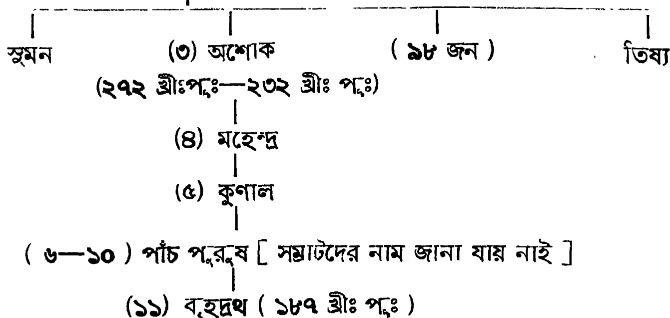
পুনরায় Dr. R. C. Majumdar-কে অনুসরণ করে বলা যায়, "The Empire of Asoke was not only vast in extent but was closely knit together as an administrative unit. One Imperial writ ran from Peshawar to Bengal, and from Kashmir to Mysore.[৫]" দেখা যাচ্ছে উভয় বিজ্ঞ ঐতিহাসিকই স্পষ্ট ভাষায় কাশ্মীর অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে উল্লেখ করে গেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে আমরা এও জানি যে অশোক বা তাঁর পিতা বিন্দুসার কোনদিন কাশ্মীরে অভিযান প্রেরণ করেন নি। তাহলে এই রাজ্যটি অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কি করে? নিশ্চয়ই তিনি তা পেয়েছিলেন পিতা বিন্দুসারের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে। আর বিন্দুসার পেয়েছিলেন তাঁর পিতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই; কারণ তিনিও কাশ্মীর জয় করেননি। সুতরাং নিশ্ছিদ্রভাবেই প্রমাণিত হয় যে, অবশ্যই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কাশ্মীর জয় করেছিলেন, অথবা গান্ধার থেকে গ্রীক আধিপত্য বিলোপ করার ফলে তাঁর অধিকারে এসেছিল।

সম্রাট অশোক যে তাঁর ধর্মবিজয় নামে পৃথিবীতে অভিনব উপায়ে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা উদাহরণশূন্য। তিনি তাঁর এই ধর্ম প্রচারের সূচনা করেছিলেন তাঁরই সাম্রাজ্যান্তর্গত ভারতের শিরোদেশে অবস্থিত কাশ্মীর থেকে। এই কাশ্মীরে দাঁড়িয়েই কি ভিক্ষু-সম্রাট আসমুদ্র হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত বুঝতে পেরেছিলেন একদা এই বৌদ্ধ ধর্মই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশের অধিবাসীর ধর্ম বলে আদৃত হবে? তিনি কাশ্মীরে ধর্ম প্রচারের জন্য অমাত্য মধ্যান্তিককে পাঠিয়েছিলেন,—এ কথা Dr. Mahajan দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন, "···He sent missionaries to the various parts of the world. Majjhantika was sent to Kashmir and Gandhara, Maharakshita to yavana or Greek country, Majjhima to Himalaya country, Dharmikshita (a yavana) to Aparantaka, Mahadharmarakshita to Maharashtra, Mahadeva to Mahisha-mandala or Mysore or Mandhata, Rakshita to Varanasi or North Kanara, Sona and Uttara to Suvarnabhumi or Pegu and Moulmein and Mahendra with Rishtriay, Uttriya, Sambala and Bhadrasara to Lanka or Ceylon····"[৬] সুতরাং এর পরও কি কারও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে যে, কাশ্মীর একদা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—কি ছিল না? সুবিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য, যার সূচনা করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২২ খ্রীঃ পূঃ) তা শেষ হয় ১৮৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে যখন মৌর্য-বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকে তাঁরই প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করেন (১৮৭ খ্রীঃ পূঃ)। সুতরাং বৃহদ্রথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় মৌর্য সাম্রাজ্য এবং সেইসঙ্গে কাশ্মীরের উপর মৌর্য অধিকার।

মৌর্যবংশ (৩২০—১৮৭ খ্রীঃ পূঃ)

(১) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২০ খ্রীঃ পূঃ—২৯৮ খ্রীঃ পূঃ)

(২) বিন্দুসার (২৯৮ খ্রীঃ পূঃ—২৭৫ খ্রীঃ পূঃ)



প্রসঙ্গপঞ্জী

১. History of India / V. Mahajan / S. Chand & Co. (p) Ltd/6th Edition / p. 167

২. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society / p. 31.

৩. Ancient India / Dr. R. C. Mazumdar / Motilal Banarsidas / Edition / 1964 / p. 106.

৪. History of India / V. Mahajan / S. Chand & Co. (p) Ltd. / 6th Edtion/ p. 175.

৫. Ancient India / Dr. R. C. Mazumdar / Motilal Banarsidas / Edition 1964 / p. 114.

৬. History of India / V. Mahajan / S. Chand & Co. (p) Ltd / 6th Edition / pp. 173-174.

চতুর্থ অধ্যায়

যবন অধিকার

(১৮৭খ্রীঃ পূঃ—১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

মৌর্যবংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশও দশ পুরুষ রাজত্ব করেন (১৮৭-৭৩ খ্রীঃ পূঃ)[১]। পুষ্যমিত্র যেভাবে তাঁর প্রভুকে হত্যা করে সাম্রাজ্য অধিকার করেছিলেন, ঠিক একইভাবে শুঙ্গবংশের দশম পুরুষ 'দেবভূমি'কেও মন্ত্রী বসুদেব হত্যা করে তাঁর সাম্রাজ্য অধিকার করেছিলেন।[২] এই দুই রাজবংশ যথাক্রমে ১১২ এবং ৪৫ বৎসর মগধ সাম্রাজ্যের অধিকার ভোগ করে। সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, কাশ্মীরের উপর এই দুই রাজবংশের আধিপত্য ছিল।

উক্ত দুই রাজবংশের পতনের পর অথবা শেষের দিকে কাশ্মীর ব্যাকট্রীয় গ্রীক সম্রাট ডেমিট্রিয়াসের অধীনে এসেছিল এ বিষয়ে অনুমান করা হয়। W. W. Tarn-এর লেখা 'The Greeks in Bactria and India' গ্রন্থকে অনুসরণ করে Dr S C. Roy লিখেছেন—

"...After the fall of the Maurya Empire, north-west India was subject to several foreign invasions and the valley of Kashmir could not possibly keep himself immune from these convulsions. Tarn suggests that for a few years Demetrius was the lord of a realm which included southern Kashmira. A fragment in Ptolemy (VII, 42) gives the names of two provinces in Menander's home kingdom east of the Jhelum of which Kaspeiria, the upper valleys of the Jhelum, Chenab, and Ravi would correspond to southern Kashmira.[৩]...

Dr. R. C. Mazumder এবং Dr. V. Mahajan উভয় ঐতিহাসিকই এই মতকে বহু পূর্বেই সমর্থন করেছেন।

এর পর কাশ্মীর সহ উত্তর পশ্চিম-ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যবনরাজ মিনান্দারের। তিনি ১৫৫ খ্রীঃ পূঃ থেকে ১৩০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কাশ্মীরের উপর মিনান্দারের যে আধিপত্য ছিল তা Dr. S. C. Roy-কে অনুসরণ করে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। Dr. Mahajan-ও প্রকারান্তরে একই কথা বলেছেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ মিনান্দারকে আলেকজান্ডারের চেয়েও বড় অভিযানকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মিনান্দারের পর তাঁর পুত্র স্ট্র্যাতো প্রথম এবং পৌত্র স্ট্রাতো দ্বিতীয় মিনান্দারের অধিকৃত সাম্রাজ্য শাসন করেন

সম্ভবত কুশান সম্রাট কর্দাফিস প্রথম (১৫—৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) উক্ত এলাকার অধিকার লাভের পূর্ব পর্যন্ত।

মৌর্যবংশের পতনের পর কুশান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত গান্ধার-সহ সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসনক্ষমতা বারেবারে পরিবর্তন হয়েছে প্রথমে পুষ্যমিত্রবংশ, পরে বসুদেববংশ, তারপরে ব্যাকট্রীয় গ্রীক সম্রাট ডেমিট্রিয়াসের বংশ এবং তারপরে মিনান্দারের বংশের হাতে ১৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৭ খ্রীঃ পূঃ থেকে ১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুশো বৎসরের কাশ্মীরের ইতিহাস পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ দ্বারা অনুমান করে বলা ছাড়া প্রমাণনির্ভর সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. History of India / V. Mahajan / S. Chand & Co. (p) Ltd / 6th Edition / p. 181.

২. ibid, p.198.

৩. Early History and Culture of Kasmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society / 1957 / p 32.

পঞ্চম অধ্যায়

কুশান অধিকার

(১৫ খ্রীঃ—২১০খ্রীঃ)

ও

অভিমন্যুবংশের অধিকার

(২১১ খ্রীঃ—৩৫০ খ্রীঃ)

যবনবংশের পর উত্থান হয় কুশানবংশের। কুশানবংশের প্রতিষ্ঠাতা চীনের ইউ-চি জাতির অধিনায়ক কদফিস প্রথম। এই কদফিস প্রথম বা কুজুলা কদফিস বা কোজোলা কদফিস ইউ-চি জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করে তাঁর অধিনায়কত্বে আনতে সফল হন। সময়টা কিছু কম-বেশি ১৫ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি দুর্ধর্ষ ইউ-চি সৈন্যদের নিয়ে কি-পিন বা গান্ধার এবং কাবুল দখল করেন। তারপর তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হয়ে সিন্ধু অতিক্রম করে সম্ভবত ঝিলম নদীর তীরস্থ কাশ্মীর পর্যন্ত অধিকার করেন। Dr. Smith-কে অনুসরণ করে V. Mahajan-এর ভাষায় বলা যায়, "...Kadphises I made himself the master of Ki-Pin (Gandhara) and Kabul territory. He also consolidated his power in Bactria. He also attacked the Parthians. His empire extended from the frontiers of Persia to the Indus or perhaps to the Jhelum..."[১]

কদফিস প্রথম প্রায় দীর্ঘ ৫০ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর পুত্র কদফিস দ্বিতীয় বা বীম কদফিস পিতার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। কদফিস দ্বিতীয় ৬৫ খ্রীঃ থেকে ৭৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্বকালীন উত্তর ভারতের আরও বেশ কিছু অংশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বীম কদফিস বা কদফিস দ্বিতীয়ের রাজত্বের অবসানে কুশান বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্ক (প্রথম) ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বীম কদফিসের শাসনের অবসানে কুশান বংশেরই কণিষ্ক (প্রথম) ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করলেও খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ কোন শিলালেখ বা মুদ্রায় কণিষ্কের (প্রথম) পিতার নাম জানতে পারা যায়নি ; যদিও তার পরবর্তী পুরুষদের কথা খোদিত আছে। যদি বীম কদফিসকেই কণিষ্কের (প্রথম) পিতা হিসাবে ধরে নিই, বোধ হয় খুব একটা অসঙ্গতি হবে না ; কারণ মধ্যেকার মাত্র তিন বৎসরের শাসনের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। এটা হতে পারে বীম কদফিসের কণিষ্কসহ একাধিক পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। যাহোক, কণিষ্ক (প্রথম) ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে এক সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসন করে গেছেন। মৌর্যসম্রাট অশোকের পরই কণিষ্ককে (প্রথম)

শক্তিশালী সম্রাট হিসাবে বলা যেতে পারে। কাশ্মীরের উপর কণিষ্ক প্রথমের যে নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। Dr. R. C. Majumdar-কে অনুসরণ করে বলা যায়, "...According to these he conquered the whole of Northern India including Kashmir and Magadha, and his power extended upto the borders of the desert of Gobi in Central Asia....".[২]

Dr. Smith-কে অনুসরণ করে V. Mahajan আরও বিশদ করে লিখেছেন, "...Kanishka can be given credit for having completed in his earlier years the subjugation and annexation of Kashmir. However, we do not have any details of his war with the Ruler of Kashmir. We are told that Kanishka had great preference for Kashmir. He erected a large number of monuments and also founded a town as Kanishkapura which is now represented by the village of Kanispor. The passage in the Rajatarangini of Kalhana is to the following effect : 'Then there were in this land three kings, called Hushka, Jushka, and Kanishka, who built three towns named after them....".[৩]

বিদ্যাধর মহাজনের উক্ত লেখা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে, কাশ্মীরের উপর সম্রাট কণিষ্কের (প্রথম) বিশেষ প্রীতি ছিল। যার ফলে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর কাশ্মীরে বহু বিহার, চৈত্য ইত্যাদি নির্মাণ করে গেছেন এবং তিনিই একমাত্র সম্রাট যিনি কাশ্মীরে শ্রীনগরের নিকট কুন্দনবনে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন।[৪] কাশ্মীরের উপর তাঁর কতোখানি আগ্রহ ছিল, এই একটি মাত্র উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। Dr. S. C. Roy-ও অনুরূপ মত পোষণ করে গেছেন, "...Kalhana's account of Turuska rulers indicates without doubt the Kusana occupation of the valley... According to the chronicler the valley of Kashmir was under the influence of the Buddhists during the Turuska rule. This is what we also learnt from Hiuen Tsang. The poet-historian assigns the celebrated Buddhist preacher Nagarjuna to this period.".[৫]

ইতিহাসের দিক্‌পালদের এই প্রসঙ্গে এতোগুলো উদ্ধৃতি দিলাম এই জন্য যে, কুশান যুগে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দুধর্মের পরিবর্তে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্যলাভ করেছিল এবং তা করেছিল কোনও চাপে বা শাসন-পীড়ন-প্রলোভনে নয়, বৌদ্ধধর্মের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণে। মৌর্যসম্রাট অশোক থেকে আরম্ভ করে কুশানসম্রাট কণিষ্ক পর্যন্ত কোনও শাসকই কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীদের ধর্মের উপর কণামাত্র অত্যাচার করেছিলেন তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। একথা অবশ্য ঠিক যে, কোন রাজা বা সম্রাটের রাজত্বে বসে তার বিরুদ্ধে লিখে কেউ নিরাপদে থাকতে পারবে, এটা ভাবা যায় না। কিন্তু ভারতীয় কবি-ঐতিহাসিকদের কথা বাদ দিয়েই এই মন্তব্য করা হচ্ছে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ,

কিম্বা চৈনিক পরিব্রাজকগণ স্বদেশে ফিরে গিয়ে যদি ভারতীয় সম্রাটদের বিরুদ্ধে লিখতেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের ভীতির কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁদের লেখা থেকেও কাশ্মীরে মৌর্য বা কুশান যুগে ধর্মের উপর অত্যাচার বা তার ফলে উপত্যকার অধিবাসীদের বাধ্য হয়ে বৌদ্ধ হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীরা প্রভাব, প্রলোভন বা শাসন-পীড়ন ব্যতিরেকে কেবল বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণে স্বেচ্ছায় বৌদ্ধ হয়েছিলেন এবং বৌদ্ধ ছিলেন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী শঙ্করাচার্যের (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষের দিকে) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত।

কুশান রাজত্বে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যের ও শিল্পের (গান্ধার শিল্প) প্রভৃত উন্নতি হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের দিক্‌পালগণ যে সমস্ত অনবদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করে গেছলেন, তার মধ্যে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', 'সারিপুত্র প্রকরণ' এবং 'বজ্রসূচী' ; নাগার্জুনের 'প্রজ্ঞা-পারমিতা', 'সূত্র-শাস্ত্র' ; বসুমিত্রের 'মহাবিভাস শাস্ত্র' এবং চরকের চিকিৎসা শাস্ত্র 'চরক সংহিতা' প্রধান (বিশদ বিবরণের জন্য সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গান্ধার শিল্প যদিও গ্রীক-রোমান ভাস্কর্যের কাছে ঋণী, তবুও তাতে ভারতীয় প্রভাবই বেশি ছিল। এ বিষয়ে অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক বর্তমানে একমত যে, মূল ভারতীয় ভাস্কর্যের উপর ভিত্তি করেই গ্রীক-রোমান ভাস্কর্যের মিশ্রিত সংস্করণ হিসাবে গান্ধার শিল্প গড়ে উঠেছিল। মহাজনের ভাষায়, "...Indian in theme, based on Indian tradition it (Gandhara Art) may even be said to be Indian to all intents and purposes, practically an offshoot of early Indian art transformed by powerful extraneous influence."[৬] কুশান সাম্রাজ্যে ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের এই প্রসঙ্গটুকু উত্থাপন করে রাখা হল কাশ্মীরের পরবর্তী ইতিহাসের পর্যালোচনার প্রয়োজনে।

কণিষ্ক প্রথমের রাজত্বের পর বশিষ্ক উত্তরাধিকারী হিসাবে কুশান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। বশিষ্কের পর তাঁর উত্তরাধিকারী বিষ্ক এবং তারপর কণিষ্ক দ্বিতীয়, বসুদেব প্রথম, কণিষ্ক তৃতীয়, বসুদেব দ্বিতীয় যথাক্রমে কুশান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বসুদেব দ্বিতীয়ের পর কুশান সাম্রাজ্যের পতন হয়। সময়টা আনুঃ ২১০ খ্রীষ্টাব্দ। কুশান সাম্রাজ্যের পতন হলেও তাদের বংশের একাধিক শাখা পঞ্চম শতাব্দীর শেষ নাগাদ টিকে ছিল বলে অনুমান করা হয়। এ বিষয়ে Dr. R. C. Majumdar বলেছেন, "...But the overthrow of the Kushan empire did not mean an end of the Kushana power in India. Kushana kings, known in history as the later Kushanas, and bearing the names of Kaniska and Vasudeva, ruled in Kabul and a part of the Panjab Valley for a long time. They

were ousted by another branch of the same clan, known as the Kidara Kushanas, who ruled in the same region till the 4th century A. D."[৭]

এ বিষয়ে মহাজন আরও বিশদ বলেছেন, "...Their existence in certain parts of the Punjab, North-Western Frontier Province and Kashmir in the 5th century is proved by the discovery of a large number of coins. However, it is difficult to say anything about the exact period of their rule, their order of succession and even the limits of their territory. Thus, it was that the Kushana empire faded away."[৮]

কুশান বংশের শেষ অধিপতি বসুদেব দ্বিতীয়ের (আনুঃ ২১০ খ্রীঃ) রাজত্বের পর হূন বংশের সূচনার (আনুঃ ৩৫১ খ্রীঃ) পূর্বে অর্থাৎ ২১১ খ্রীঃ থেকে ৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত অভিমন্যু নামে এক শাসক ও তার বংশধরেরা কাশ্মীরে রাজত্ব করে গেছেন বলে কবি ঐতিহাসিক কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ করে গেছেন। মহারাজ অভিমন্যুর আদেশে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' কাশ্মীরে আনা হয়েছিল। তিনি অভিমন্যুপুর নামে কাশ্মীরে একটি নগর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের রক্ষণ এবং আরও উন্নতি হয়েছিল। তারপর কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে গোনন্দ তৃতীয়, বিভীষণ প্রথম, ইন্দ্রজিত, রাবণ, বিভীষণ দ্বিতীয় এবং নর নামে নৃপতিগণ। নর-এর শাসনের পর অভিমন্যু বংশের পতন হয় (আনুঃ ৩৫০ খ্রীঃ)। এর পর শুরু হয় হূন বংশ (আনুঃ ৩৫১ খ্রীঃ)।

কুশান বংশ
(১৫ খ্রীঃ – ২১০ খ্রীঃ)

(১) কদফিস প্রথম (১৫ খ্রীঃ)
|
(২) বীম কদফিস
|
(৩) কণিষ্ক প্রথম
|
(৪) বশিষ্ক
|
(৫) হুবিষ্ক
|
(৬) কণিষ্ক দ্বিতীয়
|
(৭) বসুদেব প্রথম
|
(৮) কণিষ্ক তৃতীয়
|
(৯) বসুদেব দ্বিতীয় (২১০ খ্রীঃ)

অভিমন্যু বংশ
(২১১ খ্রীঃ – ৩৫০ খ্রীঃ)

(১) অভিমন্যু
|
(২) গোনন্দ তৃতীয়
|
(৩) বিভীষণ প্রথম
|
(৪) ইন্দ্রজিত
|
(৫) রাবণ
|
(৬) বিভীষণ দ্বিতীয়
|
(৭) নর প্রথম (৩৫০ খ্রীঃ)

প্রসঙ্গপঞ্জী

১, History of India / V. Mahajan / S. Chand & Co. (p) Ltd. / 6th Edition / p 224.

২. Ibid. p 219.

৩. Ancient India / R. C. Majumdar / Motilal Banarsidas / Edition 1964 / p 122.

৪. History of India / V. Mahajan / S. Chand & Co. (p) Ltd. / 6th Edition/ pp 222-223.

৫. Early Hfstory and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / Asiatic Society / p 33.

৬. History of India / V. Mahajan / S. Chand & Co. (p) Ltd / p 230.

৭. Ancient India / R. C. Majumdar / Motilal Banarsidas / Edition 1964 p 124.

৮. History of India / V. Mahajan / S. Chand & Co. (p) Ltd / p 228.

ষষ্ঠ অধ্যায়

হূন অধিকার

(৩৫১—৬০০ খ্রীঃ)

আনুমানিক ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে কার্কোট রাজবংশের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় তিনশো বৎসর হূন গোষ্ঠীর বিভিন্ন বংশের শাসকরা কাশ্মীরের শাসনক্ষমতায় ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তবে হূন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারণ কলহন এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু লিখে যাননি। সমকালীন প্রচলিত মুদ্রা থেকে এবং কিছুটা অনুমান করে বলা যেতে পারে যে, হূন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পুরুষ ছিলেন সম্ভবত সিন্ধ (৩৫১ খ্রীঃ)। তারপর হূন বংশের সবচেয়ে বিতর্কিত ও কলঙ্কিত শাসক মিহিরকুল বা মিহিরগুল ক্ষমতালাভের পূর্ব পর্যন্ত কাশ্মীরের শাসনকর্তা হন যথাক্রমে উৎপলাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকুল এবং বসুকুল। মিহিরকুল ছিলেন বসুকুলের পুত্র।[১] মিহিরকুলের শাসন ছিল উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে বিভীষিকা বিশেষ। শিবভক্ত মিহিরকুল বৌদ্ধ কাশ্মীরী প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন বলে কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিণীতে এবং হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। Dr. S. C. Roy তাঁর Early History and Culture of Kashmir গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে গেছেন, "... According to Chronicle of Kalhana Vasukula was succeded by his son Mihirakula. He was a cruel and ruthless warrior. He used to massacre thousands of human beings without any compassion for children, women or the aged.···The king ended his life by throwing himself into fire."[২] মিহিরকুলের পরবর্তী সময় অর্থাৎ কার্কোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দুর্লভবর্ধনের (৬৫১ খ্রীঃ) কাশ্মীরের শাসনক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত হূন রাজবংশের শাসনের ধারাবাহিকতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। Dr. S. C. Roy-এর ভাষায়, "···What happened in Kashmira on Mihirkula's death is difficult to collect or even to conjecture. ···So for another hundred years, the history of Kashmir remains shrouded in mystery, till the advent of Durlabhavardhana, when once again we step into the sober ground of history."[৩] তবে বিভিন্ন ছিন্ন সূত্র থেকে যেটুকু জানতে পারা যায় তা হল, মিহিরকুলের পর কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র বকা বা বাকা। বাকার পর ঐ বংশের পরপর যাঁরা কাশ্মীরের শাসনক্ষমতায় এসেছিলেন তাঁরা হলেন—ক্ষিতিনন্দ, বসুনন্দ, নর-দ্বিতীয়, অক্ষ,

গোপাদিত্য, গোকর্ণ, নরেন্দ্রাদিত্য এবং যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের পর হূন বংশ লোপ পেয়েছিল কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ এরপর যে শাসক কাশ্মীরের শাসনক্ষমতায় এসেছিলেন তাঁর নাম প্রতাপাদিত্য। তিনি ছিলেন উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের আত্মীয়। প্রতাপাদিত্য এবং তাঁর পরবর্তী চার পুরুষ যথাক্রমে জলোকস, তুঞ্জিন, বিজয় ও জয়েন্দ্র কাশ্মীরের শাসনক্ষমতায় এসেছিলেন। তারপর শাসনক্ষমতা যায় মেঘবাহন নামে অন্য এক হূন শাসনকর্তার অধীনে। মেঘবাহনের পর তার বংশের শ্রেষ্ঠসেন এবং হিরণ্য পরপর কাশ্মীরের শাসন পরিচালনা করেন। হিরণ্য যখন কাশ্মীরের সিংহাসনে, তখন তার ভ্রাতা তোরমান বিদেশে ছিলেন। হিরণ্যের মৃত্যুর পর তোরমানের পুত্র প্রবরসেন দ্বিতীয় খুল্লতাতের উত্তরাধিকারী হিসাবে কাশ্মীরের সিংহাসন বসেন। অবশ্য হিরণ্যের মৃত্যুর পর কাশ্মীরের সিংহাসন যাতে শূন্য না থাকে সেজন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্য মদ্রগুপ্ত নামে এক ব্যক্তিকে কাশ্মীরের সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে পাঠান।[১] এটা খুবই কৌতুক ও কৌতুহলের বিষয় যে, বিক্রমাদিত্যের এক আত্মীয় প্রতাপাদিত্য কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তার সাত পুরুষ পরে বিক্রমাদিত্যেরই একজন মনোনীত ব্যক্তি মদ্রগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেছিলেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন মনে ভিড় জমায়—(১) বিক্রমাদিত্য ক'জন ছিলেন? (২) বিক্রমাদিত্যের আত্মীয় এবং মনোনীত ব্যক্তিরা (সাত পুরুষ পরে) যদি কাশ্মীরের সিংহাসনে তাঁর ইচ্ছায় বসতে পারেন, তাহলে কাশ্মীর কি উজ্জয়িনীর অধীনে করদ রাজ্য ছিল? (৩) ঐ সময়ে যে সমস্ত শাসকরা কাশ্মীরের সিংহাসনে ছিলেন (বিশেষত শেষের দিকে), তারা কি জাতিতে হূন ছিলেন ইত্যাদি। তবে প্রবরসেন দ্বিতীয় (৫৭৫ খ্রীঃ) যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই বংশে পরপর যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়, লক্ষ্মণ নরেন্দ্রাদিত্য, রণাদিত্য, বিক্রমাদিত্য ও বালাদিত্য (৬০০ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে, প্রবরসেন দ্বিতীয় যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই রাজবংশের পরবর্তী একজন রাজার নামের (যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়) সঙ্গে আদি হূন বংশের শেষ শাসনকর্তা যুধিষ্ঠিরের নামের মিল আছে। একই বংশের পুরুষ না হলে কি একই প্রকার নাম নেওয়া সম্ভব হত? আবার ঐ বংশের পঞ্চম শাসকের নাম বিক্রমাদিত্য। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে, উজ্জয়িনীরাজ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে কাশ্মীরের শাসনকর্তাদের হয় আত্মীয়তাসূত্রে অথবা অধীনতাসূত্রে নিশ্চয়ই যোগসূত্র ছিল। এমনকি উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শিলাদিত্য প্রতাপশীলকে তাঁর শত্রুদের দমন করে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসতে কাশ্মীররাজ প্রবরসেন দ্বিতীয় সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং এই ঘটনাগুলি উজ্জয়িনী ও কাশ্মীরের মধ্যে একটা মেলবন্ধনের নিশ্চিত ইঙ্গিত দেয়। প্রবরসেন দ্বিতীয়ের বংশের শেষ শাসনকর্তা বালাদিত্যের (৬০০ খ্রীঃ) একজন দক্ষ ও বুদ্ধিমান কর্মচারী ছিলেন দুর্লভ

বর্ধন। তাঁর সঙ্গে রাজকুমারী অনঙ্গলেখার বিয়ে হয়; এবং তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন পান। বালাদিত্য নিঃসন্তান ছিলেন বলে নিজ কর্মচারী দুর্লভবর্ধনের কর্তব্যকর্মে ও প্রতিভায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে জামাতা করে সিংহাসন দিয়ে যান; অথবা দুর্লভবর্ধন অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বা কৌশলে বালাদিত্যকে সিংহাসনচ্যুত করে তা দখল করেন এবং সেইসঙ্গে রাজকুমারী অনঙ্গলেখাকে বিয়ে করেন, এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পিছনের ঘটনা যাই থাকুক, বালাদিত্যের পর (**৬০০** খ্রীঃ) নিশ্চিতভাবেই কাশ্মীরের উপর হুন বংশের আধিপত্য নিশ্চিহ্ন হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় হুনরক্তমিশ্রিত দুর্লভবর্ধন কর্তৃক কারকোট নামে পৃথক রাজবংশ (**৬০০** খ্রীঃ)।

হুন অধিকার

(৩৫১—৬০০ খ্রীঃ)

(ক) সিদ্ধ বংশ	(খ) প্রতাপাদিত্যের বংশ
(১) সিদ্ধ (৩৫১ খ্রীঃ)	(১) প্রতাপাদিত্য প্রথম
(২) উৎপলাক্ষ	(২) জলোকস
(৩) হিরণ্যাক্ষ	(৩) তুঞ্জিন প্রথম
(৪) হিরণ্যকুল	(৪) বিজয়
(৫) বসুকুল	(৫) জয়েন্দ্র
(৬) মিহিরকুল	
(৭) বকা	
(৮) ক্ষিতিনন্দ	

(গ) মেঘবাহন বংশ

(১) মেঘবাহন
|
(২) শ্রেষ্ঠসেন
|
(৩) হিরণ্য
|
(৪) তোরমান
|
(৫) প্রবরসেন দ্বিতীয়
|
(৬) যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়
|
(৭) লক্ষ্মণ নরেন্দ্রাদিত্য
|
(৮) রণাদিত্য (৪১৪ — ৪৭৪ খ্রীঃ)
|
(৯) বিনয়াদিত্য (৪৭৪—৫২১ খ্রীঃ)
|
(১০) বিক্রমাদিত্য (৫২১—৫৩৬ খ্রীঃ)
|
(১১) বালাদিত্য (৫৩৬—৬০০ খ্রীঃ)

উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের আত্মীয়ের বংশ। সময় আনুমানিক চতুর্থ শতকের শেষভাগ থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে হতে পারে।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. Kalhana, Rajtarangini / M, A, Stein / Bombay 1892 / First Book / p 135.

২. Early History and Culture of Kashmir / S. C. Roy / The Asiatic Society / p 34.

৩. Ibid / p 34.

৪. আইন-ই-আকবরী / বঙ্গানুবাদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় / বসুমতী কার্যালয় ১৮৯৯ / পৃঃ ৬৮।

সপ্তম অধ্যায়

কারকোট (নাগ) বংশ

(৬০০—৮৫৫ খ্রীঃ)

হূন বংশের শেষ শাসক বালাদিত্য (৫৩৬ খ্রীঃ—৬০০ খ্রীঃ) তাঁর একজন নিম্ন-বংশীয় কর্মচারী দুর্লভবর্ধনকে তার সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কর্তব্য-নিষ্ঠার জন্য খুবই স্নেহ করতেন। বালাদিত্য ছিলেন সম্ভবত অপুত্রক। দুর্লভ-বর্ধন নিজ অধ্যবসায়ে এবং ভাগ্যের আনুকূল্যে ক্রমশ উচ্চপদ লাভ করে অবশেষে বালাদিত্যের প্রধান সেনাপতিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজাও নিজ কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গলেখাকে দুর্লভবর্ধনের হাতে সমর্পণ করে চূড়ান্তভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন এবং জামাতাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে রাখেন।[১] ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বালাদিত্যের মৃত্যুর পর জামাতা দুর্লভবর্ধন কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করলে হূন বংশের অবসান হয় এবং শুরু হয় নাগ কারকোট রাজবংশ। যদিও দুর্লভবর্ধন কারকোট বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঐ বংশে হূন রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল; কারণ হূনকন্যা অনঙ্গলেখা ছিলেন দুর্লভবর্ধনের পত্নী এবং তারই গর্ভজাত পুত্র প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয় পরবর্তী রাজা হয়েছিলেন। দুর্লভ-বর্ধনের সিংহাসন প্রাপ্তির বিষয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে। একপক্ষ মনে করেন বালাদিত্য দুর্লভবর্ধনের কর্তব্যকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাজকন্যা ও সিংহাসন দিয়ে যান, কিন্তু অন্য মতাবলম্বীরা মনে করেন তিনি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বালাদিত্যকে হত্যা করে সিংহাসন ও রাজকন্যা লাভ করেন। প্রথম মতটিই অধিকতর সমর্থনযোগ্য। কারণ কবি ঐতিহাসিক কলহন লিখে যাননি যে, দুর্লভবর্ধন অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং বালাদিত্যের পুত্রসন্তান ছিল। যদি বালাদিত্যের পুত্র না থাকা নিশ্চিত হয়, তাহলে প্রথম মত তুলনায় নির্ভুল। Dr. S. C. Roy, তাঁর Early History and Culture of Kashmir নামক গবেষণা গ্রন্থে লিখে গেছেন, "Durlabhavardhana, a man of lowly origin took service under king Bal ditya, married his daughter and after the king's death, succeeded him."[২]

Dr. Roy-এর ঐ বিশ্লেষণ অনুসারে দুর্লভবর্ধন বালাদিত্যের মনোনীত উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর সিংহাসনে বসেছিলেন, কোনও অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নয়, এ সিদ্ধান্তে আসা যায়। সময়টা আনুঃ ৬০০ খ্রীঃ। দুর্লভবর্ধন ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি তাঁর শ্বশুরের রাজ্যকে আরও অনেক বড় করে তোলেন। তিনি একে একে জয় করেন তক্ষশীলা, সিন্ধু উপত্যকা, উরশা, রাজাপুরী, পর্ণোৎস প্রভৃতি।

৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্লভবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয় পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩] প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয় প্রতাপপুর নামে একটি নগরী স্থাপন করেছিলেন, যার বর্তমান নাম থাপার। কারকোট বংশের অনেক ইতিহাস জানতে পারা যায় তাঁদের তৈরী মুদ্রা থেকে। কলহনের লেখার সঙ্গে তখনকার মুদ্রা এবং পরিব্রাজকদের লেখার মিলিত বিবরণ যে ক্ষেত্রে একমত প্রতিষ্ঠা করবে, সেই ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে কাশ্মীরের সঠিক ইতিহাস বলে মেনে নিতে হবে। রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয়ের বিশেষ কোন অবদান জানতে পারা যায়নি। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করে পরলোকগমন করলে (৬৮৬ খ্রীঃ) তাঁর তিন পুত্র চন্দ্রপীড় তারাপীড় এবং মুক্তাপীড়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রপীড় সিংহাসনে আরোহণ করেন (৬৮৬ খ্রীঃ)।

রাজা চন্দ্রপীড় সিংহাসনে আরোহণ করেন ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং মারা যান ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। মাত্র আট বৎসরের রাজত্বকালে তিনি রাজ্যের মধ্যে যথেষ্ট সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রজাদের কাছে তিনি ন্যায়পরায়ণতার জন্য অভিনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, সকলকে সমান চক্ষে দেখতেন এবং সকল শ্রেণীর প্রজার অভিযোগ সমান আগ্রহ ও গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন এবং বিচার করতেন। তাঁর বিচারে বা সিদ্ধান্তে সকলে সন্তুষ্ট থাকলেও কিছু অসন্তুষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই ছিলেন। কিংবদন্তী আছে সেইরূপ একজন অসন্তুষ্ট দণ্ডিত ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রপীড়ের পরবর্তী ভাই তারাপীড় বড় ভাইকে তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা কঠিন রোগাক্রান্ত করিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। রাজার রোগশয্যায় যখন ঘটনাটি প্রকাশ হয়, তখন মন্ত্রীরা শাস্তির আবেদন করা সত্ত্বেও তিনি অপরাধী ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করে যান এইজন্য যে, সে অন্যের দ্বারা (ভ্রাতা তারাপীড়) চালিত হয়ে এ কাজ করেছে,—সুতরাং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না।[৪] এমনই ছিল চন্দ্রপীড়ের ন্যায়বোধ। চন্দ্রপীড় আর রোগমুক্ত হতে পারেননি। ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর অপকর্মের নায়ক পরবর্তী ভাই তারাপীড় সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু অন্যায়ের পথে অর্জিত সিংহাসনে তিনি পাঁচ বৎসরের বেশি থাকতে পারেননি। ৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তাপীড় পিতা প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয়ের সিংহাসনে বসেন।

মুক্তাপীড় বা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের শাসন কাশ্মীরের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর সময়ের 'শ্রী-প্রতাপ' নামাঙ্কিত যে মুদ্রাগুলি পাওয়া যায়, তাতে মনে করা হয়, তিনি কনৌজ বিজয়ের স্মারক হিসাবে প্রতাপাদিত্য উপাধি ধারণ করেছিলেন। কিন্তু মনে হয় সেটা ঠিক নয়; কারণ, তিনি প্রতাপাদিত্য উপাধি ধারণ করলে তাঁর নাম হত ললিতাদিত্যের স্থলে প্রতাপাদিত্য মুক্তাপীড়। তিনি 'শ্রী-প্রতাপ' নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন সম্ভবত তাঁর পিতার প্রতি শ্রদ্ধা

জানাতে ; কারণ তাঁর পিতার নাম ছিল প্রতাপাদিত্য। কবি-ঐতিহাসিক কলহন কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন ; তা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে।

মুক্তাপীড় পূর্বদিকে তিব্বত ও হিমালয়ের অন্যান্য পার্বত্য রাজ্য, তুর্ক সহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বে মগধ, গৌড়, কামরূপ এবং কলিঙ্গ জয় করেন। দক্ষিণে চালুক্য, মালব ও গুজরাট পর্যন্ত জয় করেছিলেন। যদি কলহনের এই বিবরণ সত্য হয়, তাহলে মুক্তাপীড় ছিলেন কাশ্মীর থেকে মালব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে কামরূপ পর্যন্ত এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট। তিনি ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩৭ বৎসর রাজত্ব করে একজন ন্যায়বান ও দক্ষ সম্রাট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে চিন সম্রাটের ও গ্রীক শাসনকর্তাদের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের একটি বেদনাদায়ক ঘটনা তাঁর শাসনে কালিমা লেপন করেছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গৌড়-বঙ্গের কয়েকজন নির্ভীক অধিবাসীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগ। ললিতাদিত্য গৌড় জয়ের পর গৌড়াধীশকে কাশ্মীর ভ্রমণে আহ্বান করেন এবং তাঁর প্রিয় কুলদেবতা 'পরিহাসকেশবে'র নামে গৌড়াধীশের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের শপথ পাঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গৌড়াধীশ কাশ্মীরে নিহত হন কতিপয় গুপ্তঘাতকের দ্বারা। এ বিষয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে ঃ একদল ঐতিহাসিক মনে করেন (কলহনকে অনুসরণ করে) যে মুক্তাপীড় ছলনার আশ্রয় নিয়ে গৌড়েশ্বরকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করেছিলেন।[৫] আর একদল মনে করেন মুক্তাপীড়ের কিছু শত্রু তাঁকে বিব্রত ও তাঁর নামে কলঙ্ক লেপন জন্য গৌড়েশ্বরকে হত্যা করেছিল। এ বিষয়ে দ্বিতীয় মত সমর্থনযোগ্য। কলহনের বর্ণনা এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য নয় ; কারণ, কাশ্মীরাধিপতির আহ্বানে গৌড়েশ্বর সেখানে গিয়েছিলেন কাশ্মীরসম্রাটের অধীনস্থ অঙ্গরাজ্যের রাজা হিসাবে। গৌড়েশ্বরকে নিহত করায় ললিতাদিত্যের তরফে আপাতগ্রাহ্য কোনও কারণ ছিল মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, ললিতাদিত্য যখন তাঁর কুলদেবতার নামে শপথ নিয়ে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তখন তা ভঙ্গ করার মত তথা বিশ্বাসঘাতকতা করার মত পরিস্থিতি ছিল না। কারণ, এ ধরনের ঘটনা ঘটালে তাঁর সুনামে কলঙ্ক পড়বে এ বোধ একজন সম্রাটের নিশ্চয়ই থাকবে। এ শপথ তাঁকে নিতে হয়েছিল সদ্যবিজিত শাসকের কাছে বিজয়ী সম্রাটের আমন্ত্রণের স্বাভাবিক প্রয়োজনে। তৃতীয়ত, গৌড়েশ্বর বিজিত হিসাবে সেখানে গেলেও তিনিও একটি বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর। তিনি সেখানে নিজস্ব রক্ষীবাহিনী, রাজকীয় কর্মচারী এবং পাত্র-মিত্র সহ নিশ্চয়ই যাবেন। সুতরাং রাজার রক্ষী, সৈন্য-সামন্ত ও রাজ-কর্মচারীদের এড়িয়ে তাঁকে গুপ্তহত্যা করে ফেলা সহজ ব্যাপার নয়। যদি ধরেও নেওয়া যায় গুপ্তহত্যা—গুপ্তহত্যাই, তাহলে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের এবং

রাজকীয় কর্মচারীদের কি হয়েছিল সে বিষয়ে কলহন নীরব। তাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে, সম্রাট ললিতাদিত্যের কিছু শত্রু তাঁকে বিব্রত করতে ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আনতে গৌড়েশ্বরকে হত্যা করে। তাঁর সঙ্গের দেহরক্ষীরা ললিতাদিত্যেরই এই অপকর্ম মনে করে গুপ্তঘাতকদের হত্যা করার পর কুলদেবতা পরিহাসকেশবের মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ভুলক্রমে [সে সময় কাশ্মীরে বহু মন্দির থাকায় নতুন স্থানে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক] 'বিষ্ণু রামস্বামী'র বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। পরে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে তারা বীরগতি প্রাপ্ত হয়। গৌড়েশ্বরের নিধনের পশ্চাতে কারণ যাই থাকুক, গৌড়ের অধিবাসীরা যে বীরের জাতি এ স্বাক্ষর তাঁরা সুদূর কাশ্মীরেও রেখে ছিলেন, যে জন্য কলহন উচ্ছ্বসিত ভাষায় গৌড়বীরদের প্রশংসা করে গেছেন। ললিতাদিত্যের সময়ে স্থাপত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। তিনি বহু নগর এবং মন্দির, স্তূপ, চৈত্য, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নির্মিত মার্তণ্ড মন্দিরের গঠনশৈলী ও স্থাপত্য আজও কাশ্মীর ভ্রমণার্থীদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর (৭৩৬ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র কুবলয়পীড় এক বৎসর পরে অধ্যাত্ম সাধনার উদ্দেশ্যে সিংহাসন ত্যাগ করলে কনিষ্ঠ পুত্র বজ্রাদিত্য সিংহাসনে বসেন। তাঁর সাত বৎসরের শাসন নিষ্ঠুরতা ও অকর্মণ্যতার জন্য পরিচিত। তারপর বজ্রাদিত্যের তিন সন্তানের মধ্যে পৃথিব্যপীড় ও সংগ্রামপীড় অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করে পরলোকগমন করলে বজ্রাদিত্যের কনিষ্ঠ পুত্র তথা মুক্তাপীড়ের পৌত্র জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৭৫১ খ্রীঃ)। জয়াপীড় পিতামহ ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর, বিগত পনেরো বৎসরের অস্থির শাসনে বিশৃঙ্খল কাশ্মীর সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেকটাই সুশাসন ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর সভায় পণ্ডিত উদ্ভটভট্ট, লেখক দামোদর গুপ্ত, কবি মনোরথ, চটক, সংখদত্ত, সন্ধিমান, বামন প্রভৃতি গুণীরা মর্যাদা সহকারে স্থান পেয়েছিলেন। তিনি রাজ্যে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' পাঠ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন।

জয়াপীড়ের যেমন ছিল শিল্প ও বিদ্যার প্রতি অনুরাগ, তেমনই ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও খামখেয়ালীপনা। তাঁর পিতামহ সম্রাট ললিতাদিত্যের ছিল একলক্ষ পঁচিশ হাজার রথারোহী সৈন্য বাহিনী। তিনিও পিতামহের অনুসরণে দিগ্বিজয়ের জন্য আশী হাজার রথযুক্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হয়েছিলেন। তিনি প্রয়াগে প্রচুর দান-ধ্যান করেন এবং গৌড়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে ছদ্মবেশে কিছুকাল অবস্থান করেন। তাঁর দীর্ঘকাল রাজধানীর বাইরে থাকার সুযোগে শ্যালক জজ্জ কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন। জয়াপীড় কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করে জজ্জকে পরাজিত ও নিহত করেন।[৬] তার কিছুদিন পর তিনি নেপাল জয়ের জন্য নেপাল আক্রমণ করলে নেপালের রাজা অরমুডি জয়াপীড়ের সৈন্যদলকে কৌশলে পর্যুদস্ত করে জয়াপীড়কে বন্দী করেন। তাঁকে

বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করেন তাঁর একান্ত প্রভুভক্ত মন্ত্রী দেবশর্মা নিজ জীবন উৎসর্গ করে। কিংবদন্তী আছে যে, যে কারাগারে জয়াপীড়কে বন্দী করে করে রাখা হয়েছিল তার নীচে প্রবাহিত ছিল কালগণ্ডিকা (কালীগঙ্গা ?) নদী। মন্ত্রী রাজা জয়াপীড়কে পরামর্শ দেন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পরপারে অপেক্ষমাণ নিজ সৈন্যদলের কাছে পৌঁছাতে। কিন্তু উচ্চতা অনেক বেশী থাকায় এবং প্রবল স্রোতে বাঁচার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় প্রভুভক্ত মন্ত্রী রাজাকে কিছু সময়ের জন্য কৌশলে কক্ষান্তরে পাঠিয়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন এবং লিখে রেখে যান, তাঁর এই মৃতদেহটাকে ভেলা করে যেন নদী পার হয়ে পলায়ন করেন। রাজা জয়াপীড় সাশ্রুনয়নে প্রভুভক্ত মন্ত্রীর মৃতদেহসহ ঝাঁপ দিয়ে সেটিকে ভেলা করে নিজ জীবন রক্ষা করেছিলেন।[৭] প্রভুভক্তির এরূপ নিদর্শন দুর্লভ। কিন্তু সেই প্রজাবৎসল জয়াপীড় বার্ধক্যে খুবই খামখেয়ালী হয়ে উঠেন। এমনকি তিনি ব্রাহ্মণদের উপরেও নানাপ্রকার উৎপীড়ন করতে থাকায় ইট্টিল নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিসম্পাত করেন এবং সেইটিই নাকি তাঁর মৃত্যুর কারণ হয় (৭৮২ খ্রীঃ)।[৮]

জয়াপীড়ের পর তাঁর পুত্রদ্বয় ললিতাপীড় ও সংগ্রামপীড় দ্বিতীয় যথাক্রমে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই অকর্মণ্য শাসক ছিলেন। সংগ্রামপীড়ের মৃত্যুর পর ললিতাপীড় ও তার নাচকুলোদ্ভব উপপত্নী জয়াদেবীর নাবালক সন্তান বৃহস্পতি মতান্তরে চিপ্পট জয়াপীড়কে তাঁর মাতুলদের অভিভাবকত্বে সিংহাসনে বসানো হয়। তাঁর অভিভাবকত্বের সুযোগে জ্যেষ্ঠ মাতুল উৎপল সহ পাঁচ মাতুল রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন। একদিন সুযোগ পেয়ে পাঁচ মাতুল ভাগিনেয়কে হত্যা করেন এবং বংশের অন্য এক কুমার অজিতপীড়কে সিংহাসনে বসান অথবা বসাতে বাধ্য হন। (৮১৩ খ্রীঃ)। অজিতপীড় দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্ব করলেও রাজ্যের বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারেননি। তার মৃত্যুতে (৮৫০ খ্রীঃ) কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন সংগ্রামপীড় দ্বিতীয়ের পুত্র অনঙ্গপীড়। মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করে তিনি পরলোকগমন করলে (৮৫৩ খ্রীঃ) কাশ্মীরের শেষ কারকোট বংশীয় রাজা অজিতপীড়ের পুত্র উৎপলপীড় সিংহাসনে বসেন (৮৫৩ খ্রীঃ)। তিনি মাত্র দু-বৎসর রাজত্ব করার পর কারকোট বংশের পতন হয় (৮৫৫ খ্রীঃ); কারণ তারপর সিংহাসন অধিকার করেন জয়াদেবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উৎপলের পৌত্র অবন্তীবর্মণ। অবন্তীবর্মণের রাজত্বকাল থেকে ঐ বংশ তাঁর পিতামহ উৎপলের নামানুসারে 'উৎপল বংশ' রূপে পরিচিত হয়।

কারকোট রাজবংশ

(৬০০-৮৫৫ খ্রীঃ)

- (১) দুর্লভবর্ধন (৬০০-৬৩৬ খ্রীঃ)
  - (২) প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয় (৬৩৬-৬৮৬ খ্রীঃ)
    - (৩) চন্দ্রপীড় (৬৮৬-৬৯৪ খ্রীঃ)
    - (৪) তারাপীড় (৬৯৪-৬৯৯ খ্রীঃ)
    - (৫) ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৬৯৯-৭৩৬ খ্রীঃ)
      - (৬) কুবলয়পীড় (৭৩৬-৭৩৭ খ্রীঃ)
      - (৭) বজ্রাদিত্য (৭৩৭-৭৪৪ খ্রীঃ)
        - ত্রিভুবনপীড়
          - (১৪) অজিত পীড় (৮১৩-৮৫০ খ্রীঃ)
            - (১৬) উৎপলপীড় (৮৫৩-৮৫৫ খ্রীঃ)
        - (৮) পৃথিব্যপীড় (৭৪৪-৭৪৮ খ্রীঃ)
        - (৯) সংগ্রামপীড় প্রথম (৭৪৮-৭৫১ খ্রীঃ)
        - (১০) জয়াপীড় (৭৫১-৭৮২ খ্রীঃ)
          - (১১) ললিতাপীড় (৭৮২-৭৯৪ খ্রীঃ)
            - (১৩) বৃহস্পতি বা চিপ্পট জয়াপীড় (৮০১-৮১৩ খ্রীঃ)
          - (১২) সংগ্রামপীড় দ্বিতীয় (৭৯৪-৮০১ খ্রীঃ)
            - (১৫) অনঙ্গপীড় (৮৫০-৮৫৩ খ্রীঃ)

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society / First Editian 1957 / p 45.

২. ibid / p 38,

৩. Kalhana / Rajtarangini / M. A. Stein / Bombay 1892 / Introduction p 136 / 4th Book.

৪. প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী / ড. দীনেশচন্দ্র সরকার / সাহিত্যলোক / প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩ / পৃ ৭২।

৫. Ancient India / Dr. R. C. Majumdar / Motilal Banarsidas / Edition 1964 / p 262.

৬. প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী / ড. দীনেশচন্দ্র সরকার / সাহিত্যলোক / প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩ / পৃ ৭৬।

৭. ঐ / পৃ ৮০।

৮. ঐ / পৃ ৮১।

অষ্টম অধ্যায়

উৎপল রাজবংশ

(৮৫৫-৯৩৯ খ্রীঃ)

কারকোট রাজবংশের শেষের দিকে অস্থিরতার কারণে কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়ে বিতস্তা অববাহিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। উৎপল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও ঐ বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক অবন্তীবর্মা ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা তুঙ্গে। আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে অবন্তীবর্মা রাজ্যের মধ্যে যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, ততদিনে তাঁর রাজত্বের অনেকখানি সময়ই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি বাইরের প্রদেশগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে না পারলেও কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও বিবিধ সমস্যার সমাধানে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে স্থাপত্যেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। অবন্তীবর্মার সবচেয়ে বড় অবদান রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। কৃষিফসলে জলের অনিশ্চয়তার কারণে কাশ্মীর রাজ্যের একমাত্র প্রধান খাদ্যফসল ধান উৎপাদন বারেবারে বিঘ্নিত হওয়ায় রাজ্যে বারেবারে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অবন্তীবর্মা তাঁর একজন মন্ত্রী সূর্যকে দায়িত্ব প্রদান করেন।[১] তাঁর রাজত্বে মন্ত্রী সূর্যের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা রাজ্যকে অনেক প্রতিকুল অবস্থা থেকে রক্ষা করেছে। এই মন্ত্রী সূর্য ছিলেন একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি। কথিত আছে, সূর্যা নাম্নী এক চণ্ডালরমণী মাটির হাঁড়ির মধ্যে পরিত্যক্ত একটি পরম সুন্দর শিশুকে পেয়ে শূদ্রা ধাত্রীর মাধ্যমে তাকে প্রতিপালন করেন।[২] সূর্যা কর্তৃক পালিত হওয়ায় শিশুর নাম হয় সূর্য। এই সূর্য নিজ অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে কাশ্মীরের সেচমন্ত্রী হন। রাজা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সূর্য কাশ্মীরের নদী ও বিভিন্ন জলপ্রবাহগুলিকে কৌশলে কোনটিকে ভরাট করে, কোনটিকে গভীর করে, কোনটির গতিপথ পরিবর্তিত করে জলসেচ ব্যবস্থাকে ও বন্যানিয়ন্ত্রণকে সুনিশ্চিত করেন। ফলে প্রায়-দুর্ভিক্ষের অবস্থা থেকে কাশ্মীর খাদ্যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে এবং খাদ্যফসলের দাম দীনদরিদ্রেরও নাগালের মধ্যে আসে। এ ছাড়াও মন্ত্রী সূর্য নিজ নামে সূর্যপুর এবং রাজার নামে অবন্তীপুর নামে সুন্দর নগর নির্মাণ করেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন, নতুন রাজস্ব নির্ধারণ করেন এবং আদায়ের পদ্ধতির পরিবর্তন করেন। ফলে রাজকোষের ঘাটতি পূরণ হয়ে রাজ্যে স্থিতাবস্থা আসে। তার ফলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য. সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির উন্নতি হয় এবং জ্ঞানী-গুণীরা রাজসভায় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে থাকেন। রাজার পরেই রাজ্যে ক্ষমতাসীন ও সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন মন্ত্রী সূর্য।

অবন্তীবর্মা ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যাবার পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বংশ-ধরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে অবশেষে পুত্র শঙ্করবর্মা সিংহাসন লাভ করেন (৮৮৫ খ্রীঃ)।

পিতার মৃত্যুর পর দুবৎসর যুদ্ধবিগ্রহ করে শঙ্করবর্মা ৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হন। পিতা অবন্তীবর্মা ও মন্ত্রী সুর্যের কৌশলে কাশ্মীরে অভ্যন্তরীণ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকায় ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকায় শঙ্করবর্মা হারানো রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারে মনোযোগ দেন। কাশ্মীরের বাইরের পার্বত্য রাজ্যগুলিকে পুনরুদ্ধার করে তিনি গুর্জর অধিকারের উদ্দেশ্যে অভিযান করেন। কিন্তু গুর্জরে তিনি আধিপত্য বিস্তার করে উঠতে পারেননি। পরে পাঞ্জাব এবং কাংড়া অধিকার করার পর সিন্ধু-পরবর্তী এলাকাগুলি দখল করে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে হাজারা জেলার উরাসাতে উপজাতীয়দের দ্বারা অতর্কিত আক্রমণে তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং পরে মারা যান। তাঁর সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে নিরাপদে না ফেরা পর্যন্ত রাজার মৃত্যু সংবাদ মন্ত্রীরা ও সৈন্যাধ্যক্ষরা গোপন রাখেন।[৩]

রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করা এবং হৃতরাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য শঙ্করবর্মার আন্তরিকতার অভাব ছিল না; কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য তাঁর সে ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়নি। শঙ্করবর্মার বৈদেশিক নীতিতে একটা মস্তবড় ভুল ছিল যে, তিনি কারকোট বংশের মতো চৈনিক সম্রাটদের সামরিক শক্তির আনুকূল্য গ্রহণ করার চেষ্টা করেননি। তবুও বলা যায় তিনি একজন সফল শাসক ছিলেন। ৯০২ খ্রীস্টাব্দে শঙ্করবর্মার মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী উত্তরাধি-কারীদের আমলে কাশ্মীরের ইতিহাস কেবল বিশৃঙ্খলা, ক্ষমতা দখল ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস। Dr. S. C. Roy-কে অনুসরণ করে বলা যায়, "The political history of Kasmira after Samkaravarmana's death is a sordid tale of jealousy, intrigue and intestine conflicts·· ."[৪]

শঙ্করবর্মার মৃত্যুর পর রাজ্যে রোমের প্রিটোরীয় গার্ড ধাঁচের 'তন্ত্রী' নামের এক সামরিক শক্তিসম্পন্ন গোষ্ঠী; 'দামারা' নামের এক অভিজাতগোষ্ঠী, এবং 'একাঙ্গ' নামের অপর একটি জঙ্গীগোষ্ঠী গঠিত হয়, যাদের অঙ্গুলি হেলনে পরবর্তী উৎপলবংশীয় শাসকেরা একের পর এক নাটকের কুশীলবের মতো সিংহাসন মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান করেছেন। সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে এই সমস্ত জঙ্গী ও অভিজাতগোষ্ঠীদের প্রাধান্য দেওয়ার ফলে [আধুনিক ভারতবর্ষেও ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক নেতারা সমাজবিরোধীগোষ্ঠী ও ধনিকগোষ্ঠীর সহায়তা গ্রহণ করে থাকেন] রাজসরকারের কেন্দ্রীয় শক্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

শঙ্করবর্মার মৃত্যুর পর তন্ত্রীরা তাঁর নাবালক পুত্র গোপালবর্মাকে মাতা সুগন্ধার অভিভাবকত্বে সিংহাসনে বসায়। এই সময়ে মন্ত্রী প্রভাকরদেব রানীর সুনজরে আসায়, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে তিনি রাণীর উপ-

পতিতে পরিণত হন। ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা রাজা গোপালবর্মার পরিবর্তে বকলমে চলে যায় প্রভাকরদেবের হাতে। দুবৎসর পরে ৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপালবর্মা মারা গেলে তার মাতা সুগন্ধা একাঙ্গদের সহায়তায় স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দুবৎসর পরে তন্ত্রীরা বিদ্রোহ করে সুরবর্মার পৌত্র নির্জিতবর্মার নাবালক পুত্র পার্থকে সিংহাসনে বসায় (৯০৬ খ্রীঃ)। পার্থর সিংহাসনে বসার কয়েকবৎসর পরে ৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রানী সুগন্ধা একাঙ্গদের সহায়তায় বিদ্রোহ ঘটিয়ে পুনরায় সিংহাসন দখল করতে চেষ্টা করলে রাজা পার্থর সমর্থক তন্ত্রীদের সঙ্গে বিরোধে একাঙ্গরা পরাজিত হয় এবং রাণী সুগন্ধাকে হত্যা করা হয়।[৫] পার্থর রাজত্বে আর একটি বিষাদময় ঘটনা হল,—৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে উপত্যকার হাজার হাজার অধিবাসী মারা যায়। অতঃপর তন্ত্রীরা ৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পার্থকে সিংহাসনচ্যুত করে তার পিতা নির্জিতবর্মাকে সিংহাসনে বসায় (৯২১ খ্রীঃ)। দুবৎসর পরে নির্জিতবর্মা মারা গেলে তন্ত্রীরা তাঁর অপর পুত্র চক্রবর্মাকে সিংহাসনে বসায় (৯২৩ খ্রীঃ)। কয়েকবৎসর পরে ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদ্রোহের পর সুরবর্ম (প্রথম) কাশ্মীরের সিংহাসন পান। তারপর পুনরায় পার্থ, চক্রবর্মা, শম্ভুবর্ধন, চক্রবর্মা একে একে ঘুরে ফিরে সিংহাসনে বসতে থাকেন পুতুলখেলার মতো। বস্তুত ঐ সময় কাশ্মীরে চলছিল পরিপূর্ণ মাৎস্যন্যায়। এরপর যিনি সিংহাসনে বসেন তাঁর নাম অবন্তীবর্মা (দ্বিতীয়) বা উন্মাদ অবন্তী (৯৩৭ খ্রীঃ)। এই উন্মাদ রাজা কুপরামর্শদাতাদের পরামর্শে রাজপরিবারের সমস্ত পুরুষ সভ্যদের এমনকি নিজ পিতাকেও হত্যা করেন, তাঁর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য।[৬] সেইসঙ্গে চলে রাজ্যবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার। তবে মাত্র দুবৎসর পরে এই অত্যাচারী উন্মাদ শাসক মারা গেলে (৯৩৯ খ্রীঃ) রাজ্যের অধিবাসীরা বিপত্তি থেকে রক্ষা পায়। উন্মাদ অবন্তীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান সেনাপতি কমলবর্ধন রাজপরিবারকে ও রাজ্যকে 'দামার', 'একাঙ্গ', 'তন্ত্রী', ইত্যাদি কায়েমী স্বার্থবাদী ও ক্ষমতালোভীদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এক ভয়ংকর সামরিক অভিযান চালিয়ে তাঁদের সাময়িক দমন করেন। অতঃপর কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের এক সভা মন্ত্রী প্রভাকরদেবের পুত্র যশস্করকে সিংহাসনের জন্য নির্বাচন করলে উৎপল রাজবংশের অবসান হয় (৯৩৯ খ্রীঃ)।

*উৎপল রাজবংশ

(৮৫৫-৯৩৯ খ্রীঃ)

**(১) অবন্তীবর্মা (৮৫৫-৮৮৩ খ্রীঃ)
|
(২) শঙ্করবর্মা (৮৮৫-৯০২ খ্রীঃ)
|
(৩) গোপালবর্মা (৯০২-৯০৪ খ্রীঃ)
|
(৪) রানী সুগন্ধা (৯০৪-৯০৬ খ্রীঃ)
|
(৫) পার্থ (৯০৬-৯২১ খ্রীঃ)
|
(৬) নির্জিতবর্মা (৯২১-৯২৩ খ্রীঃ)
|
(৭) চক্রবর্মা (৯২৩ ৯৩০ খ্রীঃ)
|
(৮) সুরবর্মা (প্রথম)
|
(৯) পার্থ
|
(১০) চক্রবর্মা
|
(১১) শম্ভুবর্ধন
|
(১২) চক্রবর্মা
|
(১৩) উন্মাদ অবন্তী (৯৩৭-৯৩৯ খ্রীঃ)

[(৮)–(১২): (৯৩০-৯৩৭ খ্রীঃ) মাৎস্যন্যায়]

* উৎপল ছিলেন জয়াদেবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সেজন্য এই বংশের নাম উৎপল-বংশ। উৎপলপীড় ও উৎপল এক ব্যক্তি নহে।

উৎপল
|
সুখবর্মা
|
** অবন্তীবর্মা

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. Early History nd culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society, 1957 / p 48

২. প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী / ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার / সাহিত্যলোক / পৃ ৮১ ৮৪

৩. Ancient India / Dr. R. C. Majumdar / Motial Banarsidas / Edition 1964 / p 356

৪. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society 1957 / p 51

৫. ibid, pp 52-53

৬. Ancient India / Dr. R. C. Majumdar / Motilal Banarsidas / Edition 1964 / p 358

নবম অধ্যায়

যশস্কর ও গুপ্ত রাজবংশ

(৯৩৯-১০০৩ খ্রীঃ)

উন্মাদ অবন্তীর মৃত্যুর পর উৎপল রাজবংশের অবসানে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ যে ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন প্রভাকরদেবের পুত্র যশস্কর। যশস্কর ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি প্রভাকরদেবের পুত্র হলেও বিদেশে ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন যাপন করছিলেন। ব্রাহ্মণসভা যশস্করকে নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা, সততা ও পাণ্ডিত্য বিচার করে।[১] যশস্করও সিংহাসন প্রাপ্তির পর সেই সিংহাসনের মর্যাদা রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। ক্ষমতালাভের পরই তিনি তন্ত্রীদের অবশিষ্ট শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। বিগত মাৎস্যন্যায়ের সুযোগে রাজপরিবারে এবং উচ্চপদাধিকারী রাজকর্মচারীদের মধ্যে গড়ে ওঠা দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে থাকেন; এবং সারা রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। ফলে দেশের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা একেবারেই কমে যায়। সেইসঙ্গে মহারাজ যশস্কর মঠ ও চৈত্যাদি নির্মাণ করেন এবং সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন; জ্ঞানী-গুণিদের সম্বর্ধনা করেন। এই সমস্ত গুণাবলীর জন্য যশস্কর শীঘ্রই সমগ্র রাজ্যে প্রজাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। যদিও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম উপত্যকা ছাড়িয়ে আর্যাবর্তেও প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারবুদ্ধির জন্য।[২] উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের মতোই যশস্কর তাঁর ন্যায়বিচারের জন্য প্রজাদের হৃদয় সিংহাসনের আস্থাবান সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তিনি মাত্র নয় বৎসর রাজত্ব করে কাশ্মীরকে পুনরায় অনিশ্চিত ও অস্থির অবস্থার মধ্যে রেখে পরলোক গমন করেন (৯৪৮ খ্রীঃ)।

যশস্করের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র সংগ্রামদেব মাত্র কয়েকমাসের জন্য সিংহাসনে বসেছিলেন। মন্ত্রী প্রভাগুপ্ত একদিন সুযোগ পেয়ে নাবালক রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন (৯৪৯ খ্রীঃ)। ফলে সংগ্রামদেবের মৃত্যুর পর মাত্র দুপুরুষেই যশস্কর বংশের ধারাবাহিকতার অবসান হয়। যে আশা নিয়ে বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী নাবালক প্রভুকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছিলেন, তিনিও সেই সিংহাসনে এক বৎসরের বেশি বসতে সুযোগ পাননি। প্রভাগুপ্তের মৃত্যুর (৯৫০ খ্রীঃ) পর তাঁর পুত্র ক্ষেমগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। ক্ষেমগুপ্ত অত্যন্ত নষ্ট চরিত্রের রাজা ছিলেন। সকল সময় জুয়া, সুরা ও সাকী নিয়ে মত্ত থাকতেন।[৩] ক্ষেমগুপ্ত লোহার রাজবংশের কন্যা এবং শাহীরাজ ভীমপালের দৌহিত্রী দিদ্দাকে বিবাহ করেন। দিদ্দাকে বিয়ে করার ফলে কাশ্মীরের

সঙ্গে লোহার পরিবারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ক্ষেমগুপ্তের রাজত্বে শাহীরাজ ভীমপাল কর্তৃক কাশ্মীরে ভীমকেশব নামে একটি বিখ্যাত মন্দির স্থাপনা উভয় বংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতির প্রমাণ বহন করে।

এই ক্ষেমগুপ্তের পত্নী রানী দিদ্দা একজন অদ্ভুত চরিত্রের নারী ছিলেন। তিনি রাজাকে সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করেন। রাজা ক্ষেমগুপ্ত রানী দিদ্দার অঙ্গুলি হেলনে চলতে থাকেন। ফলে শাসনক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ থাকে রানী দিদ্দার হাতে। সেজন্য রাজ্যে ক্ষেমগুপ্তের অবজ্ঞাসূচক নাম হয় 'দিদ্দাক্ষেম'।[৪] 'লুতা' নামক কাশ্মীর উপত্যকার একপ্রকার ভয়ঙ্কর রোগে ৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যু হয়। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পর নাবালক পুত্র অভিমন্যু দ্বিতীয় কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা থাকে যথাপূর্ব রানী দিদ্দার হাতে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রানী দিদ্দা একটি অদ্ভুত চরিত্রের নারী ছিলেন। কঠিনে, কোমলে, বাৎসল্যে, প্রতিশোধস্পৃহায়, দয়ায়, নিষ্ঠুরতায়, ক্ষমতালিপ্সায় এবং কুটনৈতিক দক্ষতায় কাশ্মীরের ইতিহাসে এ ধরনের নারী কোনও রাজবংশেই ছিলনা। ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে অভিমন্যুর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র নন্দিগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর পর রানী দিদ্দা পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য কাশ্মীরে অনেক স্থাপত্য গড়ে তোলেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই তাঁর পুত্রশোক স্তিমিত বা শেষ হয়ে গেলে তিনি পৌত্র নন্দিগুপ্তকে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় পৌত্র ত্রিভুবনকে ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাকিনী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়ে হত্যা করেন। অবশিষ্ট তৃতীয় পৌত্র নাবালক ভীমগুপ্ত সিংহাসনে বসেন ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

ইতিমধ্যে রানী দিদ্দা 'তুংগ' নামে নীচকুলোদ্ভব এক ভৃত্যকে প্রেম নিবেদন করে তাঁর উপপতিতে পরিণত করেন।[৫] অনেকের অনুমান এটাও তাঁর একটা কুটনৈতিক চাল। নীচকুলোদ্ভব ভৃত্য রানীর ভালবাসা এবং উচ্চপদ পেয়ে রানীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত চিরকাল তাঁর অনুগত থাকবে এই মনস্তাত্ত্বিক কারণে হয়ত তিনি কোনও উচ্চকুলোদ্ভব ও উচ্চপদাধিকারীকে অনুগ্রহ বণ্টন করেননি। যদি এই ধারণা সঠিক হয়, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রানী যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন; কারণ ভৃত্য তুংগ পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েও রাণীর প্রতি চিরকাল অনুগত ছিলেন এবং রানীর সুদিনে-দুর্দিনে তাঁর পাশে থেকেছিলেন রানীর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। কিন্তু তবুও তা সামাজিক নিয়মে ব্যভিচার। রাজা ভীমগুপ্ত একটু বড় হয়ে যখন বুঝতে শিখলেন, তখন দিদ্দা তুংগজনিত রাজবংশের কলঙ্ক মোচন করার জন্য সচেষ্ট হলে, তাঁর পিতামহী দিদ্দা তা পূর্বেই বুঝতে পেরে ভীমগুপ্তকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং অমানুষিক নির্যাতন করে তাঁকে সেখানে হত্যা করান। ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভীমগুপ্তের মৃত্যুর পর রানী দিদ্দা স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও কাশ্মীরের শাসনকার্য কঠোরভাবে পরিচালনা

করেছিলেন। দিদ্দা সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর প্রেমিক তুংগকে প্রধান-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন।[৬] ফলে দিদ্দা-তুংগের যৌথ শাসনে দীর্ঘ তেইশ বৎসর কাশ্মীরের শাসনে ধারাবাহিকতা থাকার জন্য যেমন বৈষয়িক উন্নতি হয়েছিল, তেমনই দিদ্দার খামখেয়ালীপনায় এবং তুংগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে রাজকোষের অর্থও ব্যয় হয়েছিল অস্বাভাবিকভাবে। দিদ্দা-তুংগের বিরুদ্ধে যতবার অভ্যু-থানের চেষ্টা হয়েছে, মহারানী দিদ্দা ততবারই কাউকে ঘুষ দিয়ে, কাউকে পদ দিয়ে, কাউকে হত্যা করে, কাউকে নির্বাসনে পাঠিয়ে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করে তা ব্যর্থ করেছিলেন। অবশেষে এই বিচিত্র চরিত্রের রমণী ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকালীন তাঁর ভ্রাতা লোহারের শাসনকর্তা উদয়রাজের পুত্র সংগ্রামরাজকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে যাওয়ায় বিনা রক্তপাতে ভ্রাতুষ্পুত্র কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করলে (১০০৩ খ্রীঃ) প্রভাগুপ্তের বংশের অবসান হয়, শুরু হয় লোহার রাজবংশ।[৭]

যশস্করের বংশ

(৯৩৯-৯৪৯ খ্রীঃ)

(১) যশস্কর (৯৩৯-৯৪৮ খ্রীঃ)
|
(২) সংগ্রামদেব (৯৪৮-৯৪৯ খ্রীঃ)

প্রভাগুপ্তের বংশ

(৯৪৯-১০০৩ খ্রীঃ)

(১) প্রভাগুপ্ত (৯৪৯-৯৫০ খ্রীঃ)
- (২) ক্ষেমগুপ্ত (৯৫০-৯৫৮ খ্রীঃ)
  - (৩) অভিমন্যু (৯৫৮-৯৭২ খ্রীঃ)
    - (৪) নন্দিগুপ্ত (৯৭২-৯৭৩ খ্রীঃ)
    - (৫) ত্রিভুবনগুপ্ত (৯৭৩-৯৭৫ খ্রীঃ)
    - (৬) ভীমগুপ্ত (৯৭৫-৯৮০ খ্রীঃ)
- রানী দিদ্দা
  - (৭) মহারানী দিদ্দা (৯৮০-১০০৩ খ্রীঃ)

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society, 1957 / p 54
২. Ancient India / Dr. R. C. Majumdar / Motilal Banarsidas / Edition 1964 / pp 358-359
৩. ibid, p 359
৪. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society, 1957 / p 56
৫. ibid, p 57
৬. ibid, p 57
৭. ibid, p 58

দশম অধ্যায়

লোহার রাজবংশ

(১০০৩-১১৭২ খ্রীঃ

মহারানী দিদ্দার মনোনয়ন অনুসারে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লোহার বংশীয় সংগ্রামরাজ কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে।[১] সংগ্রামরাজের অধীনে কাশ্মীরের প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে তুংগের হাতে। তিনি ব্রাহ্মণদের মাসোহারা, দেবতার সেবাপুজার জন্য অনুদান এবং অনাথ ও অতিথিদের ভরণ-পোষণের খরচাদি বন্ধ করে দেওয়ায় ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও তিনি কৌশলে তা দমন করেন। এই সময়ে শাহী সম্রাট ত্রিলোচনপালকে গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রামরাজ মন্ত্রী তুংগের অধীনে এক বিশাল সেনাবাহিনী দিয়ে পাঠান। কিন্তু তুংগের সামরিক বিচক্ষণতার অভাবে তিনি পর্যুদস্ত হন এবং কাশ্মীরে ফেরার পথে সংগ্রামরাজের গোপন নির্দেশে তাঁর ভ্রাতা বিগ্রহরাজ তাঁর প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে তুংগকে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করেন।[২]

তুংগের মৃত্যুর পর সুলতান মামুদ প্রতিশোধস্পৃহায় কাশ্মীর উপত্যকায় আক্রমণ চালান,—একবার ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বার ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই লাখোট দুর্গের পতন ঘটাতে সক্ষম না হওয়ায় তিনি কাশ্মীর জয়ের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন।[৩]

১০২৮ খ্রীষ্টাব্দে সংগ্রামরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হরিরাজ সিংহাসনে বসেন। সংগ্রামরাজের পত্নী বা হরিরাজের মাতা শ্রীলেখা ছিলেন একজন উচ্ছৃংখল ও ক্ষমতালিপ্সু মহিলা। তিনি নিজপুত্র হরিরাজকে ডাকিনী বিদ্যার সাহায্যে মাত্র বাইশ দিন মধ্যে হত্যা করেন এবং স্বয়ং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন[৪]। কিন্তু একাংগরা তাঁর অপর পুত্র অনন্তরাজকে সিংহাসনে বসান। অনন্তরাজ সিংহাসন লাভের পর যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্যের শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। ঐ সময় মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা তাড়িত হয়ে শাহী রাজকুমাররা কাশ্মীরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যখন দর্দের শাসনকর্তা আকলামঙ্গল এবং অন্যান্য ম্লেচ্ছ (মুসলমান) রাজারা মিলিতভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করেছিলেন, তখন শাহী রাজকুমার রুদ্রপাল তাদের পরাজিত করে কাশ্মীরকে নিরাপদ করেছিলেন। পতিব্রতা মহারানী সূর্যমতী ও অনুগত মন্ত্রী হলধরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ও শাসনে স্থায়িত্ব আসায় অনন্তরাজ কাশ্মীরের বাইরের রাজ্যগুলি অধিকারে মনোনিবেশ করেন এবং অনেকটাই সাফল্য অর্জন করেন।

১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রানীর পরামর্শে অনন্তরাজ পুত্র কলসরাজকে সিংহাসনে স্থাপন করলেও মূল শাসনক্ষমতা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। কলসরাজ সিংহাসনে

বসার পর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে থাকেন। অনন্তরাজ উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে কারাগারে প্রেরণ করতে চাইলে রানী সূর্যমতীর অনুরোধে ক্ষমা করেন। আবার একবার কলসরাজ তাঁর মাতা-পিতার তীর্থযাত্রার সময় তাঁদের বন্দী করার চেষ্টা করলে সে উদ্যোগও রাজার অনুগত মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। সেক্ষেত্রেও কলসের এই অপরাধের শাস্তি রানীর অনুরোধে অনন্তরাজ মকুব করেন। কিন্তু কুলাঙ্গার অকৃতজ্ঞ পুত্র কলস পিতাকে বিজয়েশ্বর নামক তীর্থক্ষেত্রে রক্ষিত তাঁর ধনসম্পদসহ পুড়িয়ে মারার জন্য অগ্নি সংযোগ করলে বৃদ্ধ রাজার সমস্ত কিছু ব্যক্তিগত ধনসম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বৃদ্ধ অনন্তরাজ দুঃখে, অনুশোচনায় ১০৮১ খ্রীষ্টাব্দে আত্মহত্যা করেন।[৫]

পিতার এই শোচনীয় মৃত্যুতে কলসরাজের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি অতঃপর নিজেকে কাশ্মীরের একজন ন্যায়বান ও যোগ্য শাসনকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কাশ্মীরের বাইরের অনেকগুলি রাজ্য জয় করেন। ইতিমধ্যে লোহার নৃপতি ক্ষিতিরাজ সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে এবং নিজ সন্তানের প্রতি অনাস্থার কারণে কলসরাজের দ্বিতীয় পুত্র উৎকর্ষরাজকে লোহারের সিংহাসন দিয়ে যান। ফলে কাশ্মীর ও লোহার দুটি পার্বত্য রাজ্য একই শাসনাধীনে আসে। ১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলসরাজের মৃত্যু হলে তাঁর মনোনয়ন অনুসারে দ্বিতীয় পুত্র উৎকর্ষরাজ কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এই অবিচার জ্যেষ্ঠ পুত্র হর্ষ-রাজের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তিনি ভাই-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন (১০৮৯ খ্রীঃ) এবং কারাগারে নিক্ষেপ করলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভ্রাতার মৃত্যুর পর হর্ষরাজ কাশ্মীরের উন্নতির জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা চালান। নিজ রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হলে তিনি সেনাপতি কন্দর্পের নেতৃত্বাধীনে কাশ্মীরের বাইরের রাজ্যগুলিকে পুনরায় কাশ্মীরের অধীনে আনার জন্য চেষ্টা চালান। বাইরের অভিযানের খরচ এবং বিলাসের পিছনে খরচ করার ফলে রাজকোষে যে ঘাটতি দেখা দেয় তা পূরণের জন্য হর্ষরাজ বিভিন্ন কদর্য পন্থা অবলম্বন করতে থাকেন। বস্তুত এই সময় তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। তিনি মন্দিরের সমস্ত ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করেও ক্ষান্ত হননি ; মূল্য-বান ধাতুর তৈরী বিগ্রহগুলিকেও গালিয়ে সেগুলি রাজকোষে জমা করেন। এমনকি পায়খানার উপরও কর ধার্য করেছিলেন। তাঁর নৈতিক চরিত্রের এমনই অধঃপতন হয়েছিল যে, তিনি রাজঅন্তঃপুরের সংগৃহীত কুমারী কন্যাদের উপর লালসা চরিতার্থ করেও সাধ না মেটায় নিজ আত্মীয় কন্যাদের উপরও পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিলেন[৬]। অবশেষে লোহার বংশেরই অপর শাখার দুই ভ্রাতা উকল ও সুশল কাশ্মীরের অভিজাত পরিবারদের সাহায্যে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে হর্ষের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে হর্ষরাজ ও তাঁর পুত্র ভোজকে হত্যা করেন। এই-ভাবে হর্ষের কলুষিত শেষ জীবনের অবসান ঘটে (১১০১ খ্রীঃ)। কলহন তাঁর যে

চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, "……It appears that he was a learned person, a poet of some merit ; a courageous soldier and a conscientious judge. But then his was a character composed of contradictory qualities like cruelty and kindness, authority and anarchy, liberality and greed and other apparently irreconcilable features……"[৭]

হর্ষের পতন ঘটানোর পর অভ্যুত্থানকারী লোহার বংশের অপর শাখার দুই ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উক্কল ১১০১ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন এবং তিনি দশ বৎসর শাসন পরিচালনা করেন। সিংহাসন লাভের পর তা নিষ্কণ্টক করে তিনি কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে নজর দেন। সুযোগসন্ধানী ও ক্ষমতালোভী ধনী ও অভিজাত পরিবারগুলির সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অসাধু রাজকর্মচারীদের যে অশুভ আঁতাত সিংহাসনের পক্ষে সকল সময়েই ভীতির কারণ হয়ে থাকত, তিনি সেই দুষ্ট চক্রকে বহুলাংশে নষ্ট করেন। কিন্তু তাঁর দশ বৎসরের শাসন তাঁর পক্ষে শান্তিপূর্ণ হয়নি। কিছুকাল বাদে তাঁর ভ্রাতা ও লোহারের শাসনকর্তা সুশ্শল কুমন্ত্রণায় অগ্রজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অবশেষে সুশ্শলের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে কেন্দ্র করে উভয় ভ্রাতার মধ্যে আপাত শান্তি হয়। কিন্তু দামার নেতা ভীমভদ্র দর্দের রাজার সাহায্যে পূর্ববর্তী রাজা কলসের ভোজ নামে [হর্ষেরও এক পুত্রের নাম ছিল ভোজ, অভ্যুত্থানের সময় হর্ষসহ ভোজকেও হত্যা করা হয়] এক পুত্রের প্রতি সিংহাসনের দাবিতে পুনরায় অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করলে উক্কল কৌশলে সে বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু অদৃষ্ট উক্কলকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। তিনি যখন সিংহাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, সে সময় তাঁকে গুপ্তহত্যা করবার জন্য পদচ্যুত ও অপমানিত রাজকর্মচারীরা এক পরিকল্পনা তৈরি করে, এবং একদিন সেইমতো সুযোগ পেয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা রাজা উক্কলকে অন্দরমহলের পথে হত্যা করে (১১১১ খ্রীঃ)।[৮]

উক্কলের মৃত্যুর পর দামারা নেতা গর্গের আহ্বানে লোহারের শাসনকর্তা উক্কলের ভ্রাতা সুশ্শল কাশ্মীরের সিংহাসনে উপবেশন করেন (১১১২ খ্রীঃ)। সুশ্শল সিংহাসনে বসার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গুপ্তঘাতকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং রাজ্যে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘরে ও বাইরে বিরুদ্ধ শক্তি বারবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার ফলে তাঁকে যথেষ্ট বিব্রত অবস্থার মধ্যে রাজ্য পরিচালনা করতে হয়। তার উপর ১১২৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর প্রিয়তমা পত্নী রানী মেঘমঞ্জরীর মৃত্যুতে রাজা একেবারেই ভেঙে পড়েন এবং সিংহাসনে বীতস্পৃহ হয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহকে রাজমুকুট পরিয়ে দেন (১১২৩ খ্রী); কিন্তু ক্ষমতা নিজ আয়ত্তে রাখেন। জয়সিংহকে রাজত্ব দিয়েও যদি রাষ্ট্রক্ষমতা নিজ হাতে না রাখতেন, তাহলে হয়ত তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা হত না, যে অভ্যুত্থানে তিনি ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন।

বিদ্রোহীদের হাতে পিতা নিহত হবার পর জয়সিংহের আশঙ্কাছিল তাঁকে হয়ত সিংহাসনচ্যুত করা হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় তিনি রাজকার্যে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ সাতাশ বৎসর তিনি কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সাতাশ বৎসরের শাসনে জয়সিংহকে অনেকবার বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় এবং লোহার রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কাশ্মীর ও লোহারের উপর একচ্ছত্র অধিকার বজায় রেখেছিলেন। ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পরমানুক সিংহাসনে বসেন। তিনি ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করলে তাঁর পুত্র বন্তিদেব মতান্তরে বর্তিদেব রাজা হন। তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করার পর ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করলে প্রায় দেড়শত বৎসরের লোহার রাজবংশের অবসান হয়।[৯]

লোহার রাজবংশ

(১০০৩ খ্রীঃ—১১৭২ খ্রীঃ)

(১) সংগ্রামরাজ (১০০৩ খ্রীঃ—১০২৮ খ্রীঃ)
|
(২) হরিরাজ (২২ দিন)
|
(৩) অনন্তরাজ (১০২৮ খ্রীঃ—১০৬৩ খ্রীঃ)
|
(৪) কলসরাজ (১০৬৩—১০৮৯ খ্রীঃ)
|
(৫) উৎকর্ষরাজ (১০৮৯ খ্রীঃ—১০৮৯ খ্রীঃ)
|
(৬) হর্ষরাজ (১০৮৯ খ্রীঃ—১১০১ খ্রীঃ)
|
(৭) উকলরাজ (১১০১ খ্রীঃ—১১১১ খ্রীঃ)
|
(৮) সুশলরাজ (১১১২ খ্রীঃ—১১২৮ খ্রীঃ)
|
(৯) জয়সিংহ (১১২৮—১১৫৫ খ্রীঃ)
|
(১০) পরমানুক (১১৫৫—১১৬৫ খ্রীঃ)
|
(১১) বন্তিদেব বা বর্তিদেব (১১৬৫ খ্রীঃ—১১৭২ খ্রীঃ)

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. Ancient India / Dr. R. C. Mazumdar / Motilal Banarsidas / Edition 1964 / p. 359

২. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society 1957 / p-59

৩. ibid, p. 60

৪. ibid, p. 60

৫. ibid, p. 61

৬. ibid, p. 64

৭. ibid, pp. 65-66

৮. ibid, p. 68

৯, ibid, p. 75

একাদশ অধ্যায়

দেব বংশ

(১১৭২ খ্রীঃ—১৩৩৮ খ্রীঃ)

১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে লোহার বংশের অবসানে কাশ্মীরের শূন্য সিংহাসনে বসবার জন্য নাগরিকবৃন্দ বাপ্পাদেব মতান্তরে বোপ্যাদেবকে নির্বাচিত করেন। তিনি অতি অযোগ্যতার সঙ্গে আট বৎসর রাজত্ব করে ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যাবার পর ভ্রাতা যশক সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি তাঁর অগ্রজের চেয়েও অপদার্থ থাকায়, রাজ্যে বিশৃংখলার সুযোগে দামারা প্রধানরা নিজেদের রাজ্যের মধ্যে শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। রাজা যশক আঠারো বৎসর নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে সিংহাসনে থাকার পর তাঁর পুত্র জগদেব ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সিংহাসনে বসেন। রাজা জগদেব আমলাতন্ত্রের কবল থেকে রাজ্যকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। এর পর তাঁর পুত্র রাজদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ২২ বৎসর রাজত্ব করার পর ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে পুত্র সংগ্রামদেব গতানুগতিক শাসনব্যবস্থায় না গিয়ে অভিজাততন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের শক্তির উৎসগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। সংগ্রামদেবের এই চেষ্টার ফলে ওই কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে ঘা পড়ার আশংকায় তারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রাজার অনুগত সৈন্য এবং অভিজাত ও আমলাদের প্রভাবাধীন সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধের সঙ্গে প্রজারাও দুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় বিবাদ প্রায় গৃহযুদ্ধের আকার নেয়। অবশেষে কিছু প্রতিশোধপরায়ণ ব্রাহ্মণ (কেউ কেউ বলেন কবি ঐতিহাসিক কলহনের বংশধররা) রাজা সংগ্রামদেবকে হত্যা করে (১২৫২ খ্রীঃ)[১]। সংগ্রামদেবের মৃত্যুতে পুত্র রামদেব সিংহাসনে বসার পর রাজ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। তাঁর সে চেষ্টায় রানী সমুদ্রদেবী স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। রামদেব রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ও মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। তিনি ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রামদেব অপুত্রক থাকায় দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন[২]। দত্তকপুত্র লক্ষ্মণদেব যোগ্যতার সঙ্গে রাজত্ব পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু কজ্জল নামের এক তুর্কী মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন (১২৮৬ খ্রীঃ)[৩]। লক্ষ্মণদেবের মৃত্যুর পর উপত্যকায় এক নৈরাজ্য চলে। সিংহাসনের উপর দুজন দাবিদার তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা তথা সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। একজন লোহারের শাসনকর্তা সংগ্রামচন্দ্র এবং অপরজন সৈন্যাধ্যক্ষ সিংহদেব[৪]। শেষ পর্যন্ত সিংহদেব কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করলেও যতদিন সংগ্রামচন্দ্র জীবিত ছিলেন, ততদিন সিংহদেব কাশ্মীরের উপর একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। সংগ্রামচন্দ্রের মৃত্যুতে সিংহদেব

নিরুদ্বেগচিত্তে কাশ্মীরের শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কিন্তু রাজ্যে স্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার পর তিনি বিলাস-ব্যসনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এবং শেষে নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ হারান[৫]। সিংহদেবের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা সহদেব কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন।

সহদেবের রাজত্বকালে ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহমীর বা শাহমীর্জা নামে একজন ভাগ্যান্বেষী মুসলমান উদ্বাস্তু পাঞ্জাব থেকে সপরিবারে কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহমীর সহদেবের দরবারে ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্যে নিযুক্ত হন এবং নিজ সাহস, অধ্যবসায় দিয়ে কাশ্মীরের অধিকার বাড়িয়ে রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন। কিছুকাল বাদে উপত্যকায় দুবার বিদেশী আক্রমণ ঘটে। প্রথমবার আসেন কান্দাহার রাজের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দলুক। তিনি কাশ্মীর উপত্যকাকে ছারখার করে দিয়ে যান। Dr. S. C. Roy এর ভাষায় "···whatever prosperity Kashmir had enjoyed during the early years of Suhadeva's reign, was destroyed by Doluca's invasion, 'Kashmir became almost like a region before the creation, a vast field with a fewmen, without food and full of grass.'"[৬]

দ্বিতীয় আক্রমণকারী ছিলেন তিব্বতের রাজকুমার রিন-চেন। এই সময় সহদেব আত্মীয় রামচন্দ্রের সহায়তায় রিনচেনের অগ্রগতি রোধ করেন; কিন্তু রিন-চেন অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা সহদেবকে হত্যা ক'রে কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন (১৩২০ খ্রীঃ)। কিছুদিন পরে রামচন্দ্রের মৃত্যু হলে তাঁর পত্নী কোটা-দেবীকে রিন-চেন বিয়ে করেন[৭]। মুসলমান শাহমীরকে পূর্বের মতোই রাজকীয় পদে রিন-চেন বহাল রাখেন এবং তাঁর সাহায্যে কাশ্মীরের শাসনব্যবস্থায় স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনেন। এই তিব্বতী রাজপুত্র তথা কাশ্মীররাজ রিন-চেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন বলে আবুল ফজল বলে গেছেন। তিনি হিন্দুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।[৮] কিন্তু তিনি যেভাবে সিংহাসন দখল করেছিলেন, সেইভাবেই ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান (১৩২৩ খ্রীঃ)।

রিন-চেনের মৃত্যুর পর শাহমীর রিন-চেনের পুত্র হায়দারকে সিংহাসনে না বসিয়ে দেববংশীয় হিন্দুরাজাদের এক বংশধর উদয়নদেবকে আহ্বান করে তাকেই কাশ্মীররে সিংহাসনে বসান। তিনি সিংহাসনে বসে কোটাদেবীকে বিয়ে করে রানী করেন।[৯] শাহমীর আদৌ সৎ বা সাধু উদ্দেশ্যে উদয়নদেবকে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসতে সুযোগ দিয়েছিলেন চিন্তা করলে ভুল হবে। তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বৃহত্তর সুযোগ গ্রহণের জন্যই উদয়নদেবকে সিংহাসনের সুযোগ দিয়েছিলেন। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উদয়নদেব মারা যাবার পর রানী কোটাদেবী স্বামীর সিংহাসনে বসেন। এইবার শাহমীর সুযোগ বুঝে অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তা

ব্যর্থ হওয়ায় রানী কোটাদেবী দরবারের অনুরোধে রাজদ্রোহের অপরাধে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত শাহমীরের দণ্ড মকুব করেন। যার ফলে কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে মুসলমান রাজত্বের সূচনা ঘটে। Dr. S. C. Roy এর ভাষায়, "Sahamera succeeded to oust and then to kill Bhatta-Bhiksana, the Brahmana minister of Kotadevi. The queen was in a position to bring the murderer before her and to inflict punishment over him but the counsels of her own men, who undoubtedly had been bribed by Sahamera, dissuaded her from taking the action. The opportunity, thus allowed to slip away, never came again. Once, while the queen had been to Jayapidapura, Sahamera seized the capital. Kotadevi who was now besieged in the fort of Joyapura had to surrender on the explicit condition that she would share her bed and throne with Sahamera. After a day's married life she was imprisoned along with her two sons where they ultimately died and Sahamera ascended the throne under the title of Sultan Shamsud-din (1338 A.D.)"[১০]

এইভাবে হতভাগিনী মহারানী কোটাদেবী চারবার (রামচন্দ্র, রিনচেন উদয়নদেব এবং শাহমীর) স্বামী পরিবর্তনে ও ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য হয়েও নিজের জীবনটুকু রক্ষা করতে পারলেন না। স-সন্তান কোটাদেবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্বের অবসান হল এবং শুরু হল মুসলমান রাজবংশের শাসন বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার মধ্য দিয়ে। সময় ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

দেব বংশ

(১১৭২ খ্রীঃ—১৩৩৮ খ্রীঃ)

(১) বাপ্পাদেব (১১৭২ খ্রীঃ—১১৮০ খ্রীঃ)
|
(২) যশশক (১১৮০ খ্রীঃ—১১৯৮ খ্রীঃ)
|
(৩) জগদেব (১১৯৮ খ্রীঃ—১২১৩ খ্রীঃ)
|
(৪) রাজদেব (১২১৩ খ্রীঃ—১২৩৫ খ্রীঃ)
|
(৫) সংগ্রামদেব (১২৩৫ খ্রীঃ—১২৫২ খ্রীঃ)
|
(৬) রামদেব (১২৫২ খ্রীঃ—১২৭৩ খ্রীঃ)
|
(৭) লক্ষ্মণদেব (১২৭৩ খ্রীঃ—১২৮৬ খ্রীঃ)
|
(৮) সিংহদেব (১২৮৬ খ্রীঃ—১৩০১ খ্রীঃ)
|
(৯) সহদেব (১৩০১ খ্রীঃ—১৩২০ খ্রীঃ)
|
রিন-চেন (১৩২০ খ্রীঃ—১৩২৩ খ্রীঃ)
|
(১০) উদয়ন দেব (১৩২৩ খ্রীঃ—১৩৩৮ খ্রীঃ)
|
(১১) কোটাদেবী (১৩৩৮ খ্রীঃ—১৩৩৮ খ্রীঃ)

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. Early History and Culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society / 1957 / p. 76
২. ibid, p. 77
৩. ibid, p. 77
৪. ibid, p. 77
৫. ibid, p. 77
৬. ibid, p. 78
৭. ibid, p. 78
৮. ibid, p. 78
৯. ibid, p. 79
১০. ibid, p. 80

দ্বাদশ অধ্যায়

শাহ রাজবংশ

(১৩৩৮ খ্রীঃ—১৫৬১ খ্রীঃ)

ও

গাজী শাহবংশ

(১৫৬১ খ্রীঃ—১৫৮৯ খ্রীঃ)

শাহমীর যেদিন ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে সহদেবের রাজসরকারে কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন, সেদিনই কাশ্মীরের ভাগ্যাকাশে ইসলাম রাজত্বের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য শাহমীর ঠিক কোন্ রাজার রাজত্বে এসেছিলেন, এ নিয়ে মতানৈক্য আছে। Dr. S. C. Roy-এর ভাষায়, "...In the year 1313 a Muslim adventurer called Sahamera migrated to Kashmir along with his family, probably from the Punjab side...."[১] কিন্তু অপর ঐতিহাসিক লেফটানেন্ট কর্নেল স্যার ওয়েলেসলী হেগের মতে, "Islam was introduced into Kashmir at the beginning of the fourteenth century of the Christian era by Shah Mirza, an adventurer from Swat, who in 1315 entered the service of Sinha Deva, a Chieftain who had established his authority in the Valley of Kashmir".[২] Dr. S. C. Roy-এর মতে শাহমীর কাশ্মীরে এসেছিলেন ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সহদেবের রাজত্বকালে; কারণ তিনি সহদেবের রাজত্বকাল দেখিয়েছেন ১৩০১ খ্রীঃ থেকে ১৩২০ খ্রীঃ পর্যন্ত। কিন্তু কর্নেল হেগ দেখিয়েছেন শাহমীর এসেছিলেন সিংহদেবের রাজত্বে, এবং শাহমীর সিংহদেবের দরবারে রাজকর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন একজন ভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন নিশ্চয়ই, এবং সে ভ্রান্তি ঘটেছে সময় গণনার ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে। Dr. S. C. Roy-কেই বেশি সঠিক বলে মনে হয়। কারণ তাঁর গণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেল না। সিংহদেব রাজত্ব করেছিলেন পনেরো বৎসর, সহদেব উনিশ বৎসর, তিব্বতী শাসক রিন-চেন তিন বৎসর এবং সর্বশেষ উদয়নদেব রাজত্ব করেছিলেন পনেরো বৎসর। এই চারজন শাসকের মোট রাজত্বকাল (১৫+১৯+৩+১৫) বা ৫২ বৎসর। শাহমীর বা শাহমির্জা শেষ শাসক উদয়নদেবের স্ত্রী কোটাদেবীকে হত্যা করে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন একথা Dr. R. C. Majumdarও বলে গেছেন, "...the old story of a succession of rebellions and internal disturbances repeated itself till 1339 A. D., when Shah Mir deposed queen Kota, the widow of the last Hindu ruler, and founded a Muhammadan

dynasty."[৩] যদি ধরেও নিই যে, শাহমীর মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে সিংহদেবের রাজদরবারে চাকরি পেয়েছিলেন, তাহলে কোটাদেবীকে হত্যা করে সেই সিংহাসন তাঁকে পেতে হয়েছিল (৫২+২০) বা প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে। শুধু তাই নয়, কর্নেল হেগ বলেছেন শাহমীর ঐ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর ভাষায়, "...Shah Mirza then forcibly married her, and before she had been his wife for twenty four hours, imprisoned her and ascended the throne in 1346, under the title of Shams ud-din Shah."[৪] যদি এই হিসাব অর্থাৎ শাহমীরের সিংহাসনারোহণ ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল ধরে নিই, তাহলে কর্নেল হেগকে অনুসরণ করে বলতে হয় শাহমীর প্রায় (৭২+৮) বা ৮০ বৎসর বয়সে কোটাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন এবং কাশ্মীরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন, যেটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু Dr. S. C. Roy-এর বিবরণকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, অর্থাৎ ১৩০১ খ্রীঃ থেকে ১৩২০ খ্রীঃ পর্যন্ত যদি সহদেবের রাজত্বকাল ধরা হয়, তাহলে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহমীরের কাশ্মীরের সিংহাসন দখলের একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে। যদি ধরে নিই শাহমীর ২৫ বৎসর বয়সে ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের রাজদরবারে চাকরি পেয়েছিলেন এবং ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করেছিলেন, তাহলে তখন তাঁর বয়স হবে ২৫ +(১৩৩৮—১৩১৫) বা ৪৮ বৎসর। এর সঙ্গে যদি কর্নেল হেগের মতানুযায়ী শাহমীর্জার কাশ্মীর দখল ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ধরেও নিই তাহলে সে সময় শাহমীরের বয়স হয়েছিল (৪৮+৮) বা ৫৬ বৎসর, যেটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। Dr. S.C. Roy এবং Dr. R.C. Majumdar উভয় ঐতিহাসিকই শাহমীরের চাকরিপ্রাপ্তি এবং সিংহাসনপ্রাপ্তির মধ্যে তেইশ বৎসরের (১৩৩৮—১৩১৫) ব্যবধান ছিল বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কর্নেল হেগ দেখিয়েছেন ৩১ বৎসর (১৩৪৬—১৩১৫)। Dr. S. C. Roy এবং R. C. Majumdar-এর সিদ্ধান্তই সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়। অর্থাৎ শাহমীর কাশ্মীর উপত্যকায় এসেছিলেন সিংহদেবের রাজত্বে নয়, সহদেবের রাজত্বকালে ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে, এবং ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজসরকারে চাকরি পেয়েছিলেন, এবং তিনি ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেছিলেন ; কর্নেল হেগের গণনা অনুযায়ী ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নয়। শাহমীর বা সামস-উদ-দীন কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর পূর্ববর্তী দেব বা লোহার বংশীয় হিন্দু রাজাদের অপেক্ষা যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। তিনি ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁর চার পুত্র জামশেদ, আলাশের, সিরাসমক এবং হিন্দালের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জামশেদ সিংহাসনে বসলেও এক বৎসরের বেশি শাসনক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি। তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা আলাশের তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে 'আলা-উদ-দীন' নাম নিয়ে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দিন ৯ বৎসর রাজত্ব করে মারা গেলে পরবর্তী ভ্রাতা যাঁকে তিনি

প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন, সেই সিরাসমক ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিহাব-উদ-দীন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সিহাবুদ্দিন রাজোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি কেবল সুশাসকই ছিলেন না, ছিলেন বীর যোদ্ধাও। তিনি আফগানিস্থানসহ হিন্দুকুশ পর্যন্ত নিজ অধিকারে আনেন। সিহাবুদ্দিন উনিশ বৎসর রাজত্ব করার পর ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা হিন্দাল কুতব-উদ-দীন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সিহাবুদ্দিন সম্ভবত তাঁর দুই পুত্র হাসানখান ও আলীখানের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সিংহাসনের মনোনয়ন না দিয়ে ভ্রাতা হিন্দালকে সিংহাসন দিয়ে যান। হিন্দাল অর্থাৎ কুতব-উদ-দীন ষোল বৎসর রাজত্ব করে ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। কুতব-উদ-দীনের রাজত্বের প্রথমাংশে দীর্ঘদিন তাঁর কোনও পুত্রসন্তান না হওয়ায় ভ্রাতুষ্পুত্র হাসান খাঁকে দিল্লী থেকে নিয়ে আসেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে। কিন্তু অধীর, অকৃতজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী হাসান খুল্লতাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য। এই অপকর্মে তাকে সাহায্য করে কুতব-উদ-দীনের একজন হিন্দু সভাসদ। যথাসময়ে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় উভয়ে লাহোর কোটে পালিয়ে যায়। কিন্তু সেখানকার ফৌজদার তাদের বন্দী করে কাশ্মীরে প্রেরণ করলে তিনি হিন্দু সভাসদকে মৃত্যুদণ্ড এবং হাসানকে কারাদণ্ড দেন। শেষ বয়সে হিন্দালের দুটি সন্তান জন্মায়—একটির নাম সিকান্দার খাঁ, অপরটি হায়বত খাঁ।

কুতব-উদ-দীন ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে সিংহাসনের দখল নিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয় বেগম সুরার ইন্ধনে ও নির্দেশে। কুতবুদ্দিনের বিধবা পত্নী বেগম সুরা এক অদ্ভুত চরিত্রের নারী ছিলেন। ইতিপূর্বেও কাশ্মীরের ইতিহাসে হিন্দুরাজত্বে আমরা বিবরণ পেয়েছি একাধিক রাণীর সিংহাসনকে ঘিরে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র করতে ও নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু এই সুরা বোধহয় নির্মমতায় সকলকে ছাড়িয়ে যায়। স্বামী কুতবুদ্দিন মারা যাবার পরই সিকান্দারকে সিংহাসনে বসানোর জন্য এবং সিংহাসন নিরাপদ করার জন্য নিজ কন্যা, জামাতা এবং অপর পুত্র হায়বত খাঁকে রাই মাদারী নামে একজন হিন্দু সভাসদকে দিয়ে বিবিধ উপায়ে হত্যা করান। এবং এই কুকার্যের প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য রাই মাদারীর নামেই রাজার কাছে নালিশ আনেন কন্যা-জামাতা ও পুত্রের হত্যার বিচারের জন্য; যাতে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। রাই মাদারী বেগতিক দেখে তিব্বতে গিয়ে বিদ্রোহ করেন; কিন্তু সিকান্দার সেই বিদ্রোহ দমন করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলে সেখানে সে আত্মহত্যা ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

এই সিকান্দার খাঁ সম্ভবত তাঁর মাতা সুরার নির্মমতা ও জিঘাংসার ধারাই বেশী বহন করেছিলেন তাঁর রক্তে। তিনি ছিলেন কাশ্মীরের হিন্দু প্রজাদের কাছে দিনের বিভীষিকা, রাতের দুঃস্বপ্ন। তিনি তাঁর পূর্বের মুসলমান শাসকদের গৃহীত উদার নীতির প্রায়শ্চিত্ত শুরু করলেন হিন্দু মন্দির ও হিন্দু প্রজাদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। তিনি হিন্দু প্রজাদের উপর উদাহরণ শূন্য নির্যাতন চালিয়ে প্রায় সমস্ত হিন্দুদের

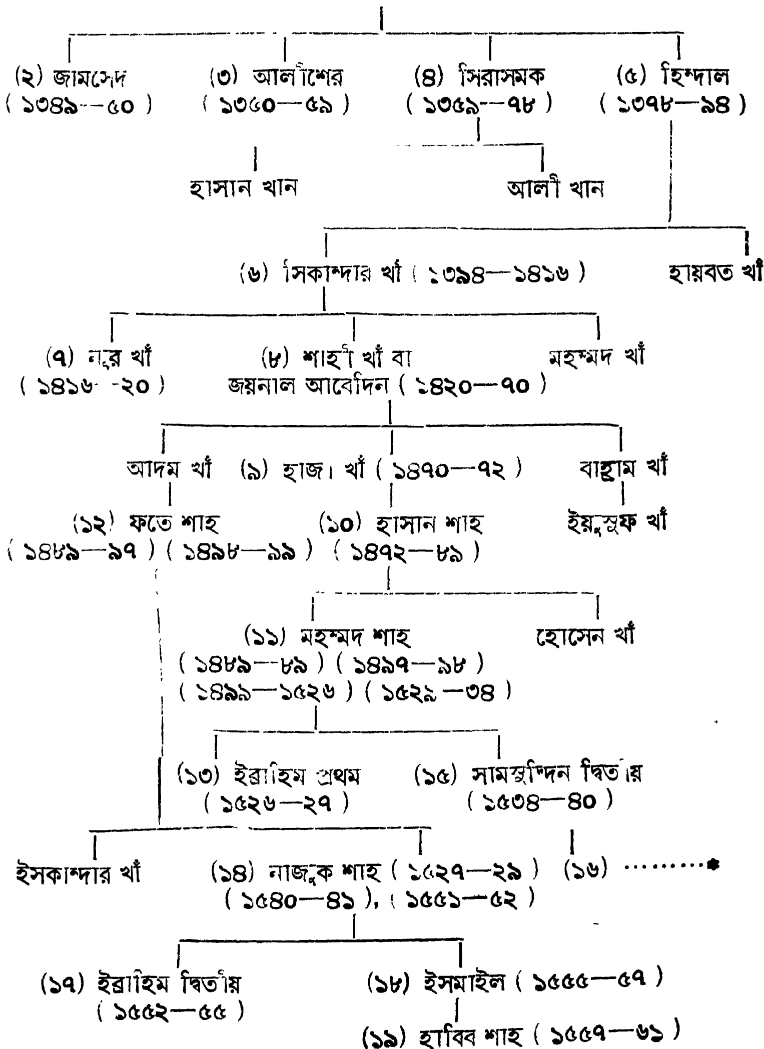
হত্যা করলেন অথবা কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়া করলেন। কর্নেল হেগের ভাষায়, "...He destroyed all the most famous Hindu temples in Kashmir, and the idols which they contained, converting the latter, when made of the precious metals, into money. His enthusiasm was kept alive by his minister, Sinha Bhat, a converted Brahman, with all a convert's zeal for his new faith, who saw to it that his master's hostility extended to idolators as well as to idols. With many innocuous Hindu rites the barbarous practice of burning widows with their deceased husbands was prohibited, and finally the Hindus of Kashmir were offered the choice between Islam and exile. Of the numerous Brahmans some chose the latter, but many committed suicide rather than forsake either their faith or their homes. Others, less steadfast, accepted Islam, and the result of Sikandar's zeal are seen to-day in Kashmir, where there are no more than 524 Hindus in every 10,000 of the population. The ferocious bigot earned the title of Butshikan, or the Iconoclast.[৫] আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতেও সিকান্দর খাঁর হিন্দুবিদ্বেষের কথা লিখে গেছেন। তাঁর ভাষায় "...সুলতান সিকান্দার গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, যে বিধর্মী মুসলমান না হইত, তিনি তাহার শিরশ্ছেদন করিতেন..."[৬]

এই হিন্দুবিদ্বেষী ও হিন্দুধর্ম ধ্বংসকারী মুসলমান শাসক বাইশ বৎসরের শাসনে কাশ্মীর উপত্যকাকে হিন্দুশূন্য করে দিয়ে ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন মারা যায়, তখন তার তিন সন্তান নুর খাঁ, শাহী খাঁ ও মহম্মদ খাঁর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নুর খাঁ 'আলী শাহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। হিন্দু কুলাঙ্গার সিংহভাটের সাহায্যে নুর খাঁর রাজত্বেও হিন্দু নিধন নিপীড়ন সমানে চলে। কিন্তু ভ্রাতা শাহী খাঁ এই হিন্দুধ্বংস যজ্ঞ থেকে নুর খাঁকে বিরত করতে গিয়ে তাঁর বিরাগভাজন হন এবং কাশ্মীর ছেড়ে চলে যান। কিন্তু পরে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে নবউদ্যমে অত্যাচারী-শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি 'জয়নাল আবেদিন' উপাধি নিয়ে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। জয়নাল আবেদিন সিংহাসনে বসার পর তাঁর পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্তে মন দেন। পূর্ববর্তী শাসকদের সৃষ্ট উক্ত মরুভূমির উপর তিনি সবুজ সৃষ্টির চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এইরূপ নিরপেক্ষ এবং সর্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল মুসলমান শাসকের সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে সম্রাট আকবরের। কর্নেল হেগের ভাষায়, "Zain-ul-Abidin may be regarded as the Akbar of Kashmir...he practised a tolerance which Akbar only

preached, and found it possible to restrain, without persecution, the bigotry of Muslim zealots. He was in all respects, save his love of learned society, the antithesis of his father, the Iconoclast, and in the one respect in which he most resembled him he most differed from him in admitting to his society learned Hindus and cultural Brahmans. ···Zain-ul-Abidin was proficient in Persian, Hindi and Tibetan, besides his own language, and was a munificent patron of learning poetry, music, and painting. He caused the Mahabharata and the Rajatarangini, the metrical history of the rajas of Kashmir, to be translated from Sanskrit into Persian, and several Arabic and Persian works to be translated into the Hindi language, and established Persian as the language of the Court and of Public Offices."[৭] এই নিরপেক্ষ, সর্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল, চারুকলা-প্রেমিক, জ্ঞানী ও প্রজাবৎসল শাসক দীর্ঘ ৫০ বৎসর রাজত্ব করে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন বেহেস্তে গমন করেন, সেদিনটি ছিল কাশ্মীরের প্রজাদের বিশেষত অবশিষ্ট কতিপয় হিন্দু প্রজাদের বড়ই দুর্দিন। কারণ, তার পরবর্তী সময়ে সিংহাসন ও ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে অকর্মণ্য ও অপদার্থ শাসকদের মধ্যে কেবল ষড়যন্ত্র, শাসন, শোষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অবশেষে গাজী খাঁ ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে শাহমীরের শেষ বংশধর হাবিব শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে গাজী শাহ উপাধি নিয়ে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। সংশেষে গাজী শাহের বংশধরদের নিকট থেকে কাশ্মীরের শাসনভার চলে আসে সম্রাট আকবরের হাতে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট। শুরু হয় কাশ্মীরে মোগল শাসন।

শাহমীরের বংশ

(১৩৩৮ খ্রীঃ—১৫৬১ খ্রীঃ)



* (১৬) মীর্জা হায়দার [মোগল] (১৫৪১-৫১ খ্রীঃ)

গাজীশাহের বংশ

(১৫৬১ খ্রীঃ—১৫৮৯ খ্রীঃ)

(১) গাজী শাহ (১৫৬১—৬৩)
|
(২) নাসিরুদ্দিন হোসেন শাহ (১৫৬৩—৬৪)
|
(৩) আলী শাহ (১৫৬৯—৭০)
|
(৪) ইয়ুসুফ শাহ (১৫৭৮—৭৯)
|
(৫) ইয়াকুব শাহ (১৫৮৫—৮৯)

প্রসঙ্গ পঞ্জী

১. Early History and culture of Kashmir / Dr. S. C. Roy / The Asiatic Society / p. 77

২. The Cambridge History of India / Vol. III / Lt. Col. Sir Wolseley Haig / S. Chand & Co. Delhi / 1928 / p. 277

৩. Ancient India / Dr. R. C. Mazumdar / Matilal Banarasidas / 1964 / p. 362

৪. The Cambridge History of India / Vol. III / Lt. Col. Sir Wolseley Haig / S. Chand & Co., Delhi / 1928 / p. 277.

৫. ibid / p. 280,

৬. আইন-ই-আকবরী / বঙ্গানুবাদ ১৮৯৭ / পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় / বসুমতী কার্যালয় কলিকাতা / পৃ. ১০৬

৭. The Cambridge History of India / Vol. III / Lt. Col. Sir Wolseley Haig / S. Chand & Co., Delhi / 1928 / pp. 281-282

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মোগল অধিকার

(১৫৮৯ খ্রীঃ—১৭৫২ খ্রীঃ)

১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট ছিল কাশ্মীরবাসীদের কাছে একটি শুভদিন। ঐ তারিখে কাশ্মীর রাজ্য সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মহান সম্রাট আকবরের অধীনে কাশ্মীরের শাসনব্যবস্থায় স্থিরতা ফিরে আসে। তিনি তিনবার কাশ্মীর উপত্যকা পরিভ্রমণে আসেন। শাসনব্যবস্থায় স্থিরতা আসায় কাশ্মীরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও স্থিরতা ফিরে আসে। কাশ্মীরকে তিনি এতোখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, তিনি এটিকে সুবায় পরিণত করেন। 'সুবে কাশ্মীর'-এর অন্তর্গত ছিল কাশ্মীর, সেকেল, ভিম্ব, সিউরাঙ্গ, বিজোরা, লম্জাহার এবং জাবুলিস্থান। কাশ্মীর উপত্যকার তখনকার ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ও প্রাকৃতিক দিকগুলি আবুল ফজল যেভাবে সরস বর্ণনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'তে, এখানে তার সবটাই উদ্ধৃত হচ্ছে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে।

সুবে কাশ্মীর

"কাশ্মীর, সেকেল, ভিম্ব, সিউরাঙ্গ, বিজোরা, লম্জাহার এবং জাবুলিস্থান লইয়া কাশ্মীর সুবা সংগঠিত। পূর্ব্বে গজনীও ইহার অন্তর্গত ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর কাশ্মীরের অন্তর্গত নহে; ইহা কাবুলের অন্তর্গত। এই সুবার পূর্ব্ব-সীমা টীরিস্থান ও চেনাব নদী, দক্ষিণপূর্ব্বে কনকুল এবং জম্বুর পর্ব্বতমালা, উত্তরপূর্ব্বে তিব্বত দেশ, পশ্চিমে পেখেলী, দক্ষিণপশ্চিমে গোখর রাজ্য, উত্তর-পশ্চিম তিব্বত দেশ। এই সুবা উচ্চ পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। হিন্দুস্থান হইতে এই সুবায় প্রবেশের ছাব্বিশটী পথ আছে, তন্মধ্যে ভিম্ব এবং সেখেলীর পথই উৎকৃষ্ট। কারণ, এই দুই পথে অশ্বারোহণে গমন করা যায়। পাদশাহ তিনবার টীরাপঞ্চালের পথে কাশ্মীরভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই পথের পর্ব্বতসকলের উপরে যদি গো বা অশ্ব হত্যা করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি ও বরফপতন হয়। এই সুবায় চিরবসন্ত বিরাজমান। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এখানকার জল উৎকৃষ্ট, নানাজাতীয় পুষ্প সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকে, পৃথিবীর মধ্যে এমন সুন্দর ও মনোহর উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। এখানকার গৃহ-সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত। গৃহের ছাদ পুষ্পিত লতাপল্লবে আবৃত থাকে; গৃহগুলি ত্রিতল, চৌতল এবং পঞ্চতল পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এ দেশে সর্ব্বদাই ভূমিকম্প হয়, সেইজন্যই এখানকার লোক ইষ্টক বা প্রস্তরদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে না। কিন্তু এখানে ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত পুরাতন হিন্দু দেবমন্দির আছে, তাহার

প্রস্তরগুলি মোটেই নষ্ট হয় নাই। এখানে উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হয়, এই শাল পৃথিবীর সর্বত্র নীত হয়। কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হইলেও এখানে দস্যু, চৌর অথবা ভিক্ষুক মোটেই নাই। চেরী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ফলই এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে গুটিপোকারও চাষ হয়। এখানকার অধিবাসিগণ অন্ন, মৎস্য এবং তরকারী আহার করে; এ দেশে যবের প্রচলন আছে। এখানকার লোকে পূর্বদিনে রন্ধন করিয়া রাখিয়া পরেরদিন সেই অন্ন আহার করে। শাক-সবজী গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া রাখে এবং শীতকালে সেই সমস্ত তরকারী ব্যবহার করে। এখানে প্রচুর পরিমাণে চাউল জন্মে, কিন্তু এখানকার চাউল তত উৎকৃষ্ট নহে। এখানে হান্তু নামে একপ্রকার মেষ পাওয়া যায়, তাহাদের মাংস অতি সুস্বাদু। এ দেশের লোকেরা পশমী বস্ত্রই সর্বদা ব্যবহার করে। এখানকার গাভীসকল দেখিতে কুৎসিত হইলেও তাহারা প্রচুর দুগ্ধ দান করে। এ দেশের লোকেরা শিল্পকর্মে নিপুণ। কাশ্মীরদেশের চলিত ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহাদের পুস্তকাদি সংস্কৃতভাষায় লিখিত। তাহাদের অক্ষর দেব অক্ষর হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ইহারা প্রধানতঃ ভূর্জপত্রেই লিখিয়া থাকে। ভূর্জপত্র সহজে নষ্ট হয় না, পুরাতন পুঁথিসকল ভূর্জপত্রেই লিখিত। ইহাদের প্রস্তুত কালী এমন উৎকৃষ্ট যে, বহুদিনেও লেখা অস্পষ্ট হয় না। এখানকার অধিবাসী মুসলমানেরা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। এ দেশে অনেক গায়ক আছে। এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসি-গণের নাম ঋষি। তাঁহারা ভগবানের প্রকৃত উপাসক, ইহারা অন্য ধর্মসম্প্রদায়কে ঘৃণা করে এবং মৎস্য-মাংস স্পর্শ করে না। কাশ্মীরে এই জাতীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা দুই হাজারেরও অধিক। হিন্দুগণ কাশ্মীরকে পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া থাকে। এখানে পঁয়তাল্লিশটী স্থান মহাদেবের নামে উৎসর্গীকৃত, চৌষট্টিটী স্থান বিষ্ণুর অধিষ্ঠানভূমি, তিনটি ব্রহ্মার এবং বাইশটী দুর্গার অধিষ্ঠানস্থান। সাতশত স্থানে সর্পমূর্ত্তি আছে। এ দেশের লোক সর্পের পূজা করে।

শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। এই নগর বহুকাল হইতে অতীব সমৃদ্ধি-শালিনী। এখানে অনেক শিল্পীর বাস। এখানকার জুমা এবং পট্টু নামে শাল সর্বোৎকৃষ্ট। এই নগরের পূর্বদিকে সলিমান নামে একটী পাহাড় আছে। সহরের নিকট দুইটী বৃহৎ হ্রদ আছে, এই হ্রদদ্বয়ের জল তুলিয়া রাখিলেও অনেকদিন পর্যন্ত ভাল থাকে। বীরিণ সহরের নিকটে একটি জলাশয় আছে। হিন্দুগণ উহার জলকে পরম পবিত্র মনে করে। এই জলাশয় বৎসরের এগারমাস শুষ্ক থাকে, এপ্রেল মাসে দুইটী ঝরণা খুলিয়া যায়। এই দুইটী ঝরণার একটীর নাম সন্ধ্যাবারি, অপরটীর সত্যবারি। এই দুই ঝর্ণার জলে জলাশয়টী পরিপূর্ণ হয় এবং এপ্রেল মাস গত হইতে না হইতেই সমস্ত জল শুকাইয়া যায়। যাত্রীগণ এই দুই ঝর্ণার যে কোনটীর নামে উৎসর্গ করিয়া পুষ্প নিক্ষেপ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি যে ঝর্ণার নাম করিয়া পুষ্প নিক্ষেপ করেন, জল শুকাইলে দেখা যায় সেই পুষ্প সেই ঝর্ণার নিকটেই রহিয়াছে। এখানে আর একটী ঝর্ণা আছে, তাহার নাম,

কুকুরনাগ। এই ঝর্ণার জলে ক্ষুধাতৃষ্ণা উভয়ই দূর হয়। ইহারই অল্পদূরে আর একটী ঝরণা আছে, তাহার মধ্যস্থলে একটী দেবমন্দির আছে। সাধু-সন্ন্যাসীগণ গ্রীষ্মকালে এই মন্দিরের নিকট অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে পুড়িয়া মরে। তাহাদের বিশ্বাস, এই প্রকারে আত্মবিসর্জ্জন করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। কিম্বদন্তী আছে, এখানকার আর একটী ঝর্ণার মধ্যে পরশপাথর আছে। এই প্রদেশে নন্দীমার্গ নামে একটী সুন্দর সমতলভূমি আছে। পুনপুর নামক স্থানের নিকটে দ্বাদশ সহস্র বিঘা জমিতে উৎকৃষ্ট জাফরাণ উৎপন্ন হয়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত এই সকল জাফরাণক্ষেত্রের এমন শোভা হয় যে, নিতান্ত কঠোর-হৃদয় ব্যক্তিও সে দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া যায়। রেবন সহরে একটী নির্ঝর আছে; এ দেশের লোকের বিশ্বাস, এই নির্ঝর হইতেই সর্ব্বপ্রথম জাফরাণের বীজ বহির্গত হয়; সেই জন্য এ দেশের লোক এই ঝরণায় দুগ্ধ ঢালিয়া পূজা করে। এই দুগ্ধ ঢালিয়া এ দেশের লোকেরা আর একটী বিষয় অবগত হয়; দুগ্ধ যদি ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে পূজকের মঙ্গল হয় এবং দুগ্ধ যদি উপরে ভাসিতে থাকে তাহা হইলে তাহার অমঙ্গল হয়; এ মঙ্গলামঙ্গল অন্য বিষয়ে নহে, ক্ষেত্রে জাফরাণ ভাল জন্মিলেই মঙ্গল, ভাল না জন্মিলেই অমঙ্গল।

মেরুবর্দ্ধন গ্রাম তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত: ইহার নিকটে ছত্রকূট নামে একটী পর্ব্বত আছে, উহা সর্পের আবাসভূমি। এখানে আর একটি পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতের পাদদেশে সর্ব্বদাই মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ সেখানে জনমানবের সম্পর্ক নাই। এই সকল তুষারময়-মূর্ত্তি আপনা হইতেই গঠিত হয় এবং আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া যায়। দক্ষিণপাড়ার নিকট পর্ব্বতে কখনও কখনও তুষারনির্ম্মিত অমরনাথ-মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অমাবস্যার দুইদিন পূর্ব্বে এই স্থানের একটী গহ্বরে প্রথমে একটী বুদ্বুদের উদয় হয়; সেই বুদ্বুদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পনের দিনে একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গমূর্ত্তিতে পরিণত হয়; পূর্ণিমার পর হইতেই আবার সেই মূর্ত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় এবং শেষে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। হিন্দুগণ এই মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। গহ্বরের নিকট একটী ঝরণা আছে, তাহার নাম অমরাবতী। এই ঝরণার তলদেশের মৃত্তিকা পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ। এখানে যথেষ্ট ফুল ফুটে। ইহার নিকটে একটী হ্রদ আছে, সেই হ্রদে অনেক কৃত্রিম দ্বীপ আছে। অনেক সময়ে চোরেরা এক জনের দ্বীপের কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া জলাশয়ের এক দূরপ্রান্তে লইয়া গিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়া থাকে। এই হ্রদের নিকটস্থ একটী ঝরণার জলপান করিলে অনেক ব্যাধি আরোগ্য হয়। এখানকার আর একটী ঝরণার জল গ্রীষ্মকালে অতিশয় শীতল এবং শীতকালে অতিশয় উষ্ণ হয়। বাজওয়ালগ্রামে একটী জলপ্রপাত আছে, তাহার নাম সরলামার, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। ইনিবাড়ীতে সূর্য্যসর নামে একটী পবিত্র নির্ঝর আছে, এই নির্ঝরের তীরে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির আছে। সকরনাগের ঝরণা সমস্ত বৎসরই শুষ্ক থাকে, কিন্তু যদি কোন মাসের ৯ই তারিখে

শুক্রবার হয়, তাহা হইলে সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ঝরণার যে জলধারা প্রবাহিত হয়, সেই দিন দূর দূরান্ত হইতে লোক ঐ জলে স্নান করিতে ও জলপান করিতে আইসে। জিলাবলগ্রামে একটি ঝরণা আছে, সেখানে লোকে মঙ্গলামঙ্গল জানিবার জন্য ফল নিক্ষেপ করে। ফল যদি ডুবিয়া যায়, তবে অমঙ্গল এবং যদি ভাসিতে থাকে, তবে মঙ্গল। বানহালে দুর্গা নামে একটী মন্দির আছে। কেহ কোন শত্রুর কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা করিলে চাউলপূর্ণ দুইটী হাঁড়ি লইয়া মন্দিরে যায়, একটী হাঁড়ি তাহার নিজের আর একটী তাহার শত্রুর বলিয়া চিহ্নিত করিয়া সন্ধ্যার সময় মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া আইসে। পরদিন প্রাতঃকালে যাইয়া যাহার হাঁড়িতে চাউলের পরিবর্তে ফুল এবং জাফরাণ দেখিতে পায়, তাহারই জয় হইবে বুঝিতে পারে ; অপর হাঁড়িতে আবর্জ্জনা পূর্ণ থাকে, সে হাঁড়ি যাহার, তাহার পরাজয় নিশ্চিত। আরও একটী ব্যাপার আছে, কোন বিষয়ের অধিকার লইয়া অথবা কোন ব্যাপারের ন্যায়-অন্যায় লইয়া দুই ব্যক্তিতে বিবাদ হইয়া তাহার যদি কোন প্রকার নিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই একটী করিয়া লোকের সঙ্গে দুইটী কুক্কুট ও দুইটী ছাগল মন্দিরে প্রেরণ করে, সেখানে যাইয়া উভয়েই নিজ নিজ আনীত কুক্কুট ও ছাগলকে বিষ পান করায়, তাহার পর উভয়েই আপন আপন কুক্কুট ও ছাগলের গাত্র মর্দ্দন করিতে থাকে ; এই প্রকার করিতে করিতে যাহার পশু বাঁচিয়া উঠে, তাহার ন্যায়পক্ষ এবং যাহার পশু মরিয়া যায়, তাহার অন্যায়পক্ষ। কম্বরে বার্ণসিন্ধু নামে একটী নির্ঝর আছে, তাহা বৎসরে কেবলমাত্র দুইমাস প্রবাহিত হয়। দেবসরোবরে জলনাগ নামে একটি জলাশয় আছে, তাহা হইতে স্তম্ভাকার জলরাশি উত্থিত হইতে থাকে। কাহারও ভাগ্য গণনা করিতে হইলে সে একটী চাউলপূর্ণ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া এই জলাশয়ে নিক্ষেপ করে ; প্রথমে পাত্রটী ডুবিয়া যায়, কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার ভাসিয়া উঠে ; তখন তাহার মুখ খুলিয়া যদি দেখা যায় যে, চাউল সিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা হইতে সুগন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা হইলে সৌভাগ্য এবং যদি সেই চাউলের সঙ্গে আবর্জ্জনা মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে দুর্ভাগ্য। এখানে একটী জলপ্রপাত আছে, সাধুগণ পর্ব্বতের উপর হইতে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক এই জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই প্রকার আত্মপ্রাণবিসর্জ্জনে পরকালে সদ্গতি হয় বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। কোটহারে একটী নির্ঝর আছে, তাহা এগার বৎসর শুষ্ক থাকে ; কিন্তু যখন বৃহস্পতিগ্রহ সিংহরাশিতে যান, তখন প্রতি শুক্রবারে এই নির্ঝরে জলধারা প্রবাহিত হয়, পরদিন আর জল থাকে না। যক্ষপুরের নিকটে একটী নির্ঝর আছে। এই নির্ঝরের নিকটস্থ পর্ব্বতে কখনও বরফ পড়ে না। নাগমে নীলগান নামে একটী জলাশয় আছে, ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এই জলাশয়ের তীরে সাধু-গণ চিতা সজ্জা করিয়া অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। এই জলাশয়ের মধ্যে ফল নিক্ষেপ করিয়াও লোকে অদৃষ্ট গণনা করিয়া থাকে। পুরাকালে এই জলাশয়

নীলমাহাত্ম্য নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়; তাহাতে কাশ্মীরের ইতিহাস এবং এই পবিত্র তীর্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সেই পুস্তকে লিখিত আছে যে, এই জলাশয়ের তলদেশে একটী নগরী আছে, এবং বরীওশা নামে একজন ব্রাহ্মণ একবার ঐ নগরীতে গিয়া দুই তিনদিন বাস করিয়াছিলেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানের বিবরণ লিখিয়াছেন। পারওয়ার ঝরণায় রবিবারে স্নান করিলে, কুষ্ঠ-রোগী রোগমুক্ত হয়। নিচ পরগণায় হালথুল গ্রামে একটী বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র শাখার একটি ক্ষুদ্রতম পল্লব নাড়িলে সমস্ত বৃক্ষটী নাড়িয়া উঠে। লারের নিকট দুইটী ঝরণা আছে, এখানে অনেক সাধু ডুবিয়া মরিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। এখানকার পর্ব্বতের মধ্যে একটী বৃহৎ হ্রদ আছে, তাহাতে এ অঞ্চলের লোকেরা মৃতব্যক্তির চিতাভস্ম নিক্ষেপ করে; তাহাদের বিশ্বাস, ইহাতে মৃত ব্যক্তিগণ স্বর্গে গমন করে। এই জলাশয়ে মাংসখণ্ড পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তুষারপাত হইতে থাকে এবং ঝড়-বৃষ্টি হয়। ভুতেশ্বর নামক স্থানে মহাদেবের মন্দির আছে, যাত্রী-গণ আসিলে মন্দির হইতে ঘোর কোলাহলধ্বনি বহির্গত হয়; কেহই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। মাচামুর নিকট একটী দ্বীপ আছে, এই দ্বীপ বৃক্ষ পরিপূর্ণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাতাসে বৃক্ষ কম্পিত হইলে সমস্ত দ্বীপ কম্পিত হইতে থাকে। পরশপুরায় জাফরাণের ক্ষেত্র আছে। এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড দেবমন্দির ছিল; সেকেন্দর শাহ সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলেন; ভগ্ন-মন্দিরের মধ্য হইতে একখানি তাম্রফলক বাহির হয়, তাহাতে দেব অক্ষরে এই কথা লিখিত ছিল যে, "অদ্য হইতে এগারশত বৎসর পরে সেকেন্দর নামে এক ব্যক্তি এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।" কামরাজ পরগণার অন্তর্গত তারাগাঁয়ে যক্ষজাতীয় রাজগণের বাসগৃহ ছিল। এখানে একটী জলাশয়ের মধ্যে বহু পুরাতন ও প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী দেবমন্দির আছে। এই জলাশয়ে অনেক মৎস্য আছে, কিন্তু কেহ সে মৎস্য ধরিলে তাহার বিশেষ অমঙ্গল হয়। গুরগাঁয়ের নিকটে একটী গিরিপথ আছে, বৃহস্পতিগ্রহ যখন সিংহরাশিতে গমন করেন, তখন এই গিরিপথের এক মুখ এমন গরম হয় যে, উত্তাপে সেই স্থানের বৃক্ষলতাদি জ্বলিয়া যায়; এমন কি, কোন পাত্রে করিয়া সেই স্থানে জল রাখিলে তৎক্ষণাৎ সেই জল ফুটিতে থাকে। পাকুলীতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে হয়। ঐ স্থানের নদীতে লোকেরা ছাগগণের চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া আইসে। দুই তিন দিন পরে সেই চর্ম্ম ধীরে ধীরে তুলিয়া আনিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সেই চর্ম্ম ঝাড়িলেই তাহা হইতে স্বর্ণরেণু সকল পড়িতে থাকে। এক একবারে দুই তিন তোলা পর্য্যন্ত স্বর্ণ পাওয়া যায়। এই স্থানের নিকটে আর একটী গিরিপথ আছে, তাহার নাম গিল্‌জিট। এই পথে কাশগড়ে যাওয়া যায়। এখানেও স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। হাহিহামু হইতে ১২ ক্রোশ দূরে পদ্মাবতী নামক নদীর বালুকায় স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। এই নদীর তীরে একটী দুর্গামন্দির আছে, শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই মন্দির আপনা হইতেই কম্পিত হইতে থাকে।

এই সুবার রাজস্ব শস্যের অংশ দ্বারা পরিশোধ করা হয়। রাজসরকার হইতে যদিও উৎপন্ন দ্রব্যের তৃতীয়াংশ লওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কৃষকেরা কোন দিনই অর্ধেকও ঘরে লইয়া যাইতে পারে না। পাদশাহ্ এক্ষণে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, উৎপন্ন দ্রব্য ঠিক সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ রাজসরকারে যাইবে, অপর ভাগ কৃষক পাইবে; যখন কৃষকের তিনভাগের দুইভাগ পাইবার ব্যবস্থা ছিল, তখন অপেক্ষা এখন অর্ধেক অংশ দিয়াও কৃষকের লাভ হয়। এই সুবার রাজস্ব ৩০৬৩০৫০ খারোয়ার শস্যে আদায় হয়। কাজি আলি এই রাজস্ব স্থির করেন। এক খারোয়ারে তিন মণ আট সের হয়; দুই দাম ওজনের শস্যে এক পালি হয়, সাড়ে সাত পালিতে এক সের, চারি সেরে একমণ, চারি মণে এক তুরেক (আকবর প্রতিষ্ঠিত সের); অনেক দিনের শস্যের মূল্যের গড় করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, এক খারোয়ার শস্যের মূল্য ২৯ দাম এবং সেই রেটই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে হিসাব করিলে সমস্ত রাজস্ব ৭৪৬৭০০৪১১ দাম হয়। আসফ খাঁ ৩০৭৯৫৪৩ খারোয়ার রাজস্ব স্থির করেন এবং ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত হারে ১০১৫৩১০৪০ খারোয়ার শস্য টাকায় আদায় দিতে হইত। কাজী আলার নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব অপেক্ষা আসফ খাঁর নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ১৬৩৯২ খারোয়ার অধিক হইলেও বর্ত্তমান রেট অনুসারে হিসাব করিলে রাজস্ব ৮৬০৩৪॥০ দাম কম হইয়াছে, কারণ, কাজি টাকার রেট একটু অধিক ধরিয়াছেন। কাজি আলার হিসাবে এই সুবায় ৪১ পরগণা ছিল, আসফ খাঁর বিবরণে ৩৮টী পরগণা; ইহার কারণ এই যে, কাজি আলা কামরাজ পরগণাকে দুভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পরগণা (করণা ও দেরু) হিসাব করিয়াছিলেন এবং সায়র মৌজা পরগণাকেও দুই পৃথক পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। কাজি আলা ৪০টী গ্রাম হাবেলী পরগণার অন্তর্গত করিয়াছিলেন এবং কামরাজ পরগণার আটটি গ্রাম কোন পরগণাভুক্তই করেন নাই। পূর্বকালে কাশ্মীর কেবলমাত্র দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: পূর্বভাগের নাম মিরাজ ও পশ্চিমভাগের নাম কামরাজ। কাশ্মীরে আর এখন সৈন্য নাই বলিলেই হয়।"[১]

আইন-ই-আকবরীতে যদিও 'ঠাকুরমার ঝুলি' সদৃশ অনেক ঘটনাই লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু একটা সত্য এর থেকে নিশ্ছদ্র হয়ে বের হয়ে আসে তা হল, সমগ্র উপত্যকা জুড়ে হাজার হাজার বৎসর ধরে গড়ে উঠা হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে তার প্রতিটি ইঞ্চি স্থানে, প্রতিটি পর্বতে, প্রতিটি ঝরণায়, প্রতিটি সরোবরে। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কাশ্মীরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ঔরঙ্গজেবের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মোগল বাদশাহ-ই কাশ্মীরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং কাশ্মীরকে ক্রমাগত সাজিয়ে ভূস্বর্গে পরিণত করেছেন। এই বাদশাহদের সুশাসনে সর্ব-ধর্মের প্রজারাই কাশ্মীরে শান্তিতে বসবাস করেছিল। কিন্তু সম্রাট ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করার পর হিন্দু প্রজাদের আবার দুর্দিন ঘনিয়ে আসে।

কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ রাজেশ কাদিয়ানের ভাষায়, "...The last great Mughal, Aurangzeb, left another legacy ; one of bitterness and fear for he actively persecuted the Kashmiri Brahmins. With his demise the Mughals went into rapid decline. But in general his harsh policies were continued by the semi-autonomous Mughal governors of Kashmir. Once again a steady migration of the Pandits to the relative safety of the plains took place."

এই হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট ঔরঙ্গজেব কেবল কাশ্মীরেই হিন্দুধর্মের শ্মশান-যাত্রা করে ক্ষান্ত থাকেননি ; তাঁর সারা সাম্রাজ্য তথা সারা ভারতবর্ষ জুড়েই হিন্দু ও হিন্দুধর্মের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন, বৈদেশিক আক্রমণকারীরাও বোধকরি এত ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তবের ভাষায়, "...As long as the entire country could not be conquered and the entire population therein could not be made to embrace Islam, he would impose political, economic and social disabilities on the non-Muslims, so as to remind them every day of their inferiority and to force them to abandon their ancestral religion and become converts to the Muslim faith ;...He forbade the old temples to be repaired and a little later issued an order to the governors of the provinces to demolish the schools and temples of the infidels and put down their teaching and religious practices strongly. The 'Muhtasibs' had to go round and destroy Hindu temples and shrines within their jurisdictions. So large was the number of official temple-breakers that a daroga (Superintendent) had to be placed over them to guide and unite their activities. Even the universally respected old temples of Vishwanath at Banaras, Keshav Dev at Mathura and Somnath of Patan were razed to the ground. Even those in the states of friendly Hindu rajas, such as Jaipur, were not spared, and the destruction of temples and images were 'often accompanied by wanton desecration, such as slaughtering of the cows in the sanctuary and causing the idols to be trodden down in public quarters"[১]।

কাশ্মীরে হিন্দু ও হিন্দুধর্মের প্রতি ইসলামধর্মীয় শাসকদের অত্যাচারের প্রসঙ্গে ঔরঙ্গজীব কর্তৃক ভারতবর্ষের অন্যত্রও হিন্দু ও হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হল এই জন্য যে, কিছু কিছু ঐতিহাসিক আছেন

যাঁরা ইসলামধর্মাবলম্বী শাসকদের বিশেষত ঔরঙ্গজীবকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সর্ব-ধর্মের প্রতি সহনশীল, এমনকি হিন্দুধর্মের রক্ষাকারী হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। উদ্দেশ্যমূলক এই জন্য বলা হচ্ছে যে, এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। যে অত্যাচারী, তাকে যদি প্রজাপালক হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করা হয়, তাতে ফল হবে বিপরীত। যুগযুগ ধরে দেখা গেছে, সত্যকে চাপা দিতে গিয়ে সকল ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল হয়েছে। যে সমস্ত ঐতিহাসিক অত্যাচারী মুসলমান শাসকদের হিন্দু ও হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যাচারকে চাপা দিতে চাইছেন, তাঁরাই বরঞ্চ হিন্দুর সুপ্ত racial memory এবং মুসলমানের পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতাকে জাগিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন। সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াই প্রাজ্ঞের লক্ষণ; তাতে চাপা অসন্তোষ কখনও কোনও সম্প্রদায়, জাতি বা দেশকে বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবে না [মৎলিখিত 'বাক্ষণ-প্রথম খণ্ড' দ্রষ্টব্য]। শাসক যে সম্প্রদায়েরই হোক, বা যে ধর্মেরই হোক তিনি যদি সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ন্যায় ও সত্যকে সাথী করে রাজত্ব পরিচালনা করেন, তিনি অবশ্যই সর্বধর্মের প্রজার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী হবেন। কাশ্মীরে জয়নাল আবেদিন বা দিল্লীতে আকবরের মত মহান শাসকেরা সর্বধর্মের প্রতি সমদর্শী ও প্রজাবৎসল ছিলেন বলেই তাঁদের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, এবং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সর্বধর্মের মানুষ মিলিত-ভাবে কাশ্মীরকে মর্তের স্বর্গে পরিণত করেছিলেন।

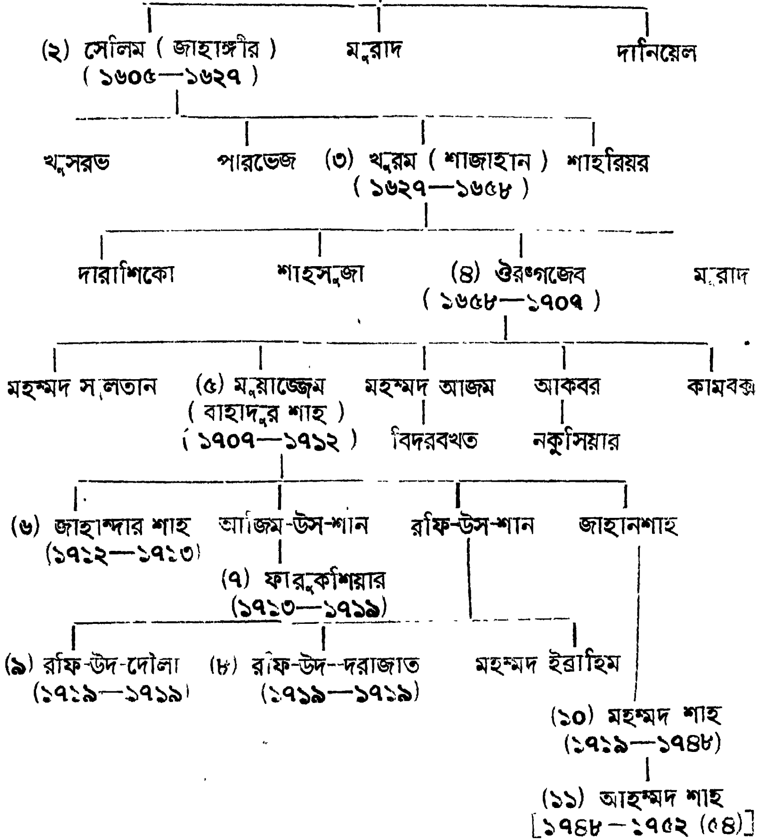
সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজীবের পূর্ব পর্যন্ত সকল সম্রাটই কাশ্মীরে যেমনই সুশাসন বজায় রেখেছিলেন, তেমনই সেখানে তাঁদের শিল্পরুচিরও স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিশেষত সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নুরজাহান কাশ্মীরে বহু সুদৃশ্য উদ্যান ও স্থাপত্য সৃষ্টি করে গেছেন যা তাঁদের কাশ্মীর ও কাশ্মীরের প্রজাদের প্রতি ভালবাসাই যুগ যুগ ধরে প্রচার করে চলেছে ও চলবে। শেষ যার হাতে কাশ্মীরের শাসনভার গেল, সেই সম্রাট ঔরংগজীবের হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাবের ফলে হিন্দুরা আবার কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়া হতে থাকলেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অত্যাচারের পর যে মুষ্টিমেয় হিন্দু প্রজা তখনও অবশিষ্ট ছিল, তারাও স্বভূমি ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন আর এক ইসলামধর্মী আফগান শাসক আহম্মদশা দুররানী ও তার উত্তরসূরীদের কাশ্মীরে অভিযান ও অত্যাচারের ফলে। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে মোগলদের (আহম্মদ শাহের শাসন) হটিয়ে এই দুররানী কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করে, এবং উপত্যকায় আফগানদের অত্যাচার চলতে থাকে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রণজিত সিং কর্তৃক কাশ্মীর অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত।

মোগল অধিকার

(১৫৮৯—১৭৫২ খ্রীঃ)

(১) সম্রাট আকবর (১৫৫৬—১৬০৫ খ্রীঃ

[কাশ্মীর অধিকার ১৫৮৯]



প্রসঙ্গপঞ্জী

১. আইন-ই আকবরী / বঙ্গানুবাদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় / বসুমতী কার্যালয় কলিকাতা / পৃ. ১০০—১০৪।

২. The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books, New Delhi 1992 / p. 47.

৩. The Mughal Empire / A. L. Srivastava / Shivalal Agarwala & Co. (P) Ltd. / 4th Edition, 1964 / pp. 339—340.

চতুর্দশ অধ্যায়

আফগান অধিকার

(১৭৫২ খ্রীঃ—১৮১৯ খ্রীঃ)

মোগল বাদশাহ আহম্মদ শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে এবং কাশ্মীরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা মোঘল প্রতিনিধি আবুল কাশিম খাঁ, তখন তাঁর দুজন ঘরশত্রু বিভীষণ মীর মুকিম কান্থ এবং খাজা জহির দিদামারী আফগানশাসক আহমদশাহ দুররানীকে (আবদালী) কাশ্মীর অভিযানে আমন্ত্রণ জানায়। সেই সুযোগ দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর আফগান শাসক সানন্দে গ্রহণ করেন এবং সেনাপতি আবদুল্লা খাঁর অধীনে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী কাশ্মীর অভিযানে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ পনের দিনের যুদ্ধে কাশিম খাঁ পরাজিত ও বন্দী হলে কাশ্মীরে একশত তেষট্টি বৎসরের মোগল রাজত্বের অবসান হয়; শুরু হয় বর্বর আফগানদের শাসন (১৭৫২ খ্রীঃ)। ঐতিহাসিক P. N. K. Bamzai-এর ভাষায়…"For sixty-seven years their rule lasted in Kashmir and reduced the country to the lowest depths of penury, degradation and slavery…"[১]

আবদুল্লা খাঁ কাশ্মীর দখল করার পর এই বর্বর শাসক কাশ্মীরী প্রজার উপর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন, সেমত অত্যাচার ইতিপূর্বে কাশ্মীরের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। শুধু আবদুল্লা খাঁই নয়, তার পরবর্তী অন্তত আরও দুজন—লাল খাঁ এবং হাজী করিমদাদ খাঁও সমানে অত্যাচার চালিয়েছিলেন। আফগান শাসকদের সেই অত্যাচারের স্মৃতি পরবর্তী দুশো বৎসরেও কাশ্মীরবাসীদের মন থেকে মুছে যায়নি। মুছে যায়নি খাল কেটে কুমীর ডেকে আনার স্মৃতিও। পাকিস্তানের ইন্ধনে ও সহযোগিতায় প্রায় দুশো বৎসর পরে সেই আফগান বর্বররাই কাশ্মীর আক্রমণ করে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল,—সে স্মৃতিচিহ্ন তো সেদিনের। আবদুল্লা খাঁ নির্বিচারে হত্যা, ধর্মান্তরকরণ, নির্যাতন, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদির দ্বারা কাশ্মীরকে মরুভূমিতে পরিণত করে মন্ত্রী শুখজীবনমলের অধীনে কাশ্মীরের শাসনভার দিয়ে কাবুলে ফিরে যান। মন্ত্রী শুখজীবন ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং বীর। আবদুল্লা খাঁ ফিরে যাবার পরই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৭৫৪ খ্রীঃ)। তাঁর সুশাসনে কাশ্মীরে আফগান অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন কিছুটা সেরে আসে; কিন্তু তাঁর ও কাশ্মীরবাসীদের দুর্ভাগ্য তা স্থায়ী হয় না। পর বৎসরই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ উপত্যকায় বিপদ ডেকে আনে। শুখজীবন প্রাণপণ চেষ্টায় উপত্যকাকে সমূহ সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন।

এদিকে শুখজীবনের বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা ঘোষণায় আফগান সম্রাট আহমদ শাহ দুররানী বিদ্রোহী রাজাকে দমনের জন্য নুরুদ্দিন খাঁর অধীনে দুধর্ষ

আফগান সৈন্যদের প্রেরণ করেন। হতভাগ্য শুখজীবন পরাজিত ও বন্দী হলে তাঁকে অন্ধ করে লাহোরে আহমদশার কাছে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁকে হাতির পদতলে পিষ্ট করে হত্যা করা হলে (১৭৬২ খ্রীঃ) কাশ্মীরে আফগান শাসন নিরঙ্কুশ হয়। শুখজীবন অতি অল্প সময়ের জন্যই কাশ্মীরে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন—যার মধ্যে তাঁকে একটি ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তিনি ঐ অল্প সময়েই যেটুকু সুশাসন বজায় রেখেছিলেন, তার জন্যই তিনি প্রজাদের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিলেন। ঐতিহাসিক বামজাই-এর ভাষায়, "...Raja Sukh-Jiwan was a man of high literary tastes... He was above all narrow sectarian and religious bigotry. On every Friday he would be present at the congregational prayers of Muslims in Jama Masjid. He was a perfect gentleman, truthful and just."[১] এই সুশাসকের নির্মম হত্যায় উপত্যকায় ঘোর দুর্দিনের সূচনা করে। এরপর শাসক নূরুদ্দিন খাঁ এবং তাঁর মন্ত্রী কৈলাস ধর এবং শাসক জানমহম্মদ ও মন্ত্রী গুরুমুখ সিং-এর শাসনে কিছুটা স্থিতাবস্থা এলেও সেনাপতি লাল খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করে উপত্যকায় অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতে থাকে। সংবাদ যায় সম্রাট দুররানীর কাছে। তিনি খুরম খাঁকে প্রেরণ করেন বিদ্রোহ দমনে। খুরম খাঁ বিদ্রোহ দমন করার পর তাঁকেই কাশ্মীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলে তিনি কৈলাস ধরকে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ দেন। এরপর খুরম খাঁ কাবুলে প্রত্যাবর্তন করলে নূরুদ্দিনকে তৃতীয় বারের জন্য কাশ্মীরের শাসনকর্তা করা হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে নূরুদ্দিনের মৃত্যু হলে আমীর খাঁ জওয়ানশেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এই শাসনকর্তার আমলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে প্রবল বন্যায় অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ঐ বৎসরই আহমদ শা দুররানীর মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তৈমুর শা আবদালী (দুররানী) সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৭১ খ্রীঃ)।

কাবুলে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের সুযোগে কাশ্মীরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা আমীর খাঁ জওয়ানশের শুরু করে দেন অত্যাচার। তিনি বেশী অত্যাচার চালান স্বধর্মীয় সুন্নী সম্প্রদায়ের উপর। তাঁর অত্যাচার ও নির্মম হত্যায় প্রজাগণ নতুন সম্রাট তৈমুরশার নিকট অভিযোগ দায়ের করে। আমীর খাঁর অত্যাচার ও বিদ্রোহ দমনের জন্য হাজী করিমদাদ খাঁর অধীনে বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধে আমীর খাঁ পরাজিত হলে তাকে বন্দী করে কাবুলে প্রেরণ করা হলে তৈমুর তাকে ক্ষমা করেন; কিন্তু কাশ্মীরবাসীদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যিনি আমীর খাঁর অত্যাচার থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করবার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, কাশ্মীরের শাসনকর্তা হবার পর তিনি অকথ্য অত্যাচার, উচ্চহারে কর ধার্য ইত্যাদির দ্বারা প্রজাদের উপর যে নির্যাতন চালাতে থাকেন, তা আমীর খাঁর চেয়ে কম তো নয়ই,—বরঞ্চ বেশি ছিল। করিমদাদ খাঁর মৃত্যুর পর যিনি শাসনভার প্রাপ্ত হলেন,

তাঁর নাম আজাদ খাঁ। এই আজাদ খাঁ আবার অত্যাচারে দাদখাঁরও উপরে ছিলেন। আজাদ খাঁ অত্যাচারী হলেও তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আজাদ খাঁ যদি অত্যাচারী শাসক না হতেন, তাহলে তিনি প্রজাদের সমর্থন পেতেন। আজাদ খাঁর বিদ্রোহ দমন করতে মদদ খাঁকে প্রেরণ করা হয়। আজাদ খাঁ পরাজয় এড়াতে আত্ম-হত্যা করেন (১৭৮৫ খ্রীঃ)। এরপর মদদ খাঁ ও তাঁর পুত্র মির্দ খাঁ ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কাশ্মীরে শাসনভার পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে ইং ১৮।৫।১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তৈমুর শা দুররানীর মৃত্যু হলে উপত্যকার শাসনকার্যে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

তৈমুর শা দুররানীর মৃত্যুকালে তাঁর ২১ জন পুত্র বর্তমান ছিল। এতগুলি উত্তরাধিকারীর মধ্যে সিংহাসনের দাবিতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় প্রজা সাধারণ ও মন্ত্রীপরিষদ জামান শাকে সম্রাট হিসাবে নির্বাচন করলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)। জামান শা ১৮০১ খ্রীঃ পর্যন্ত মোটামুটি সুশাসন বজায় রাখেন। কিন্তু তাঁর এক ভাই মহম্মদ শা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যুদ্ধে জামান শা পরাজিত হন, তাঁকে জালালাবাদে অন্ধ করা হয় (১৮০১ খ্রীঃ), এবং মহম্মদ শা সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদ শা মাত্র দু বৎসর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে অপর ভ্রাতা শুজা বিদ্রোহ ঘোষণা করে মহম্মদ শাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করেন (১৮০৩ খ্রীঃ)। শাহ সুজা ক্ষমতালাভের পর আট্টা মহম্মদ খাঁকে কাশ্মীরের শাসনকর্তা করে পাঠান। কিন্তু আট্টা মহম্মদ খাঁর শাসনে শাহ সুজা সন্তুষ্ট না হওয়ায় আজীম খাঁকে পরবর্তী শাসনকর্তা করে পাঠান। আজীম খাঁ তাঁর মন্ত্রী পরিষদে ও গুরুত্বপূর্ণ পদে বীরবল ধর, মির্জা পণ্ডিত ধর, এবং সুখরাম সাফয়া প্রভৃতি হিন্দুদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু বীরবল ধরের কার্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সম্ভাব্য বন্দীত্ব এড়াতে বীরবল ধর গোপনে সপরিবারে লাহোরে পালিয়ে যান। লাহোরে তখন পঞ্জাবকেশরী রণজিত সিং-এর অভ্যুত্থান ঘটেছে। ইতিমধ্যে মহারাজা রণজিত সিং-এর অধীনে শিখ জাতি একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। লাহোর দরবারে গিয়ে বীরবল ধর কাশ্মীর আক্রমণের জন্য রণজিত সিংকে ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকেন। অবশেষে বীরবল ধর তাঁর পুত্রকে জামিন রাখতে স্বীকার করলে মহারাজা রণজিত সিং তাঁর সেনাপতি রাজা গোলাব সিং-এর অধীনে দেওয়ান চাঁদ মিশ্র, সর্দার হরি সিং, জাওলা সিং পদানিয়া, হুকুম সিং প্রভৃতি সেনাপতি ও ত্রিশ হাজার দুর্ধর্ষ শিখ সৈন্যের বাহিনী প্রেরণ করেন। আফগান সেনাপতি জব্বর খাঁর সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধে আফগানরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। অবশিষ্ট সৈন্যরা আফগানিস্তানে পালিয়ে যায়। অবসান হয় প্রায় পাঁচশো বৎসরের ইসলামের শাসন (১৮১৯ খ্রীঃ) এবং শুরু হয় কাশ্মীরে পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিত সিংহের শাসন।

আফগান অধিকার

(১৭৫২—১৮১৯ খ্রীঃ)

(১) আহমদ শা আবদালী (দুররানী) (১৭৫২—১৭৭১ খ্রীঃ)
|
(২) তৈমুর শা দুররানী (১৭৭১—১৭৯৩ খ্রীঃ)
|
(৩) জামান শা দুররানী (১৭৯৩—১৮০১ খ্রীঃ)
|
(৪) শা মহম্মদ (১৮০১—১৮০৩ খ্রীঃ)
|
(৫) শা সুজা (১৮০৩—১৮১৯ খ্রীঃ)

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. A History of Kashmir / P. N. Kaul Bamzai / Metropolitan Book Co (P) Ltd / New Delhi / 1973 / p. 424.

২. ibid, p. 426.

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিখ অধিকার

(১৮১৯—১৮৪৬ খ্রীঃ)

আফগান শাসনের অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বীরবল ধর প্রমুখ কিছু আমলা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শিখ শক্তিকে কাশ্মীর অভিযানে আহ্বান জানায়, ঠিক যেভাবে মীর মুকিম ও খাজা জহিব দিদামারী আফগানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মুঘলদেব শাসন থেকে রক্ষা করবার জন্য। যদিও মুঘলদের শাসন যে কোন ইসলাম ধর্মীয়দের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল শিখদের আহ্বানের মাধ্যমে। আহ্বানকারীদের আশা ছিল শিখদের শাসন তাদের শান্তি দেবে,—তাদের উন্নতি ঘটাবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, শিখদের শাসন আফগানদের চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট ছিল না।

সেনাপতি গোলাব সিং-এর নেতৃত্বে কাশ্মীর জয় করার পর (১৮১৯ খ্রীঃ) মহারাজা রণজিত সিংহ দেওয়ান চাঁদ মিশ্রকে কাশ্মীরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। দেওয়ান চাঁদ মিশ্রের শাসনে কাশ্মীরে কিছুটা স্থিরতা ফিরে আসে। কিন্তু পরবর্তী গভর্নর দেওয়ান মতিরাম ও হরিসিং নালোয়ার (বা নওলা) আমলে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার মুসলমান ও আফগানদের আচরণের দায়ভার বহন করতে হয় হতভাগ্য কাশ্মীরী মুসলমানদের। কাশ্মীরে জুম্মা মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হল। নিষিদ্ধ করা হল 'আজান' ও গোহত্যা। গোহত্যার দায়ে কিছু মুসলমানকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হল।[১]*

সেইসঙ্গে প্রচুর খাজনা ধার্য করা হল। দেওয়ান মতিরামের আমলে উপত্যকায় ব্রিটিশ শক্তি প্রথম প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ কর্মচারী (গুপ্তচর ?) মুরক্রাফট কাশ্মীর হয়ে লাডাখে যান, এবং লাডাখের রাজাকে শিখ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান মতিরামকে সরিয়ে দেওয়ান কৃপারামকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ান কৃপারাম যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে কাশ্মীরের শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্পে কাশ্মীরের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। সেই ক্ষতস্থান পূরণের চেষ্টায় যখন কৃপারাম

* কাশ্মীর উপত্যকায় গোহত্যা ও গোমাংসভক্ষণ যে নিষিদ্ধ ছিল, এ তথ্য পাওয়া যায় আইন-ই-আকবরীতে[২], পরিব্রাজক অভেদানন্দ স্বামীর ভ্রমণ কাহিনীতে[৩] এবং Dr. S. C. Roy-এর গবেষণাগ্রন্থে।[৪] সুতরাং গোহত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড হয়ত আইনভঙ্গের কারণে হতে পারে, অত্যাচারের অঙ্গ হিসাবে নয়।

ব্যস্ত, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমলাকুল ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। ফলে তাঁকে লাহোরে ফিরিয়ে নিয়ে পরবর্তী গভর্নর করে পাঠানো হয় ভীম সিং আর্দালীকে। ভীম সিং ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত শাসনভার পরিচালনা করেন। তারপর রাজকুমার শের সিং কাশ্মীরের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ভীম সিং-এর নিকট কার্যভার বুঝে নেন। কিন্তু শের সিং উপত্যকায় শাসনকার্যের বিষয়ে সুনাম অর্জন করতে পারেননি। ফলে মহারাজা রণজিত সিং পুত্রকে ফেরত করে নিয়ে পরবর্তী গভর্নর করে পাঠান যোগ্যতম সেনাপতি মানসিংকে। এই মানসিং-এর শাসন শিখ রাজত্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর ন্যায়নীতি ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাশ্মীরীদের, দুর্ভাগ্য শিখ রাজত্বের যে, মানসিংকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল গুপ্তহত্যা করা হয়।

ইতিমধ্যে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রণজিত সিং পরলোকগমন করেছেন এবং লাহোরের সিংহাসনে তখন পুত্র মহারাজা শের সিং। মানসিং-এর গুপ্তহত্যা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক শূন্যতার সুযোগে কাশ্মীরে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়। মহারাজা শের সিং তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি ডোগরা বংশীয় গোলাব সিংকে কাশ্মীরে বিদ্রোহ দমন করতে প্রেরণ করেন (১৮৪২ খ্রীঃ)। গোলাব সিং যোগ্যতার সঙ্গে কাশ্মীরে বিদ্রোহ দমন করে লাহোর দরবারের বিশেষ আস্থাভাজন হন এবং কাশ্মীর রাজ্য প্রাপ্তিতে এই ঘটনা গোলাব সিং-এর ভাগ্যে শুভ সূচনা করে। মহারাজা শের সিং অতঃপর বিদ্রোহমুক্ত কাশ্মীরে সেখ গোলাম মহিউদ্দিনকে গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। গভর্নর মহিউদ্দিন এবং সেনাপতি গোলাব সিং-এর যৌথ প্রচেষ্টায় কাশ্মীরে রাজনৈতিক স্থিরতা ফিরে আসে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটতে থাকে ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষিত হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা গোলাব সিং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লাডাখ জয় করে নিজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেছিলেন। সেই আশায় তিনি তাঁর দুর্ধর্ষ সেনাপতি জারোয়ার সিংকে তিব্বত জয়ে প্রেরণ করেন। জারোয়ার সিং তিব্বতে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েও তিব্বত দখল করতে পারেননি। বরং তিব্বতীদের সঙ্গে যুদ্ধে জারোয়ার সিং-এর প্রায় সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হয় এবং তিব্বতীরা জারোয়ারকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে। ফলে তিব্বত জয়ের আশা গোলাব সিং-এর পূরণ হয় না। তিব্বত জয় করতে ব্যর্থ হলেও গোলাব সিং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বালতিস্তান জয় করে নেন। এদিকে কাশ্মীরে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর সেখ মহিউদ্দিনের মৃত্যু হলে পুত্র সেখ ইমানুদ্দিন কাশ্মীরের গভর্নরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা শের সিং-এর মৃত্যুতে শিখ সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ দেখা দেওয়ায় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকে। কুটকৌশলী ইংরেজ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নানা অজুহাতে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে। শিখেরাও নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও অসংঘবদ্ধতা ইত্যাদির কারণে ইংরেজদের সঙ্গে একের পর এক যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে থাকে। বিখ্যাত

কোহিনুর মণি ইংরেজদের হস্তগত হয়। অবশেষে ছিন্নভিন্ন শিখ শক্তি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিখে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়, যা 'লাহোর সন্ধি' নামে খ্যাত। এই চুক্তির ফলে নাবালক মহারাজা দলীপ সিংহ ইংরেজের আশ্রিত রাজা হিসাবে গণ্য হন। বস্তুত শিখ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। উক্ত সন্ধির বারো দফায় কাশ্মীরের ভাগ্যলিপি লেখা হয়। অর্থাৎ লাহোর দরবার রাজা গোলাব সিং-এর কাশ্মীরে প্রশাসনিক কৃতিত্বের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করার মানসে কাশ্মীর সহ সন্নিহিত পার্বত্য এলাকা তাঁর অনুকূলে প্রদান করবার শর্তে ইংরেজকে রাজা করায়। উক্ত লাহোর সন্ধির বারো দফায় লিখিত হয়,—

'১২শ শর্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পুনরায় মিত্রতা স্থাপন সম্পর্কে জাম্মুর রাজা গোলাপ সিং, লাহোর রাজ্যের যে হিতসাধন করিয়াছেন, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি রাজ্য প্রদান করিয়া মহারাজা, রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন; স্বর্গীয় মহারাজ খড়্গ সিংহের সময় যে সকল প্রদেশে রাজা গোলাপ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল তৎসমুদায়, এবং যে পার্বত্য প্রদেশ ও রাজ্য অতঃপর স্বতন্ত্র চুক্তিপত্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, রাজা গোলাপ সিংহকে প্রদান করিবেন, তৎসমুদায় মহারাজ স্বাধীন বলিয়া মনে করিলেন। রাজা গোপাল সিংহের সদ্ব্যবহারের পুরস্কার স্বরূপ ঐ সকল প্রদেশে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও রাজা গোলাব সিংহকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলেন; তাঁহার সহিত বৃটিশ গভর্নমেণ্টের স্বতন্ত্র সন্ধিসর্তে সেই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে।'[৫]

কাশ্মীর সহ সন্নিহিত এলাকা, ৪র্থ শর্তে, লাহোর সরকার বৃটিশ সরকারকে চিরকালের জন্য যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে বাধ্য হলেন। ৪র্থ শর্তটি নিম্নরূপ, '৪র্থ সর্ত। তৃতীয় সর্তে লিখিত সম্পত্তি সমূহে অধিকার প্রাপ্তি ব্যতীত, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, লাহোর গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও দেড় কোটি টাকা দাবী করিলেন; ঐ সমস্ত টাকা লাহোর গবর্ণমেণ্ট এককালে প্রদান করিতে অপারগ; এবং তৎসম্বন্ধে সন্তোষজনক জামীন দিতে পারিলেন না; সেই হেতু মহারাজ সিন্ধুনদ এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশ এবং কাশ্মীর ও হাজারা প্রদেশ প্রভৃতির সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি, স্বত্ব এবং তাহার আয়, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন; অর্থাৎ মহারাজের প্রায় এক ক্রোড় টাকা আয়ের সম্পত্তিতে অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকালের জন্য আধিপত্য লাভ করিলেন।'[৬]

উল্লিখিত সন্ধিপত্র তথা মুচলেকা মূলে ইংরেজ কাশ্মীর রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তারিখ ৯ মার্চ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ। অবসান হয় কাশ্মীরে সাতাশ বৎসরের শিখ আধিপত্য।

শিখ অধিকার

(১৮১৯-১৮৪৬ খ্রীঃ)

মহারাজা রণজিত সিং (১৮১৯—১৮৩৯)
|
শের সিং (১৮৩৯—১৮৪৩)
|
দলীপ সিংহ (১৮৪৩—১৮৪৬)

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. History of Kashmir / P. N. Kaul Bamzai / Metropolitan Book Co (P) Ltd / New Delhi / 1973 / pp 610—638

২. আইন-ই-আকবরী / বঙ্গানুবাদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় / বসুমতী কার্যালয় কলিকাতা / পৃঃ ১০০—১০৭।

৩. কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ / শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা / ৫ম সংস্করণ / পৃঃ ৫৯।

৪. Early History and Culture of Kashmir / Dr. Sunil Chandra Roy / First Edition 1957 / The Asiatic Society / pp 207—208

৫. শিখ ইতিহাস / জোসেফ ডেভি কানিংহাম / সম্পাদনা দুর্গাদাস লাহিড়ী / নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা / পরিশিষ্ট পৃঃ ৭০—৭১

৬. ঐ পৃঃ ৬৯

ষোড়শ অধ্যায়

হিন্দু ডোগরা অধিকার

(১৮৪৬—১৯৪৭)

সালটা ছিল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ, যখন শম্বার জায়গীরদার মিয়া কিশোর সিং-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক পুত্র গোলাব সিং লাহোর দরবারে সামান্য সৈনিকের চাকুরী গ্রহণ করেন। অল্পশিক্ষিত বীর যুবক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিত সিংহের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ফলে চাকুরী গ্রহণের কয়েক বৎসর পরেই তাঁকে সেনাপতির পদ দেওয়া হয়। সেনাপতি গোলাব সিং বেশ কয়েকটি যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে লাহোর দরবারের আস্থাভাজন হন। বিশেষ করে পার্বত্য যুদ্ধে গোলাব সিং-এর দক্ষতায় লাহোর দরবার বিশেষ প্রীত হন। পরবর্তী কালে কাশ্মীরে বিদ্রোহ দমনে যখন অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ ব্যর্থ হন, তখন ডাক পড়ে গোলাব সিং-এর। কাশ্মীরে প্রেরণের আগে মহারাজা প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি গোলাব সিং কাশ্মীরের বিদ্রোহ দমনে সাফল্য অর্জন করতে পারেন, তাহলে তাঁকে ভবিষ্যতে কাশ্মীর জায়গীর দেওয়া হবে। গোলাব সিং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাশ্মীরের বিদ্রোহ দমন করেন। লাহোর দরবার অবশ্য সে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিখে ব্রিটিশের সঙ্গে 'লাহোর চুক্তির' সময়, যা 'শিখ অধিকার' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর রাজকার্যে সন্তুষ্ট হয়ে আগেই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল জম্মু রাজ্যের জায়গীর, নিজ অধিকারে সৈন্য রাখার সনদ, এবং 'রাজা' খেতাব (১৮২০ খ্রীঃ)।

রাজা গোলাব সিং-এর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন থাকায় তিব্বত অভিযান ছাড়া তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সাফল্য লাভ করে। তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখ এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাল্তিস্তান জয় করে তাঁর জম্মু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহারাজা রণজিত সিংহের ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পর গোলাব সিং লাহোর দরবারে প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ শের সিং-এর মৃত্যুর পর শিখ সাম্রাজ্য ভাঙার মুখে গোলাব সিং-এর কিছু কূটনৈতিক তৎপরতা ও সিদ্ধান্ত একইসঙ্গে যেমনই খুশি করেছিল লাহোর দরবারকে, তেমনই খুশি করেছিল ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে। ফলে রাজা গোলাব সিং এর পক্ষে কাশ্মীর রাজ্য প্রাপ্তির ও 'মহারাজা' খেতাব প্রাপ্তির পথ সুগম হয়েছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিখে লাহোরে ইংগ-শিখ যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজ কর্তৃপক্ষ গোলাব সিংকে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মার্চ তারিখের 'অমৃতসর চুক্তি' মূলে কাশ্মীর রাজ্য মোট ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে (পরিশিষ্টে প্রদত্ত গোলাব সিং-এর সঙ্গে ইংরেজের চুক্তি দ্রষ্টব্য)।

খরিদ সূত্রে কাশ্মীর রাজ্য প্রাপ্তির পর মহারাজা গোলাব সিং-এর রাজ্যের এলাকা দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

(ক) জম্মু রাজ্য—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রনজিৎ সিংহের নিকট জায়গীর হিসাবে প্রাপ্ত।

(খ) লাডাখ রাজ্য—১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ করে জয় মূলে প্রাপ্ত।

(গ) বাল্‌তিস্তান—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ করে জয় মূলে প্রাপ্ত।

(ঘ) কাশ্মীর রাজ্য—১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের নিকট খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত।

এর পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পরবর্তী ডোগরা শাসক গিলগিট এজেন্সী অধিকার করলে বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট হয়। (প্রদত্ত মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

ইংরেজের সঙ্গে মহারাজা গোলাব সিং-এর সুসম্পর্ক বজায় ছিল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত ; যেজন্য মহারাজা বিদ্রোহ দমনে ইংরেজকে সহায়তা দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই মহারাজা গোলাব সিংহ পরলোক গমন করলে তাঁর তৃতীয় পুত্র রণবীর সিংহ কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করে যান। মহারাজা গোলাব সিং-এর মৃত্যুর পর ইংরেজদের স্বরূপ প্রকাশ হতে থাকে। মহারাজা রণবীর সিং সিংহাসন লাভের পর যখন কাশ্মীরের উন্নয়নে সচেষ্ট হন, তখনই তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে ইংরেজ কর্তৃক রাজ্যের প্রশাসনে হস্তক্ষেপের ফলে। ইংরেজরা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রণবীর সিংকে কুলুর মধ্য দিয়ে তাদের পণ্য বিনা শুল্কে পঞ্জাবে নিয়ে যাবার অধিকার দিতে বাধ্য করে। এমনকি কাশ্মীরে আমদানীকৃত ব্রিটিশ পণ্যের উপরও তারা কর প্রদান বন্ধ করে। ফলে মহারাজার বাৎসরিক প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে থাকে। এ বিষয়ে বড়লাটের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল হয় না। বরঞ্চ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লাডাখে প্রশাসনিক বিষয়ে ব্রিটিশ যৌথ কমিশনের নিয়োগ করা হয় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে অপর চুক্তি মূলে ভারত ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে Trade Route দেখাশোনার জন্য একটি পৃথক যৌথ কমিশনার নিয়োগ করা হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজার সঙ্গে লর্ড লিটনের যে বৈঠক হয়, তাতে স্থির হয়, কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা চিত্রল ও ইয়েসিন পর্যন্ত বর্ধিত হবে, সুতরাং কাশ্মীরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখা দরকার। মহারাজার আপত্তিতে ব্রিটিশরা কর্ণপাত করেনি ; ফলে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, কাশ্মীরে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট আস্তানা গেড়ে বসে। এইভাবে ধীরে ধীরে কাশ্মীরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ চতুর ও বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ নিজের হাতে নিতে থাকে। কাশ্মীরস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বড়লাটের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে, এমনকি জাল দলিলপত্র তৈরি করে মহারাজার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে কাশ্মীর গ্রাসের চক্রান্ত করতেও পেছপা হয়নি। মহারাজা

রণবীর সিংহ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করলে, যুবরাজ প্রতাপ সিং জম্মু কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। মহারাজা প্রতাপ সিং এর ভ্রাতা অমর সিং-এর সংগে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের হাত মিলিয়ে সিংহাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা যখন ভারতীয় কাগজগুলি প্রকাশ করে দেয়, তখন ইংলন্ডে প্রতিক্রিয়া হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষের সভ্যরা কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু ভারতের ইংরেজ প্রশাসন তাতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেনি। মহারাজা প্রতাপ সিং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গিলগিট এজেন্সী অধিকার করে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে কাশ্মীর রাজ্যের সীমা দাঁড়ায় : উত্তরে আফগানিস্তান, রাশিয়া ও চিন ; পূর্বে চিন ও তিব্বত ; দক্ষিণে এবং পশ্চিমে ব্রিটিশ ভারত। মহারাজা প্রতাপ সিং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে গিলগিটে Wireless Station স্থাপন করেন এবং বিমানক্ষেত্র তৈরি করেন। এটা ব্রিটিশের প্রভাবেই মহারাজা করতে বাধ্য হয়েছিলেন ; কারণ ছিল সম্ভবত রাশিয়ার ভীতি। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াতে নভেম্বর বিপ্লব কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করে। ঐ সময়ে কাশ্মীরে কম্যুনিস্ট ভাবধারা বাড়তে থাকায় ব্রিটিশরা রাজনৈতিক কারণেই গিলগিটের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মহারাজা প্রতাপ সিং ব্রিটিশের আচরণে ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হতে থাকেন। ফলে তিনি রাজকীয় কর্তৃত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে বড়লাটকে অনুরোধ করেন ; সেইসংগে অপুত্রক মহারাজা ভ্রাতুষ্পুত্র জগৎদেব সিংকে পোষ্যপুত্র হিসাবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তা মঞ্জুর করতে আবেদন করেন। কিন্তু চতুর ব্রিটিশ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মহারাজার সে ইচ্ছা পূর্ণ করেনি। তারা মহারাজার অপর ভ্রাতুষ্পুত্র হরি সিংকে কাশ্মীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনয়ন দেয়, যদিও পারিবারিক উৎসবাদিতে জগৎসিংদেবকে প্রতাপ সিং-এর পুত্র হিসাবে অনুমোদন দিতে থাকে। এই ঘটনায় ডোগরা রাজপরিবারের অসহায়ত্ব পরিস্কার ভাবে প্রকট হয়। ক্ষমতাসীন মহারাজার অধিকার ছিল না তাঁর পছন্দমত ব্যক্তিকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করার। ফলে ভগ্নহৃদয়ে মহারাজা প্রতাপ সিং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করলে ব্রিটিশের মনোনীত প্রার্থী ক্রীড়নক হরি সিং কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৯২৫ খ্রীঃ)। যেহেতু ইংরেজের ইচ্ছানুযায়ী হরি সিং সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেহেতু তাঁকে পুতুল রাজা বানাতে তাদের বেশি দেরি হয়নি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নামমাত্র খাজনায় গিলগিট এজেন্সী যাট বৎসরের জন্য লীজ পেতে ইংরেজদের কোনরূপ অসুবিধা হয়নি। এই গিলগিট এজেন্সী নিয়ে মহারাজার সঙ্গে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, তার তথ্যপূর্ণ বিবরণ 'কাশ্মীর যুদ্ধ' অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজের ক্রীড়নক হরি সিংকে দিয়ে এই আইন তৈরি করানো হয়েছিল যে, জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যের বাইরের কাউকে রাজকর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। ঐ ভাবধারার বৃহৎ সংস্করণ হিসাবে স্বাধীন ভারতের আর এক

ক্রীড়নক নেহেরুকে দিয়ে কাশ্মীর সংক্রান্ত যে সমস্ত নীতিগ্রহণ করানো হয়েছিল, তার ফলে আজকের ভারতবর্ষ এমন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—যার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে পুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে।

পরনির্ভর হরি সিং শাসনকার্যে কণামাত্র দক্ষতা দেখাতে পারেননি। বরঞ্চ মুসলমান প্রজাদের উপর যে অবিচার করে গেছেন, তাকে অপশাসন ছাড়া কিছু বলা যায় না। ফলে মহারাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে All Jammu and Kashmir National Conference গঠিত হয় এবং এই সংগঠনের প্রথম সভা হয় অনন্তনাগে ১৯৩৯ সালের ২ অক্টোবর তারিখে। এই সংগঠনের দ্বিতীয় সভা বসে বরামুলায় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ তারিখে। এই সভায় প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণের দাবি পাশ হয়। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের কতিপয় মৌলবাদী মুসলমান ব্রিটিশ ভারতের বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলীম লীগের অনুকরণে All Jammu & Kashmir Muslim Conference নামে একটি মৌলবাদী সংগঠন তৈরি করে। এতো চেষ্টা করেও ইংরেজ কাশ্মীরের জনগণের উপর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের জয় কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত করে [ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বারে বারেই হয়; সেই সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার জন্য কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হয়ে ভারতের অসহায়ত্ব প্রকট হচ্ছে]। ফলে ১৯৪৫ সালের মে দিবস উপলক্ষে কাশ্মীরের হাজুরীবাগে (বর্তমানে ইকবাল পার্ক) কাস্তে হাতুড়ি মার্কা লাল পতাকা তোলা হয় শেখ আবদুল্লা ও মৌলানা সৈয়দের উপস্থিতিতে ও সমর্থনে। ১৯৪৬ সালের মে মাসে অমৃতসর চুক্তি অস্বীকার করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভারতকে ভাগ করতে মুসলীম লীগকে সাহায্য করা হবে এবং কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত এবং তন্মূলে ক্রিপস মিশন, ক্যাবিনেট মিশন, বড়লাট মাউন্টব্যাটেন এবং ইংরেজ সেনাপতিদের কার্যপ্রণালী, ইত্যাদি থেকে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়)। তার ফলস্বরূপ কাশ্মীর যুদ্ধের সময় মহারাজার সম্পত্তি গিলগিটকে পাকিস্তানী হানাদারদের উপঢৌকন দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার যে নিদর্শন রাখা হয়েছিল, তার উদাহরণ ইতিহাসে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। ভারত খণ্ডিত হবার পর যখন মহারাজ হরি সিং পাকিস্তানে যোগদানে বিলম্ব করে ব্রিটিশ প্রশাসন এবং জিন্নার হিসাবকে ওলট-পালট করে দিচ্ছিলেন, তখন অধৈর্য জিন্না কাশ্মীর দখল করে নেবার জন্য হানাদারের বকলমে পাকিস্তানী সৈন্যদের কাশ্মীর দখলে পাঠিয়ে জীবনের প্রথম ও শেষ রাজনৈতিক ভুল করেছিলেন। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত মহারাজা ভারতে যোগদান করায় প্রায় শতবর্ষের ডোগরা শাসনের অবসান হয়; তারিখ ২৬

অক্টোবর, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। শুরু হয় কূটকৌশলী ব্রিটিশের কূট চালের সাফল্যস্বরূপ ভারত পাকিস্তানের কাশ্মীর নিয়ে ঠাণ্ডা-গরম লড়াই, যে লড়াই দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে কোন্ সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে, তা ভবিতব্য ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

ডোগরা অধিকার

(১৮৪৬—১৯৪৭ খ্রীঃ)

(১) গোলাব সিং (১৮৪৬-১৮৫৭ খ্রীঃ)
|
(২) রণবীর সিং (১৮৫৭-১৮৮৫ খ্রীঃ)
|
(৩) প্রতাপ সিং (১৮৮৫-১৯২৫ খ্রীঃ) — অমর সিং
অমর সিং
|
জগৎদেব সিং — (৪) হরি সিং (১৯২৫-১৯৪৭ খ্রীঃ)

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. A. History of Kashmir/P. N. Kaul Bamzai/Metropolitan Book Co (P) Ltd. / New Delhi

২. Kashmir Politics and Imperialist Manoeuvres : 1846—1980 / N.N. Raina / Patriot Publishers / New Delhi.

সপ্তদশ অধ্যায়

অধিবাসীদের সামাজিক জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

জাতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি থেকে কাশ্মীরের যে রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত জানতে পারা গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাহমীরের কাশ্মীরে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত উপত্যকা ছিল নির্ভেজাল ও নিরঙ্কুশ হিন্দু অধিবাসীদের বাসভূমি, যার সামান্য কিছু উপজাতীয় বাদে সমস্ত অধিবাসীই ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। শাহমীর কাশ্মীরে এসেছিলেন ১৩১৩ খ্রীস্টাব্দে, এবং বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে। তার আগে পর্যন্ত কাশ্মীরে জাতি হিসাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল খ্রীস্টপূর্ব আড়াই হাজার বৎসরেরও পূর্ব থেকে। অর্থাৎ উপত্যকায় বিগত ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত চার হাজার বৎসরের নিরঙ্কুশ হিন্দু আধিপত্য শেষ সাড়ে ছয়শত বৎসরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অত্যাচার, শাসন-পীড়ন, ধর্মান্তরকরণ এবং বিতাড়নের ফলে আজ প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। বিগত অর্ধশতাব্দী পূর্বেও যে সামান্য সংখ্যক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ভারত সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে সেই কটি অসহায় মানুষও প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসরের বাস্তুভূমি পরিত্যাগ করে ভারতের যত্রতত্র ছিন্নমূল অসহায়ের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। কাশ্মীর উপত্যকা যে ইতিহাসের সূচনা থেকেই নিরঙ্কুশ হিন্দুরাজ্য ছিল—এ কথা কাশ্মীরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ নীলমত-পুরাণে, কবি ঐতিহাসিক কলহনের কাব্য-ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে, বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থাদিতে, চিন ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিব্রাজকদের ভ্রমণলিপিতে, কাশ্মীরের অতুলনীয় সংস্কৃত সাহিত্যে এবং মহাত্মা আবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরীতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সে সময় ব্রাহ্মণ জাতির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও কিছুকিছু হিন্দু নিচু জাতিরও বসতি ছিল, যাদের সাধারণত বলা হত নিষাদ, কিরাত, ডোম্বস ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেরা রাজদরবারে কর্মে নিযুক্ত থাকতেন, কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করতেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ করতেন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মেও নিযুক্ত থাকতেন। উপত্যকাতে অন্য কোন জাতির অধিবাসীদের শ্রমশক্তির দুষ্প্রাপ্যতা হেতু ব্রাহ্মণদেরই যাকে বলে 'জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' সবই করতে হত। নিচু জাতির মধ্যে যে কয়টির উল্লেখ করা হল, তাদের মধ্যে নিষাদ জাতি পশু ও মৎস্য শিকার এবং নৌকা চালনা করত। কিরাত জাতি অরণ্যে অগ্নিসংযোগ করে এবং ফাঁদ পেতে রেখে বন্য জন্তু ধরত এবং ডোম্বস জাতি নাচ-গান ও খেলা দেখিয়ে উপার্জন করত। ঐ সমস্ত নিচু জাতিগুলির মধ্যে যারা সংগুণের ও

সৎকর্মের অধিকারী হত, তাদের 'কায়স্থ' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হত। অর্থাৎ কায়স্থ বলে প্রকৃত জাতি কিছু ছিল না,—এটি ছিল অর্জিত পদবীধারী একটি সম্প্রদায়। ভারতের অন্যান্য অংশে যে ভাবে বৈদিক যুগ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির মূলে ভাগ ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও নিচু জাতির মধ্যে কয়েকটি উচ্চবর্ণ ছিল, কাশ্মীরে সেরকম ছিল না। কেবল ব্রাহ্মণ এবং তারপরই কতিপয় উপজাতি। ডঃ সুনীলচন্দ্র রায় তাঁর মহামূল্যবান গবেষণাগ্রন্থে লিখে গেছেন, "...In other parts of India there were various intermediary castes between the Brahmanas on the one hand and the lower castes on the other. Curiously enough, so far as we can ascertain, such intermediate castes did never exist in the valley."[১]

ধর্ম

১. নাগ-উপাসক :

চার হাজার বৎসরের বেশি সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে উপত্যকাতে অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন উপাসক গোষ্ঠী ছিলেন। এই উপাসক গোষ্ঠীগুলি তাঁদের উপাস্য / উপাস্যদের কেন্দ্র করে নিজ নিজ ধর্মের প্রচার করে গেছেন। উপত্যকার সবচেয়ে প্রাচীন উপাসক গোষ্ঠী নাগপূজারী বা নাগ-উপাসক। এরপর এসেছে বুদ্ধের উপাসক বৌদ্ধ, শিবের উপাসক শৈব, বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব, সূর্যের উপাসক, গণেশের উপাসক এবং শক্তির উপাসক। একেবারে শেষে এসেছে নিরাকার উপাসক ইসলাম। মূলত ইসলাম ছাড়া উপত্যকার অধিবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যদের প্রভাবে এসেছে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়, অত্যাচারে নয়। কোনও অধিবাসী প্রজা, বৌদ্ধ কিম্বা শৈব্য কিম্বা বৈষ্ণব কিম্বা হিন্দু হয়েছিলেন সেই সেই ধর্মবিশ্বাসী রাজা বা রাজাদের অত্যাচারে—এমন প্রমাণ কাশ্মীরের কোন ইতিহাস বা গবেষণা গ্রন্থে নেই। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে উপত্যকার প্রায় সমস্ত অধিবাসী কেবল ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন একমাত্র রাজশক্তির অবর্ণনীয় অত্যাচারে।

কাশ্মীর উপত্যকায় নাগ-উপাসনা কখন কিভাবে শুরু হয়েছিল এ তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। উপত্যকার সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ নীলমতপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, কাশ্মীর সৃষ্টি হয়েছে হ্রদ থেকে, যেখানে নাগদের বাস ছিল। নাগরাজ নীল ছিলেন কশ্যপের পুত্র। কশ্যপের নামেই নামকরণ হয়েছে 'কাশ্মীর' (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। শিবজায়া সতীর অধিকারে ছিল এই হ্রদসহ উপত্যকা। বাসুকীর অনুরোধে বিষ্ণু নাগদের বাসভূমি জন্য ওই হ্রদ ভাগ করে দেন। পরে সেখানে জলোদ্ভব নামে এক দৈত্য এসে নাগদের উপর অত্যাচার শুরু করলে পুত্র নীলের অনুরোধে পিতা কশ্যপ দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলে তাঁরা

জলদৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং শেষে বিষ্ণু তাকে খণ্ডিত করে হত্যা করেন।[২] ভিন্নমতে পার্বতী ঐ জলদৈত্যের মস্তকে হরি পর্বতকে তুলে নিয়ে আঘাত করায় তার মৃত্যু হয়।[৩] তবে দেখা যাচ্ছে এই পুরাণে বর্ণিত জলদৈত্যের মৃত্যুর কারণ হরি (পর্বত) বা বিষ্ণু শাস্ত্রমতে অভিন্ন। কাশ্মীরের আদি শাসক নাগরাজ নীলের কাহিনী নিয়ে তৈরি এই নীলমত পুরাণে (Nilamata purana) বর্ণিত হয়েছে চারজন দিকপাল নাগ কাশ্মীরকে রক্ষা করছেন, তাঁরা হলেন—পূর্বে বিন্দুসার, দক্ষিণে শ্রীমদক, পশ্চিমে ইলাপাত্র এবং উত্তরে উত্তরমানস। এই-নাগদের উদ্দেশে কাশ্মীরে শত শত মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং স্থানের নামকরণ হয়েছিল, যাদের মধ্যে আজকের কাশ্মীরেও অনেক নাম বহাল আছে; যেমন—ভেরীনাগ, অনন্তনাগ, শেষনাগ ইত্যাদি। এমনকি সম্রাট আকবরের সময়েও নাগ দেবতাদের উপাসকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল এবং নাগ উপাসনার বহু স্থান ছিল, যার বিবরণ তাঁর মন্ত্রী মহাত্মা আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে এই-ভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, "...হিন্দুগণ কাশ্মীরকে পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া থাকে। এখানে পঁয়তাল্লিশটী স্থান মহাদেবের নামে উৎসর্গীকৃত, চৌষট্টিটী স্থান বিষ্ণুর অধিষ্ঠানভূমি, তিনটী ব্রহ্মার এবং বাইশটী দুর্গার অধিষ্ঠান স্থান। সাতশত স্থানে সর্পমূর্ত্তি আছে। এ দেশের লোক সর্পের পূজো করে।"[৪]

২. বুদ্ধের উপাসক বা বৌদ্ধ

উপত্যকায় বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে, যখন মধ্যান্তিক (Majjhantika) কাশ্মীরে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। তখন নাগরাজ অরবল (Aravala) সেখানে রাজত্ব করছেন। নাগ-পূজারীদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিবাদ উপস্থিত হলে দৈবশক্তির প্রভাবে মধ্যান্তিক সর্পপূজারীদের হৃদয় জয় করে উপত্যকায় বৌদ্ধধর্মের সূচনা করেন। মধ্যান্তিক কর্তৃক কাশ্মীরে ধর্মবিজয়ের কাহিনী সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশ (Mahavamsa), তিব্বতের ইতিহাস দুল্‌-ভা (Dul-va), এবং হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতে পাওয়া যায়।[৫] কাশ্মীরে মৌর্য অধিকার (খ্রীঃ পূঃ ৩২০) থেকে কুষাণ অধিকার পর্যন্ত (৩৫০ খ্রীঃ) প্রায় সাতশত বৎসরের রাজানুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শত শত বৌদ্ধমঠ, বিহার, স্তূপ, চৈত্য ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছিল এবং মূল্যবান ধাতু দিয়ে বুদ্ধের মূর্তি তৈরি হয়েছিল। সেইসঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল বহু নগর এবং রচিত হয়েছিল অজস্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। ভারত সম্রাট কণিষ্কের হৃদয়ে তাঁর এই অঙ্গরাজ্যটি এমনই গুরুত্ব পেয়েছিল যে, তিনি এখানে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন; যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হত পাঁচশো বৎসর অন্তর। Dr. S. C. Roy-এর মতে, "...That Kashmira was a great centre of Buddhism under the Kusanas receives further corroboration from the

fact that the fourth Buddhist Council took place in Kashmira under the auspices of Kaniska···Many great Buddhist scholars resided in Kashmira during the reign of the Kusanas···According to Chinese evidence Asvaghosa, Vasuvandhu, Vasumitra, Dharmatrata, Sanghabhadra, Jinatrata and many other scholars lived in Kasmira from the time of Kaniska onwards."[৬] বস্তুত হিউয়েন সাঙ যখন কাশ্মীর ভ্রমণে এসেছিলেন, কাশ্মীর তখন বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং কাশ্মীর থেকেই বৌদ্ধধর্ম কাবুল, কান্দাহার, ব্যাকট্রিয়া, মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও চিনে সম্প্রসারিত হয়েছিল।[৭] ভগবান বুদ্ধ কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্বের শেষ দিনটি পর্যন্ত হিন্দুধর্মাবলম্বীরও উপাস্য ছিলেন। বস্তুত সারা ভারত জুড়ে বৌদ্ধধর্ম লোপ পেয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ হিন্দুধর্মে দেবতা হিসাবে পূজা পেয়ে আসছেন দশাবতারের অন্যতম অবতার হিসাবে। সুতরাং বলা যায় হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তককে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

৩. হিন্দুধর্ম

(ক) শিবের উপাসনা : উপত্যকায় পরবর্তীকালে যে ধর্মের প্রাবল্য ছিল,—সেটি হিন্দুধর্ম। ওই ধর্মের অন্তর্গত শিবের উপাসনা কোন্ স্মরণাতীত-কাল থেকে অধিবাসীরা শুরু করেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব হয়নি। শিবের উপাসনা যে হরপ্পা সভ্যতার সময়েও ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই অনুমান করা হচ্ছে, নিকটবর্তী সিন্ধু সভ্যতার প্রভাবে কাশ্মীরে শৈব ধর্মের বিস্তার লাভ করতে পারে। অশোকেরও পূর্ব থেকে উপত্যকায় শিব উপাসনা বর্তমান ছিল। অশোক ও তাঁর পুত্র সহ পরবর্তী ভূপালগণ একের পর এক শিব মন্দির নির্মাণ করে গেছেন,—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শিব-বিজয়েশ্বর, শিব-জ্যেষ্ঠরুদ্র, শিব-ভূতেশ, শিব-মিহিরেশ্বর, শিব-ভূতেশ্বর, শিব-তুঙ্গেশ্বর, প্রবরেশ্বর, শিব-নরেন্দ্রেশ্বর, শিব-মিত্রেশ্বর, শিব-অবন্তীশ্বর, ত্রিপুরেশ্বর, সদাশিব রত্নবর্ধনেশ, শিব-প্রভাগুপ্তেশ্বর, শিব-ক্ষেমগুপ্তেশ্বর শিব-রণেশ্বর, শিব বিজয়েশ ইত্যাদি। শিব শব্দের পর সংযুক্ত নামগুলি দেখে বুঝতে অসুবিধা নাই যে, ভূপালগণ শৈব উপাসনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং যখনই তাঁরা শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে দেবতার তিনিই যে স্থাপনাকারী তা প্রচার করার জন্য নিজ নিজ নাম যুক্ত করে দেবতার নামকরণ করেছিলেন।

(খ) বিষ্ণুর উপাসনা : হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বিষ্ণুর উপাসনাও উপত্যকায় স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। বিষ্ণুর উপাসনার সূচনাকাল আজও জানা সম্ভব হয়নি।[৮] বিষ্ণুর যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্দির স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বিষ্ণু-জয়স্বামী, বিষ্ণু-রণস্বামী, বিষ্ণু-মহানস্বামী, বিষ্ণু-

দ্‌র্লভস্বামী, বিষ্ণু-ত্রিভুবনস্বামী, বিষ্ণু-গম্ভীরস্বামী, কেশব-বিষ্ণু, বিষ্ণু-মুক্তাস্বামী, বিষ্ণু-পরিহাসকেশব, বিষ্ণু-মুক্তকেশব, বিষ্ণু-মহাবরাহ, গোবর্ধনধর, রামস্বামী, কমলকেশব, বিষ্ণু-কায়াস্বামী, বিষ্ণু-উৎপলস্বামী, বিষ্ণু-ধর্মস্বামী, বিষ্ণু-পদ্মস্বামী, বিষ্ণু-কল্যাণস্বামী, বিষ্ণু-প্রভাকরস্বামী, হৃষীকেশ যোগশায়ী, নন্দীকেশব, বিষ্ণু-মেরুবর্ধনস্বামী, বিষ্ণু যশস্করস্বামী, বিষ্ণু-ফাল্গুনস্বামী, ভীমকেশব, বিষ্ণু-দিদ্দাস্বামী ইত্যাদি। বিষ্ণুর নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, উপত্যকায় ভূপালগণ কি পরিমাণ বিষ্ণু উপাসনারও পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। কাশ্মীরের সবচেয়ে প্রাচীন পুস্তক 'নীলমতপুরাণে' বর্ণিত আছে যে বুদ্ধের জন্মদিনকে স্বাগত জানানো হত বিষ্ণুর অবতার হিসাবে।[৯] *

* ভগবান বুদ্ধকে হিন্দুধর্মের দেবতা শ্রীবিষ্ণুর অবতার হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে হিন্দুধর্মের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির এবং পরধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধই বা বলি কেন, হিন্দুশাস্ত্রের ও সাহিত্যের মধ্যে গুরুনানক, শ্রীচৈতন্য, যীশুখ্রীষ্ট এমনকি হজরত মহম্মদও হিন্দুদের অন্যান্য দেব-দেবীর মতই আরাধ্য। এই বিবেচনায় হিন্দুধর্ম অনেক বেশি উদার, সংস্কারমুক্ত ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যা কিছু সর্বনাশ হিন্দুধর্মের করা হয়েছে—কিছু ধর্মব্যবসায়ীকর্তৃক হিন্দুধর্মে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং ভ্রান্ত ও অশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বলবৎ রেখে। হিন্দুধর্মের পক্ষে বিভিন্নধর্মের প্রতি সহনশীলতা সম্ভব হয়েছে একমাত্র এই কারণে যে, হিন্দুধর্ম আদৌ কোন প্রবর্তক দ্বারা সৃষ্ট কঠোর বিধিনিয়ম সম্বলিত ধর্ম নয়। এটি বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষদের ও অবতারদের উপদেশ, আর্যদের আচারানুষ্ঠান, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মতবাদের ছায়া, পরবর্তীকালে সাকার উপাসনা ইত্যাদির সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ স্মরণাতীতকাল ধরে বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতির সংমিশ্রণে হিন্দুধর্মের বর্তমান রূপটি প্রকটিত হয়েছে। নতুবা হিন্দুধর্মে অন্যান্য ধর্মগুরুরা কখনও পূজ্য হতে পারতেন না। এই রকমটি পৃথিবীর অন্য কোনও ধর্মে নেই। কোনও ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পরস্পরের ধর্মগুরুর বা উভয় ধর্মাবলম্বী হিন্দুধর্মের কোনও দেবদেবীর পুজো করার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনায়াসে যেমন পুজো করেন নিজ ধর্মের দেব-দেবীদের, তেমনই ভক্তি করেন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন খ্রীষ্টের, মহম্মদের, গুরুনানকের, শ্রীচৈতন্যের, বুদ্ধের। অনেক হিন্দুকে গির্জায় এবং মসজিদে প্রণাম করতে ও মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা করতে দেখা যায়; কিন্তু দেখা যায় না একটিও খ্রীষ্টান কিম্বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে হিন্দুর কোন দেব-দেবীর মন্দিরে মাথা নোয়াতে। হিন্দুরা যেমন সাকারে বিশ্বাসী, তেমনি নিরাকারেও বিশ্বাসী। যেমন, নিরাকৃতি বিশ্বাসীরা কেউ একটি ক্রুশকে, কেউ একটি গ্রন্থকে

এই অবতারবাদ বিষয়ে ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দশাবতারচরিতে' যে দশ অবতারের বর্ণনা দিয়েছেন তা হল, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কর্ক (কল্কি!)। এই দশাবতারের মধ্যে বলরামের স্থলে এসেছে শ্রীকৃষ্ণের নাম। কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের স্থলে এসেছে বলরামের নাম। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলে মেনে থাকেন, তাঁদের রচনাতেও এই পরিবর্তন এসে থাকতে পারে।

(গ) হিন্দুধর্মের অন্যান্য দেব-দেবী : এ ছাড়া আর যেসব হিন্দু দেব-দেবী উপত্যকায় পূজিত / পূজিতা হতেন, তাঁদের মধ্যে সূর্য, কার্তিকেয়, গণেশ, অগ্নি, লক্ষ্মী, দুর্গা, গঙ্গা, যমুনা, কামদেব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১০] সূর্য উপাসনার চিহ্ন হিসাবে মার্তণ্ড মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও বর্তমান।

কর্ম

বেদোক্ত জাতিভিত্তিক কর্ম বিভাজনের ধারা প্রাচীন কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না; কারণ সেধরনের জাতিবিন্যাস কাশ্মীরে তখনও গড়ে ওঠেনি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সামান্য কিছু উপজাতিদের বাদ দিলে, উপত্যকার প্রায় সমস্ত অধিবাসীরাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। সেজন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রতি স্তরেই তাঁদের কর্মপ্রবাহ চালাতে হত। পরবর্তীকালে বিশেষত ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশের পর, যেমন ভারতবর্ষের অন্যত্র, তেমনি কাশ্মীরেও অভিজাত ও লোকায়ত সম্প্রদায় গড়ে ওঠার ফলে কর্মের মধ্যে এবং সেইসংগে সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ-নীচ সৃষ্টি হয়। রাজসেবা, পূজার্চনা, পঠন-পাঠন, ইত্যাদির মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ করেন, এবং কৃষি সহ অন্যান্য কাজকর্ম করার দায়ভার বর্তায় ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায়, কৌলীন্য প্রাপ্ত কায়স্থ এবং ইতিমধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী 'দামারা' ও অন্যান্য উপজাতিদের উপর।

উপত্যকার মূল কর্মপ্রবাহ আজও কৃষি-ভিত্তিক। কৃষি ফসলের মধ্যে ধান্য (dhanya) প্রধান। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (৭ম শতাব্দী), উয়ো-কঙ (৮ম শতাব্দী) এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের আলবেরুনী (একাদশ) ও মার্কোপোলো (ত্রয়োদশ) সকলেই তাঁদের ভ্রমণ কাহিনীতে উপত্যকার প্রধান খাদ্য হিসাবে ধান্যের (dhanya) উল্লেখ করে গেছেন। এ ছাড়াও উৎপন্ন হত যব (yava)। ডালের মধ্যে মুসুর (masura) এবং মুগ (muga) ছিল প্রধান। চৈত্র (Caitra) মাসে ধান্যের বীজ বপন করা হত, এবং ভাদ্র

ইত্যাদি প্রতীক করে উপাসনা করেন, তেমনি সাকার বিশ্বাসী হিন্দুও একটি শিলাখণ্ডকে প্রতীক করে এমনকি বিনা প্রতীকেই পূজার্চনা ও জপতপ করেন। এ জন্যই হিন্দুর পক্ষে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মেনে নেওয়া সহজ হয়েছে, যেহেতু তুলনামূলকভাবে হিন্দুধর্ম বেশী সহনশীল।

(Bhadrapada) মাসে নতুন ধান্য উঠলে নবান্ন (navanna) উৎসব অনুষ্ঠিত হত। অন্যান্য ফসলের মধ্যে আঙুর বা দ্রাক্ষা (Draksa) ছিল ধান্যের পরই উপত্যকার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ফসল। কাশ্মীরের দ্রাক্ষা এতই সুস্বাদু যে স্বর্গেও দুর্লভ ছিল বলে মন্তব্য করেছেন কলহন[১১]। কৃষি ফসলের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য মহারাজ অবন্তীবর্মার মন্ত্রী সুয়্য বা সূর্য সেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন।

কৃষি ছাড়াও শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে পশমের জন্য মেষ পালন কাশ্মীরে বিখ্যাত। আমদানীকৃত রেশমের দ্বারা রেশম বস্ত্র উৎপন্ন হত। শাল, আলোয়ান, টুপি, দস্তানা, রেশমজাত বস্ত্র ও বিবিধ পরিচ্ছদ এবং কার্পাসজাত মসলিন উৎপাদনেও কাশ্মীর বিখ্যাত ছিল। এ ছাড়া দ্রাক্ষারসের তৈরি বিবিধ পানীয়, গহনা দ্রব্য, মৃৎপাত্র, চর্ম ও কাষ্ঠ নির্মিত নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী প্রভৃতি উৎপাদন-কর্মে উপত্যকার অধিবাসীরা নিযুক্ত থাকত। তখনকার উপত্যকায় শিল্প, বাণিজ্য ও কর্ম নিযুক্তির বিষয়ে বিশদ বর্ণিত হয়েছে অলবেরুনীর বিখ্যাত রচনা 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থে।

সাহিত্য

কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্য বলতে কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যকেই বোঝায়। ভারতের অন্যান্য অংশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সংগে সংগে সংস্কৃত, পালি, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ইত্যাদি ভাষার/লিপির সৃষ্টি ও অবলুপ্তি ঘটলেও কাশ্মীরে অন্তত ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। বর্তমানে ভারতের অন্য অংশে যেমন মিশ্র ভাষার ও মিশ্র লিপির সৃষ্টি হয়েছে, কাশ্মীরেও তেমনি চতুর্দশ শতাব্দীর পর থেকে মিশ্র ভাষা ও মিশ্র লিপির সৃষ্টি হয়েছে। কাশ্মীরের বর্তমান ভাষার মধ্যেও তাই সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়[১২]। উপত্যকার আদি পুস্তক হিসাবে 'নীলমতপুরাণকে' (Nilmata-purana) বলা হয়। এই পুস্তকে বর্ণিত আছে কাশ্মীর সৃষ্টির কাহিনী এবং আদিশাসক কশ্যপপুত্র নাগরাজ নীলের কাহিনী। কিন্তু এই পুস্তকের রচয়িতার নাম ও রচনাকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এরপর থেকে কাশ্মীরের কবি-ঐতিহাসিক কলহনের কাব্য-ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' (রচনাকাল ১১৪৯-১১৫০ খৃষ্টাব্দ) রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কাশ্মীরে সংস্কৃত সাহিত্যকে যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের রচনা দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করে গেছেন, এখানে তাঁদের অপূর্ব রচনার কেবল উল্লেখ করা হবে বিশালতা বোঝার জন্য। সুদীর্ঘ দেড় সহস্র বৎসরেরও অধিককাল সময়ে (চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত) কাশ্মীরের সংস্কৃত সাহিত্য যে কি বিশাল ও বহুবিস্তৃত হয়েছিল, তা বুঝে যে-কোন সুধী পাঠক হতবাক হয়ে যাবেন।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি আদি গ্রন্থ 'নীলমতপুরাণের' কথা, যার রচয়িতার নাম উদ্ধার সম্ভব হয়নি। এরপর যে সমস্ত কবি, লেখক, সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক, নাট্যকার, ভাষ্যকার, সমালোচক, দার্শনিক, চিকিৎসক, রাষ্ট্রবিদ প্রভৃতির রচনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খ্যাতি অর্জন করেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত অপূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হচ্ছে। এর পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়ে রচনাগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে সেটিই একটি বিশাল পুস্তকের আকার গ্রহণ করবে। তাই আপাতত তা থেকে বিরত হয়ে সুধী পাঠকমণ্ডলীর কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্য সম্ভারের একটা ধারণা সৃষ্টির জন্য এই সংক্ষিপ্ত তালিকার অবতারণা।—

রচনা	রচয়িতা	আনুঃ রচনাকাল (খ্রীষ্টীয়)
নীলমতপুরাণ	অজ্ঞাত	খ্রীস্ট পূর্বাব্দ
সেতুবন্ধকাব্য (সম্রাট প্রবরসেনের অনুরোধে লিখিত)	কালিদাস	ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যাংশ
নাট্যপ্রদীপ	সুন্দর মিশ্র	ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ
নাট্যশাস্ত্র	ভরত	ঐ
সুভাষিতাবলী	বল্লভদেব	ঐ
কাব্য মীমাংসা	রাজশেখর	?
মহাভাষ্য মঙ্গল শ্লোক	চন্দ্রাচার্য	ঐ
ভুবন অভ্যুদয় শার্ঙ্গধর পদ্ধতি সুক্তিমুক্তাবলী কাব্যপ্রকাশ	শংকুক	ঐ
কাব্যালংকার	ভামহ	অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ
অলংকার সংগ্রহ কুমারসম্ভব	উদ্ভট	অষ্টম শতকের প্রথমাংশ
কাব্যালংকার সূত্র	বামন	ঐ
হরবিজয় বক্রোক্তি পঞ্চাশিকা	রত্নাকর	নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ
ধ্বন্যালোক কাব্যালোক সদয়লোক অর্জুনচরিত মহাকাব্য হরিবিজয় (প্রাকৃত)	আনন্দবর্ধন	ঐ
শৃঙ্গার তিলক	রুদ্রভট্ট	নবম শতাব্দীর শেষভাগ

রচনা	রচয়িতা	আনুঃ রচনাকাল (খ্রীষ্টীয়)
ন্যায়মঞ্জরী আগমাদম্বর ন্যায়কলিকা	জয়ন্ত ভট্ট	নবম শতাব্দীর শেষভাগ
কাদম্বরী কথাসার	অভিনন্দ	দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ
তন্ত্রলোক নাট্যলোক অভিনয়ভারতী	অভিনব গুপ্ত	দশম শতাব্দীর শেষভাগ
সুত্রীতিলক দশাবতারচরিত সময়মাত্রক কবিকণ্ঠাভরণ ভারত মঞ্জরী রামায়ণ মঞ্জরী ব্রতকথা মঞ্জরী পদ্যকাদম্বরী অবদানকল্পলতা সেব্য-সেবকোপদেশ চতুর্বর্গ সংগ্রহ দর্পদলন কলাভিলাষ দশোপদেশ	ক্ষেমেন্দ্র	একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ
প্রত্যাভিজ্ঞ হৃদয় স্পন্দ নির্ণয় নেত্রোদ্যোত শিবসূত্র বিমর্ষিনী স্তবচিন্তামণিটীকা উৎপলস্তোত্রাবলীটীকা পরা-প্রবেশিকা	ক্ষেমরাজ	একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ
বিক্রমাঙ্কদেব চরিত কর্ণ সুন্দরী	বিল্হন	একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ
শ্রীকান্ত চরিত সংখ্যাকোষ	মংখ্যা	১১৩৫-১১৪৫

রচনা	রচয়িতা	আনুঃ রচনাকাল (খ্রীষ্টীয়)
অলংকার সর্বস্ব অলংকারানুসরণী	রুয়্যক	১১৩৫-১১৪৫
রাজতরঙ্গিণী	কলহন	১১৪৯-১১৫০

সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের উপরি-উক্ত কতিপয় উল্লেখ দৃষ্টে বোঝা যায় যে, প্রায় দেড় সহস্র বৎসর যাবৎ কাশ্মীরে সংস্কৃত সাহিত্যের কি প্রকার ব্যাপ্তি ঘটেছিল। কবি ঐতিহাসিক কলহনের সুবিশাল ইতিহাস পুস্তকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও রচনা সম্ভার সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে অন্ততঃ অষ্টম শতাব্দী থেকে। Dr. S. C. Roy-এর ভাষায়, "Kalhana's very frequent references to numerous Kasmirian authors and their works enable us to follow the history of Sanskrit Literature of Kasmira with tolerable accuracy from the 8th century onwards. The works of many of the writers themselves have also survived and some of these contain valuable informations about other foregoing and contemporary writers and their compositions..."[১৩]

খাদ্যাভ্যাস

যে-কোন দেশের অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস সহ দৈনন্দিন জীবন-যাপন পদ্ধতি পরিচয় করিয়ে দেয় জাতির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উন্নতিকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাশ্মীরবাসীর প্রধান খাদ্য চাউল। চাউল তৈরি হয় ধান্য থেকে। ধান্যের উৎপাদন এবং চাল থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্যে এমনকি প্রাচীনতম গ্রন্থ নীলমতপুরাণেও বর্ণিত আছে। চাল ছাড়া উপত্যকায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফসল যব (yava), যার সাহায্যেও বিবিধ পিষ্টক (pistaka) তৈরি করা হয়। এছাড়া ডাল, সব্জি, দুধ, মাংস, মৎস্য, প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।[১৪] মাংস কাশ্মীরীদের প্রিয় খাদ্য। মোরগ, মেষ, ছাগ, গৃহপালিত শূকর এবং বিবিধ পক্ষির মাংস গ্রহণে অভ্যস্ত। কিন্তু উপত্যকার অধিবাসীরা গো-মাংস ভক্ষণ করে না। কাশ্মীরে গো-মাংস ভক্ষণ করা মহা অপরাধ। স্বামী অভেদানন্দের ভ্রমণ বিবরণীতে এইভাবে লেখা আছে, "কাশ্মীরীরা বাঙ্গালীর ন্যায় দুইবেলা ভাত খায়, এবং হিন্দু ও মুসলমান সকলেই মাছ মাংসভোজী। কিন্তু মুসলমানেরা গো-বধ করিতে অথবা গোমাংস খাইতে পারে না। যদি কোন মুসলমান গো-বধ করে অথবা গো-মাংস খায়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হয়, তাহার কারাবাস ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। কাশ্মীরীরা পূর্ববঙ্গবাসীদের ন্যায়

রান্নার তরকারীতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে লংকা ব্যবহার করে…।"[১৫] Dr. S. C. Roy তাঁর গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন যে, কাশ্মীরবাসীরা কুক্কুট, মেষ ও ছাগমাংস খায়। গো-মাংসের উল্লেখ খাদ্যতালিকায় নাই।[১৬] কাশ্মীরীরা যে মাংস ও তরকারীতে অতিরিক্ত ঝাল-মশলা প্রয়োগ করে একথা মার্কো পোলো (খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী) তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতেও লিখে গেছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, কাশ্মীরীদের সঙ্গে বঙ্গবাসীদের প্রচুর মিল রয়েছে।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. Early History and Culture of Kashmir / Dr. Sunil Chandra Roy / p 86 1957

২. ibid—/ p 170

৩. The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books—New Delhi / 1992 / p 43

৪. আইন-ই-আকবরী / আবুল-ফজল / বাংলা অনুবাদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় / বসুমতী-কার্যালয় ১৮৯৭ খ্রী / পৃ-১০১

৫. Early History and Culture of Kashmir / Dr. Sunil Chandra Roy / 1957 pp 142-143

৬. ibid / pp 143-144

৭. ibid / p 149

৮. ibid / p 154

৯. ibid / p 157

১০. ibid / p 157

১১. ibid / 104

১২. কাশ্মীরে ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ / শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ / পঞ্চম সংস্করণ ১৩৯১ / পৃ. ৮৭

১৩. Early History and Culture of Kashmir / Dr. Sunil Chandra Roy / 1957 / pp 171-172

১৪. ibid—p 209

১৫. কাশ্মীরে ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ / শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ / পঞ্চম সংস্করণ ১৩৯১ পৃ. ৫৯

১৬. Early History and Culture of Kashmir / Dr. Sunil Chandra Roy / 1957 / pp 207-208

অষ্টাদশ অধ্যায়

যীশুখ্রীষ্ট ও কাশ্মীর

কাশ্মীরের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনার প্রশ্নে যদিও খুব বেশি প্রাসঙ্গিকতা নেই, তবুও তখনকার কাশ্মীরের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যীশু-খ্রীষ্টের কাশ্মীর তথা ভারত ভ্রমণের কিংবদন্তির উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি। যে সময়ে যীশুখ্রীষ্টের কাশ্মীরে অবস্থানের কাহিনী উল্লেখ করা হচ্ছে, সে সময়ে কাশ্মীর তথা গান্ধার [তৎকালে কাশ্মীর গান্ধার প্রদেশের অন্তর্গত ছিল] ব্যাকট্রীয় গ্রীক অধিকারভুক্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়। তারও পূর্বে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম-সহ কাশ্মীরের বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সারা ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, নালন্দা শিক্ষা ও সংস্কৃতির এবং কুরু, পাঞ্চাল, মগধ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্যাধিকারগুলি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান হিসাবে সে সময়ের পৃথিবীর সভ্যতার কাছে ছিল বিস্ময়। যেমন একসময় সব রাস্তাই রোমের দিকে গিয়েছিল, তেমনই ঐ সময়ে ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষা বিশেষত চিকিৎসা, গণিত, বিজ্ঞান, এবং দর্শনশাস্ত্রের আকর্ষণে জীবন তুচ্ছ করেও বিদ্যার্থী ও পরিব্রাজকেরা ভারতের দিকে ছুটে এসেছেন জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য এবং লুণ্ঠনকারীরা ছুটে এসেছেন লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য। বর্তমানের হতভাগ্য ভারতীয়রা যেমন মনে করেন, ইউরোপ আমেরিকা একবার না দর্শন করে আসতে পারলে মনুষ্য জন্ম সার্থকতা পাবে না, তেমনি সে সময়ে একবার ভারতবর্ষ ঘুরে যেতে পারলে জীবন সার্থক হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। এ বিষয়ে মহাপ্রভু যীশুর জীবনীলেখক বিখ্যাত রাশিয়ান পর্যটক নিকোলাস নটোভিচের ভাষায়, '...It is to be supposed that Jesus Christ chose India, first, because Egypt made part of the Roman possessions at that period, and then because an active trade with India had spread marvellous reports in regard to the magestic character and inconceivable riches of art and science in that wanderful country, where the aspirations of civilized nations still tend in our own age..."[১]

সুতরাং ভারতবর্ষের আকর্ষণে কিশোর ঈশা যদি ভারতে এসে থাকেন, তাতে অসম্ভব বা অবাস্তবের কিছু নেই। বরঞ্চ যীশুর ভারতবর্ষে আসার কিংবদন্তি না থাকলেই আমি মনে করি তাঁর যীশুখ্রীষ্ট হওয়ার কার্য-কারণ পেতাম না। একমাত্র ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাবাদই চরম শারীরিক পীড়ন সত্ত্বেও তা সহ্য করতে পারা এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারার শিক্ষা

দিয়েছে সে সময়, যখন এ ধরনের চিন্তাধারা তদানীন্তন বহির্বিশ্বে ছিল না। শুধু তাই নয়, শিক্ষাগুরু বা ধর্মগুরুর নামে গৌরবান্বিত হওয়ার রীতি সে যুগে প্রচলিত ছিল। গুরুরাও শিষ্যদের বা ভক্তদের নামের পূর্বে বা পরে যুক্ত হয়ে তাদের মধ্যে বেঁচে থাকতেন, অর্থাৎ তিনি মরেও শিষ্যদের নামের মধ্যে অমর হয়ে থাকতেন। শিষ্যদের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ শিষ্যপরম্পরায় প্রচলিত থাকত সেই গুরুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বা ভাবধারা। সুতরাং ঈশা ভারতে এসে যদি ভারতীয় বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-দর্শনাদি পাঠ করে ভারতীয় ভাবধারায় নিজেকে দীক্ষিত করে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমি অনুমানের উপর নির্ভর করেই বলছি যে, ঈশার খ্রীস্ট নামটি 'কৃষ্ণ' নামেরই পরিবর্তিত রূপ। বিদেশী উচ্চারণে কৃষ্ণ নাম 'খ্রীষ্ট'তে পরিণত হয়েছে। তাঁর জীবনের যে ১৬ বৎসর অজ্ঞাত আছে, সেই অজ্ঞাতবাসের পর তাঁর নাম হয়েছে দেখা যাচ্ছে 'ঈশার' বদলে 'খ্রীষ্ট'। এর ব্যাখ্যা আমি পাইনি। কখন কিভাবে এই নামকরণ হল, তা কে বলবেন? কিন্তু প্রমাণ আছে তিনি মাত্র তেরো বৎসর বয়সে পূর্বদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং কাশী, মগধ, পুরী প্রভৃতি ভ্রমণ করেছিলেন এবং ছয় বৎসর ধরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে ভারতীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপর গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান ভ্রমণকালীন পালি ভাষা শিক্ষা করে কাশ্মীরে আসেন। এবং ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে জন্মভূমিতে ফিরে যান। ঈশার ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও কর্মের প্রভাব তাঁকে আগ্রহান্বিত করতে পারে, যেজন্য তিনি কৃষ্ণের ভাবশিষ্যত্ব অনুভব করে তাঁর নামের শেষে কৃষ্ণ নামটি যোগ করেছিলেন, (অনেক ভক্ত আবার সারা অঙ্গে স্থায়ীভাবে লিখে রাখেন) এটা হওয়া অসম্ভব বলে আমি মনে করি না।

যীশুর জীবনের এই অকথিত-অজানিত ষোল বৎসরের বিবরণ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাতেই লেখা হয়নি। কারণ একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া যীশুর জীবনের এই অজ্ঞাত অংশ কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। খ্রীষ্টের জীবনী লেখা হয়েছিল তাঁর ক্রুশ বিদ্ধ হবার বহু পরে। ততদিন তাঁর জীবনী ভক্তদের পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া সুন্দর করে লিখে রাখার মতো সাহিত্য ও ভাষা-জ্ঞানও ভারতবর্ষ এবং প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ছাড়া তখনকার পৃথিবীতে ছিল না। তাই তাঁর ক্রুশ বিদ্ধ হবার পর পৃথিবীর অন্যত্র যখন প্রথম জীবনী লেখা হল, তখন কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে। কিন্তু ভারতে তাঁর জীবনী তাঁর প্রকৃত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয়েছিল; কারণ তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন ভারতবর্ষের কাশ্মীরে এবং ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়েছেন—তাঁর অমর প্রেমের জন্য।

তিনি ভারতীয় ভাবধারাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে জেরুজালেমে ফিরে গিয়ে তা প্রচার করতে থাকায় তাঁকে ধর্মীয়গুরু তথা রাজরোষে পড়তে হয় এবং যার পরিণতি ক্রুশবিদ্ধ হওয়া। ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মহাপ্রভু খ্রীষ্টের মৃত্যু হয়নি। কারণ তিনি ভারতে থাকাকালীন 'সমাধিস্থ'

হবার যোগবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের জীবনী-লেখক তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ' ভ্রমণ গ্রন্থে বলেছেন, "...এ সম্বন্ধে একজন পুরাতত্ত্ববিদ মনীষী আর্থার লিলি তাঁহার 'ইণ্ডিয়া ইন প্রিমিটিভ ক্রিশ্চিয়ানিটি' পুস্তকে (২০০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, যীশু একজন এসিনী ছিলেন এবং ভারতীয় যোগীদের ন্যায় নিভৃত স্থানে ব্রহ্মের সহিত একাত্মবোধ এবং পরমাত্মার আশীর্বাদ লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন।'[১] ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় সাধক স্বামী রামতীর্থের 'The Spiritual Power that wins' নামক বক্তৃতায়। সেটির কিছু অংশ, "...Now, Christ regained this union with the spirit before his death. You know that Christ did not die when he was crucified. This is a fact which may be proved. He was in a state called 'Samadhi', a state where all life functions stop, where the pulse beats not, where the blood apparently leaves the veins, where all signs of life are no more. Where the body is, as it were, crucified, Christ threw himself into that state for three days and like a 'Yogi' came to life again ; made his escape and came back to live in Kashmir..."

"Rama (Swami Rama Tirtha) had been there and found many signs of Christ having lived there ; upto that time there was no Christian sect in Kashmir. There were many places, called by his name, where Christians never came. Cities called by the same names as many of the cities of Jerusalem through which Christ passed. There is standing a grave of nearly 2000 years. It is held very sacred and called the 'Grave of Eash' (Isha), which is the name of Christ in Hindusthani language, and 'Eash' means 'Prince'. So there are many reasons to prove that He (Jesus) came to India, the same India where he learned his teaching"[৩]

সুতরাং তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবার পর তাঁর ভক্তরা তাঁকে কবর থেকে তুলে এনে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করেন এবং সমাধিভঙ্গের পর তিনি স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে তাঁর স্বপ্নের দেশ কৈশোরের লীলাভূমি ভারতে চলে আসেন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় কাশ্মীরে কাটিয়ে ওখানেই দেহত্যাগ করেন। কাশ্মীরে শ্রীনগরের কাছে খানাইয়ারীতে যীশুখ্রীষ্টের নামে একটি কবর আছে। স্বামী অভেদানন্দের ভ্রমণকাহিনী লেখক ভৈরবচৈতন্য মহারাজের ভাষায়, "হরি-পর্বতের উপর হইতে নামিয়া স্বামীজী ইহার পাদদেশে অবস্থিত 'খানা-ইয়ারী' নামক বস্তিতে যীশু-

খ্রীষ্টের সমাধি-মন্দিরটি দেখিতে গেলেন। স্থানীয় মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের পয়গম্বর ঈশা স্বদেশে শত্রুর তাড়নায় কয়েকজন সহচরের সহিত গুপ্তভাবে এই স্থানে পলাইয়া আসিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাস করেন ও শেষে তাঁহার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণ এই স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করেন। সমাধি-মন্দিরের ভিতরটিতে অতি পবিত্র ভাব বর্তমান। দেওয়ালের মধ্যস্থিত একটি সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে দিব্য গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। তাঁহারা ইহাকে ঈশা পয়গম্বরের অলৌকিক শক্তি বলিয়া মনে করেন। এইস্থানে অনেকে রোগ আরাম হইবার জন্য 'হত্তা' দিয়া থাকেন। অনেকে বলেন, ভগবান যীশু কাবুলের পথে কাশ্মীরে আসিবার সময়ে যে পুষ্করিণীতে হাত-মুখ ধুইয়া জলপান করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। বাল্যকালে পশ্চিম তিব্বতের হিমিস মঠে আগমন, জগন্নাথ ধামে ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে যে সমস্ত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, এই স্থান দেখিয়া সেগুলি সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল ...”[৪]

মহাপ্রভু যীশু ভারতবর্ষে এসে একইভাবে তাঁর ধর্মের বাণী প্রচার করতে থাকেন। ভারতবর্ষে যাঁরা তাঁর ভাবধারা গ্রহণ করলেন, তাদের 'নাথ সম্প্রদায়' বলা হয়ে থাকে। এই নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর নাম 'ঈশাইনাথ'। এখানে উল্লেখ্য যে মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রে 'যীশু' 'ঈশা' নামে পরিচিত। নাথ-যোগীদের ঈশাই নাম থেকে যে এই নাম পরিকল্পিত হয়েছে, স্পষ্টই বোঝা যায়। ভবিষ্য-পুরাণে যীশুর এই নাম যেভাবে লেখা হয়েছে,—

“ঈশামূর্তির্হৃদি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী
ঈশা-মসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম ॥”[৫]

ভবিষ্য পুরাণ ৩ / ২ / ৩০

ভারতবর্ষে ঈশা (খ্রীষ্ট) কর্তৃক উক্তরূপ ধর্ম প্রচারের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পুরাণে রয়েছে।[৬] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, 'ঈশা' অর্থে খ্রীষ্টকে বোঝানোর ক্ষেত্রে দ্বিমত নেই; কিন্তু 'মসীহ' অর্থে যীশুখ্রীষ্টকে বলা যায় না যদিও তা উক্ত শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৭]

ভগবান যীশুখ্রীষ্টের এই অজ্ঞাত জীবনী সম্বন্ধে লাডাকের হিমিস গুম্ফায় যে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, সে সম্বন্ধে নিকোলাস নটোভিচ যে প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেছেন, সেটির নাম “The Unknown life of Jesus Christ;” এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন মহাপ্রভু যীশুখ্রীষ্টের জীবনী। এই জীবনী ওই গুম্ফায় রক্ষিত দুহাজার বৎসরের পুরাতন পুঁথিতে ছন্দে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি সেই পুস্তক থেকে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে নেন। রাশিয়ান ভাষা থেকে সেটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন J. H-Connelly এবং L. Landsberg মহোদয়গণ। নটোভিচেরই জবানীতে, “...At length, yielding to my ardent insistence he brought me big books, the large leaves of which

were of paper yellow with age, and from them read to me the biography of ISSA, which I carefully transcribed in my travelling note-book according to the translation made by the interpreter. This curious document is compiled under the form of isolated verses, which as placed, very ofter no apparent connection with, or relation to each other...During a long time I revolved in my mind the purpose of publishing the memories of the life of Jesus Christ found by me in HIMIS, of which I have spoken, but other interests absorbed my attention and delayed it..."[৮]

নটোভিচের ওই পুস্তক পাঠ করে স্বামী অভেদানন্দ যখন লাডাক ভ্রমণে যান, তখন তিনি ঐ গুম্ফায় কাশ্মীর মহারাজার অতিথি হিসাবে অবস্থান করেন এবং তিনিও গুম্ফায় ওই পুস্তকের নকল থেকে অনুবাদ করে এনেছিলেন। এবং দেখা যায় যে নটোভিচ এবং অভেদানন্দ স্বামীর গৃহীত অনুবাদ অনুযায়ী মহাপ্রভু যীশুর ভারতে অবস্থানকালীন জীবনীর বর্ণনা অভিন্ন।

এবার প্রশ্ন আসতে পারে—লাডাকের হিমিস গুম্ফায় রক্ষিত প্রায় দুহাজার বৎসরের প্রাচীন পুস্তকে রক্ষিত যীশুর জীবনী সত্য বলে আমরা কতদূর গ্রহণ করতে পারি ? এ বিষয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, যে বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগের বিচারে আসা হচ্ছে, অর্থাৎ যীশুর হেমিস-সহ ভারত ভ্রমণ, সে বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণের প্রশ্ন নেই। তবে প্রমাণ সংক্রান্ত বিষয়ে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ক্ষেত্রবিশেষে চাক্ষুষ প্রমাণের চেয়েও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উপর নির্ভর করেই আমাদের সিদ্ধান্তে পেঁছোতে হবে।

প্রথমত, হিমিস গুম্ফায় রক্ষিত জীবনী বলে দাবিকৃত লেখা প্রকৃতই যীশু-খ্রীষ্ট নামক ধর্ম প্রবক্তার জীবনী কিনা। আমি সঙ্গত কারণে উক্ত পুস্তকে লিখিত জীবনী তুলে দিতে পারছি না, তবে অনুসন্ধিৎসুরা কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'The Unknown life of Jesus Christ' পুস্তকটি থেকে খ্রীষ্টের জীবনী তুলে আনতে পারেন এবং দেখবেন যে পৃথিবীর অন্যান্যস্থানে নথিভুক্ত যীশুর জীবনী অভিন্ন ; কেবল ভারতে অবস্থানকালীন ষোল বৎসরের জীবনী ছাড়া। সুতরাং হিমিস গুম্ফার ঐ জীবনী যে 'ঈশা' তথা যীশুখ্রীষ্টের জীবনী তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না ; কেবল প্রশ্ন থাকে, তৎসন্নিবেশিত ষোল বৎসরের ভারত ভ্রমণকালীন ঘটনাবলী সত্য কিনা।

দ্বিতীয়ত, হিমিস মঠের লামারা দাবি করেছেন, খ্রীষ্টের মৃত্যুর তিন / চার বৎসর পরে তাঁর জীবনী পালি ভাষায় লেখা হয়। ইতিহাস বলে, মহাপ্রভু

যীশুর সময়ে পালিভাষা ভারতের অন্যতম রাজভাষা ছিল এবং লাডাকে তখন পালিভাষাই প্রচলিত ছিল। মঠাধ্যক্ষগণ পরে সুবিধার্থে তিব্বতী ভাষায় একটি নকল করে নেন। নটোভিচ এবং স্বামী অভেদানন্দ উভয় পরিব্রাজকের সংগৃহীত জীবনীই এক ও অভিন্ন।

তৃতীয়ত, কাশ্মীরের ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রায় দু হাজার বৎসর পূর্বে লাডাক ছিল কাশ্মীরের অংশ (আজও লাডাক কাশ্মীরের অংশ)। সেজন্য যীশু কাশ্মীরে অবস্থানকালীন সেখানে পুনরায় গিয়ে থাকতে পারেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর কাশ্মীরের অন্তর্গত লাডাকে তা লিখিত হয় এবং ঐ গুম্ফায় রক্ষিত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হলেও কাশ্মীরে তখন পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্মের তুঙ্গ অবস্থা।

চতুর্থত, যীশু যদি ভারতে তথা কাশ্মীরে দুবার না এসে থাকেন এবং কাশ্মীরে অবস্থানকালীন তাঁর দেহাবসান না হয়ে থাকে, তাহালে সুদূরে যেরুজালেমে কোথায় একজন ধর্মীয় গুরুর ক্রুশে মৃত্যু হল, আর তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হল সেখান থেকে প্রায় ছ-হাজার কিলোমিটার দূরে পার্বত্য রাজ্যের এক অজ্ঞাত গুম্ফায় ; যে যুগে পদব্রজে ও অশ্বারোহণে ছাড়া যাতায়াতের উপায় ছিল না ? কল্পনারও তো একটা সীমা থাকা উচিত ! সুতরাং যার জীবনী লেখা হচ্ছে, কাছাকাছি চাক্ষুষ না থাকলে সে যুগে তা লেখা সম্ভব হত না বলে আমার বিশ্বাস। তিনি সশরীরে কাশ্মীরে বর্তমান থাকায় তাঁর মৃত্যুর তিন/চার বৎসর পরেই ওই জীবনী লেখা সম্ভব হয়েছিল।

পঞ্চমত, পৃথিবীর আর অন্য কোন স্থানে যীশুর জীবনীর ঐ হারিয়ে যাওয়া ষোল বৎসরের ঘটনা লিপিবদ্ধ নেই। এ কারণে নেই যে, তিনি তখন এতখানি বিখ্যাত হননি যে, তাঁর খ্যাতি ভারত অতিক্রম করে জেরুজালেমে পৌঁছে গেছে। তিনি খ্যাতিমান হয়েছেন উনত্রিশ বৎসরের পর জেরুজালেমে ফিরে গিয়ে। পৃথিবীর অন্যত্র ঐ ষোল বৎসরের ঘটনা সেজন্য লেখা সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর অজ্ঞাতবাসের কাহিনী বলেছিলেন কিনা সন্দেহ থেকে যায়, তবে তাঁর পুনরুত্থানের পর তিনি নিশ্চয়ই বলেছিলেন, যেজন্য তাঁকে শিষ্যরা কাশ্মীরে আনতে পেরেছিলেন।

ষষ্ঠত, প্রায় দু হাজার বৎসর ধরে কাশ্মীরে খানাইয়ারীতে ঈশার কবর বলে যে স্থানকে সম্মান জানানো হচ্ছে—এরূপ একটি স্থানকে পরম পবিত্র হিসাবে সংরক্ষিত রেখে মিথ্যাচারের কি প্রয়োজন ছিল বা আছে ? হয়ত ভ্রান্তি থাকতে পারে ; কিন্তু সজ্ঞানে তাঁরা মিথ্যাচার করে চলেছেন—এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না ; কারণ সে যুগের ধর্মভীরু মানুষ অন্তত একজন মৃতের পবিত্র নাম ও সমাধি নিয়ে জুয়াচুরি করে চলবেন—এটাও অভাবণীয়।

এ বিষয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোরাভিয়ান মিশনারীগণ, লাদাকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে যাঁদের দান লাদাকবাসীরা কোনদিন ভুলবে না, একটি

অনুসন্ধান চালান। আমি সে বিষয়ে বিশদ জানাবার জন্যে লণ্ডনে ঐ মিশনারীদের কেন্দ্রীয় অফিসের পাঠাগার বিভাগের প্রধান শ্রীমতী জেনেট হাল্টনকে পত্র দিলে তিনি আমাকে ইং ২০।২।৯৫ ও ৭।৩।৯৫ তারিখে তথ্য-সহ উত্তর দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পত্রে তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক A. H. Francke-এর লেখা Antiquities of Indian Tibet গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা জেরক্স করে পাঠান, যাতে লেখা আছে যে, নটোভিচের বক্তব্য জালিয়াতিপূর্ণ।

A. H. Francke তাঁর ঐ গ্রন্থে যীশুর ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে প্রতিবাদে ও অস্বীকারে কয়েকটি মাত্র লাইন খরচ করে তাঁর কর্তব্য তথা অনুসন্ধান সমাধান করেছেন এই ভাবে ঃ

"...This monastery which built by King Seng-ge-rnam-rgyal only about 300 years ago, has acquired unusual fame among European visitors to Ladakh...The monastery was also frequently referred to fifteen or eighteen years ago, when the Russian Traveller Notovitch surprised the world by stating that he had found in it a copy of a new Christian gospel written in Pali. A great deal of learned correspondence then took place which proved that Notovitch's extraordinary find was a forgery..."[৯+১০]

ফ্রাঙ্কে সাহেবের ঐ লাইন কটির উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত আলোচ্য বিষয়ের (issues) ভিত্তিতে বিতর্কের সৃষ্টি করা যেতে পারে :

এক : হেমিস গোম্ফা মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্বে তৈরি হয়েছে এবং সিংগে নামগিয়াল (বা নামজাল) তৈরি করেছেন।

দুই : A. H. Francke কর্তৃক হেমিস ভ্রমণের মাত্র ১৫।১৮ বৎসর পূর্বে নটোভিচ হেমিস ভ্রমণ করে গেছেন।

তিন : নটোভিচ এই গোম্ফায় যীশুর ভিন্নতর জীবনী লেখা পুঁথি (new Christian gospel) খুঁজে পাওয়ার বর্ণনা দিয়ে পৃথিবীকে তাক লাগিয়েছিলেন।

চার : এই বিষয় নিয়ে ঐ সময়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছিল।

পাঁচ : তাতে প্রমাণিত হয়েছিল যে, নটোভিচের লেখাটি জালিয়াতিপূর্ণ।

এবারে ঐ বিষয় গুলির বিতর্কে আসা যাক :

এক : ফ্রাঙ্কে সাহেব দাবি করেছেন যে,

(ক) হেমিস গোম্ফা মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল এবং

(খ) নির্মাণ করেছেন বা সমাপ্ত করেছেন সিংগে নামগিয়াল, যাঁর রাজত্বকাল ১৫৯০-১৬২০ খ্রীঃ।

তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে তাঁর আরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ Ladakh

the Mysterious Land-এর ৯৯-১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ থেকে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, হেমিস গোম্ফার নির্মাণ মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্বে হয়েছে এবং সিংগে নামজাল সেটি তৈরি করেছিলেন,—এ তথ্য কতদূর সত্য? যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁর লিখিত বিবরণ একশ ভাগ সত্য, তাহলে প্রভু যীশুর হেমিসে আগমনের দাবি এক কথায় মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়; যদিও ঐ গোম্ফায় রক্ষিত পুঁথি মিথ্যা হয় না। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই (স্বীকার করি না) যে, হেমিস গোম্ফা প্রকৃতই প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল, তাতে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, যীশু হেমিসে আসেননি; তাতে এই প্রমাণ হয় না যে, হেমিসে রক্ষিত পুঁথিটি মিথ্যা বা তাতে বর্ণিত যীশুর ভারত ভ্রমণের বিবরণ মিথ্যা। এমন হতে পারে, ঐ পুঁথি ভারতের অন্যত্র পালি ভাষায় লিখিত হয়েছিল, পরে কোনভাবে তা হেমিসে এসেছে। ফ্রাংকে সাহেব তাঁর Ladak the Mysterious Land গ্রন্থে নামজাল রাজবংশের রাজত্বের যে বর্ণনা করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর ঊর্ধ্বতন চার পুরুষ প্রত্যেকেই ৩০ বৎসর করে রাজত্ব করেছেন। সিংগে নামজাল ছিলেন পঞ্চম পুরুষ। এই পাঁচ পুরুষ ধরে প্রত্যেক রাজাই ঠিক ৩০ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন,—এক বৎসরও কম বা বেশি নয়, পৃথিবীর রাজবংশগুলির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায় না। ঠিক ৩০ বৎসর ধরে রাজত্ব করে প্রত্যেক শাসক হয় মারা গেছেন, নয়ত রাজবংশের নিয়মানুযায়ী সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছেন—যে দুটো একেবারেই কষ্টকল্পনা! ফ্রাংকে সাহেব এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দেননি। সুতরাং তাঁর সংগৃহীত তথ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। যে structure-কে কেন্দ্র করে বিতর্কের এই অংশ, সেই হেমিসের বয়স তার স্থাপত্যে-তোরণে-দরজায়-জানালাতে, যাকে আমরা ইতিহাসের ভাষায় পাথুরে প্রমাণ বলি, ধরা পড়বে। আমি স্বয়ং হেমিসের ভিতর-বাহির গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি তাতে চর্মচক্ষে হেমিসের নির্মাণ ৩০০ বৎসরের অনেক বেশি বলেই ধারণা হয়েছে। অতি বার্ধক্য হেমিসের সারা অঙ্গে। সাধারণত এক হাজার বছরের প্রাচীন না হলে এ ধরনের স্থাপত্যকে বৃদ্ধ বলা হয় না। এমন হতে পারে যে, সিংগে নামজাল গোম্ফাটি আমূল সংস্কার করেছিলেন বা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, সেটাই গৌরবে তিনি নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রচারিত হয়েছে। একথা যদি সত্য হয় যে, ঐ গোম্ফায় ঈশা এসেছিলেন, তাহলে সিংগে নামজালের রাজত্বকালে তার কি প্রকার বার্ধক্য ঘটবে সহজেই অনুমেয়। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে খুব সহজেই এই বিতর্কের মীমাংসা করা যেতে পারে। সুতরাং হেমিসে যে মাত্র ৩০০ শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়েছে, ফ্রাংকে সাহেবের এই বক্তব্য ও দাবি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না আপাতত।

দুই: নটোভিচের হেমিস ভ্রমণের মাত্র ১৮ বৎসর পরেই ফ্রাংকে সাহেব হেমিসে গেছলেন—এ কথা তাঁর লেখাতে পাচ্ছি। এ যদি সত্যে হয়, তাহলে তিনি এ বিষয়ে কেন অনুসন্ধান করলেন না যে, নটোভিচ হেমিস থেকে যীশুর

জীবনী বলে যে বিবরণ লিখে নিয়ে গেছেন তা সত্য কিনা। এমন হতে পারে, যখন তিনি হেমিসে এসেছিলেন, তখন তাঁর জানা ছিল না নটোভিচের এই জালিয়াতির কথা। যদি তাই হয়, যখন জেনেছিলেন তখনই হিমিসে ফিরে গিয়ে লামা মহারাজদের জবানবন্দি নিলেন না কেন? আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ফ্রাঙ্কে সাহেব নটোভিচের বক্তব্যকে জালিয়াতি বলেছেন,—মিথ্যা বলেননি। এতে তিনি পুঁথির অস্তিত্ব প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচেছন। অস্তিত্বহীন বিষয় বা বিষয়বস্তু থেকে জালিয়াতি করা যায় না। তবুও এই পুঁথির অস্তিত্ব কিম্বা অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি থাকা উচিত ছিল। সুতরাং বিতর্কের এই অংশও ফ্রাংক সাহেবের অনুকূলে যায় না।

তিন: নটোভিচ পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে এই ভয়ংকর কাণ্ডটি বাধিয়ে দিলেন যে পুঁথির প্রসংগ তুলে, সেই পুঁথিটি হেমিসে রক্ষিত ছিল কিনা, এ বিষয়ে ফ্রাংক সাহেব একেবারে নীরব। তিনি যখন নটোভিচের ভ্রমণের মাত্র ১৮ বৎসর পরে হেমিসে গেছলেন, তখন অনায়াসেই সেই পুঁথি দেখতে ও পরীক্ষা করতে পারতেন। কারণ তার কয়েক বৎসর পরেই বিখ্যাত ভারতীয় পর্যটক স্বামী অভেদানন্দ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরের মহারাজের অতিথি হয়ে হেমিসে গিয়ে ঐ বিতর্কিত পুঁথি দেখে এসেছিলেন। যদি নটোভিচের বিবরণ জালিয়াতিপূর্ণ হয়, তাহলে স্বামী অভেদানন্দের বিবরণও জালিয়াতিপূর্ণ হতে বাধ্য। আমি শ্রীমতী জেনেট হাল্টনকে স্বামী অভেদানন্দজীর অনুরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা লিখেছিলাম; কিন্তু তিনিও এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করেননি। সুতরাং নটোভিচ বা অভেদানন্দজীর বিবরণ জালিয়াতিপূর্ণ হতে গেলে ঐ বিতর্কিত পুঁথিটির অন্তর্গত লেখাকে অন্যথা হতে হবে। তাই নটোভিচের বিবরণকে জালিয়াতি বলে উড়িয়ে দিতে গেলে পুঁথিসহ পুঁথির অন্তর্গত যীশুর জীবনী-বৃত্তান্ত বলে লেখাকে কাল্পনিক ও অসত্য বলে আগে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর কোন প্রকার আলোকপাত করা হয়নি। সুতরাং এই issue-টির নিষ্পত্তিও ফ্রাংক সাহেবের অনুকূলে যায় না।

প্রমাণের কথা ছাড়াও motive-এর কথা ধরা যেতে পারে। নটোভিচ বা স্বামী অভেদানন্দজীর এরূপ মিথ্যা বিবরণ দিয়ে পৃথিবীতে মিথ্যাবাদী বলে চিরস্বাক্ষর রাখবার পেছনে তাঁদের কি উদ্দেশ্য ছিল? যদি ধরেও নিই রাশিয়া-বাসী নটোভিচের ইংলন্ডের প্রতি রাষ্ট্রনৈতিক বিরুদ্ধাচরণের কারণে এই মতিচ্ছন্ন ধরেছিল; কিন্তু ভারতীয় পর্যটক স্বামী অভেদানন্দজীর কি গাত্রদাহ হচ্ছিল যে, এরূপ মিথ্যা প্রচার করে পৃথিবীকে বিভ্রান্ত না করে উপায় ছিল না? এ ছাড়াও উভয় পর্যটকই লিখে গেছেন যে, পালিভাষায় লেখা মূল পুঁথিটি তিব্বতে লাসায় পোটালা প্রাসাদের কাছে মরবুর মঠে রক্ষিত আছে। এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই কেন ফ্রাঙ্কে সাহেব করলেন না,—তিনি একাধিকবার তিব্বতে যাওয়া সত্ত্বেও? নটোভিচ ও অভেদানন্দজী চাক্ষুষ দেখে লিখেছেন যে ঐ পুঁথি ছিল; আর

ফ্রাংক সাহেব না দেখেই লিখে গেছেন যে ঐ পুঁথি ছিল না, বা তাঁরা জালিয়াতি করেছেন। সত্যের কাছাকাছি কোন্‌টি, কে বা কারা ? সুতরাং নটোভিচ পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য ঐরূপ জালিয়াতি করেছেন তা প্রমাণ হয় না।

চার : এ নিয়ে ঐ সময় প্রচুর যে সমস্ত লেখালেখি হয়েছিল বলে তিনি দাবি করেছেন, তার কোন প্রসংগ ফ্রাংক সাহেব দেননি। ঠিক কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর লেখালেখি হয়েছিল এবং কার কার দ্বারা কিভাবে তা জালিয়াতি বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার সতথ্য ও সবিস্তার উল্লেখ থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। কেবল লেখালেখি হলেই একটা সত্য মিথ্যা বা মিথ্যা সত্য হয়ে যায় না, বা একের প্রত্যক্ষ দর্শন মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। সুতরাং ঠিক এই মুহূর্তে এই issue-টিও ফ্রাংক সাহেবকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারছে না।

পাঁচ : এক থেকে চার নাগাদ বিতর্কের সমাধানে নটোভিচের লেখা জালিয়াতি বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। অধিকন্তু তাঁর লেখা বিবরণের আরও এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আছেন যিনি মিথ্যাবাদী একথা বলা সম্ভব নয়, তিনি হচ্ছেন ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের একজন প্রবাদপুরুষ ও পর্যটক স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ; যাঁর রচনা এবং পাণ্ডিত্য ফ্রাংক সাহেবের চেয়ে কিছুমাত্র কম না। নটোভিচ ও স্বামী অভেদানন্দের লেখাকে জালিয়াতি বলে প্রমাণ করতে গেলে ফ্রাংক সাহেবকে (যদি তিনি আজও জীবিত থাকেন) বা তার সমর্থকদের নিচের যে কোন একটি অবস্থাকে প্রমাণ করতে হবে—

(ক) হেমিসের বয়স ৩০০ বৎসরের বেশি নয, এবং অনুরূপ কোন প্রাচীন পুঁথিও হেমিসে কোনদিন ছিল না।

(খ) হেমিসের বয়স ৩০০ বৎসরের বেশি : কিন্তু অনুরূপ কোন পুঁথি হেমিসে কোনদিন ছিল না।

(গ) হেমিসের বয়স ৩০০ বৎসরের বেশি, সেখানে অনুরূপ পুঁথিও ছিল ; কিন্তু তাতে ঈশার জীবনী বলে কিছু লেখা ছিল না।

(ঘ) হেমিসের বয়স ৩০০ বৎসরের বেশি, অনুরূপ প্রাচীন পুঁথি ছিল, তাতে ঈশার জীবনীও লেখা ছিল ; কিন্তু তাঁর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত থাকেনি।

(ঙ) হেমিসের বয়স ৩০০ বৎসরের বেশি, ঐরূপ পুঁথির অস্তিত্ব ছিল, এবং ঈশার ভারত ভ্রমণও লেখা ছিল ; কিন্তু পুঁথির বয়স ৩০০ বৎসরের বেশি নয় (এ রকম ব্যাপার হলেও সিদ্ধান্ত পরিব্রাজকদের প্রতিকূলে এবং ফ্রাংক সাহেবের অনুকূলেই যাবে)।

এঁদের লেখাকে (নটোভিচের লেখা জাল হলে প্রাসংগিকভাবে স্বামী অভেদানন্দজীর লেখাও জালিয়াতিপূর্ণ বলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে) জালিয়াতি-প্রসূত বলে সিদ্ধান্ত দেবার আগে ফ্রাঙ্কে সাহেবের বা তাঁর সমর্থকদের উপরি-উক্ত অবস্থার যে-কোন একটিকে প্রমাণ করতে হবে। যতক্ষণ না তা প্রমাণিত হয়,

এই issue-টিও ফ্রাঙ্কে সাহেবের বিপক্ষে যায়।

যীশু ছিলেন প্রেমের অবতার। প্রেম তো জাতি, ধর্ম, বর্ণ মানে না,—মানে না কোন রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডি। অবতার যীশু যদি তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে ভারতের মাটিকে ধন্য করেই থাকেন, তাকে চাপা দেবার চেষ্টা হবে কেন? সকল অবতারই স্থান ও কালের গণ্ডির বাইরে। যদি এ সত্য হয় যে, অবতার যীশু ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁর অজ্ঞাত জীবনের ষোলটি বৎসর এখানে কাটিয়েছিলেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হবার পর তিনি কাশ্মীরে এসে সেখানেই দেহরক্ষা করেছিলেন, তাহলে ভারতবর্ষ সেই গৌরব থেকে কেন বঞ্চিত হবে? অবতার তো কোন দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত বা গোপন সম্পত্তি নয়। আমি এজন্য সমস্ত প্রেমিক ভারতবাসীকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবি তুলতে আহ্বান জানাচ্ছি যে, এই বিতর্কের অবসানের প্রয়োজনে মাননীয় ভারত সরকার এগিয়ে আসুন। ঐ বিতর্কিত পুঁথি বর্তমানে যেখানে আছে (শুনেছিলাম ১৯৬২ সালে রক্তমুখী ড্রাগনের লাদাক্ আক্রমণের সময় ভারত সরকার হেমিস থেকে উক্ত পুঁথি-সহ অন্যান্য পুঁথি কোন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখেছিলেন), সেখান থেকে আনিয়ে নিয়ে রেডিও কার্বন পরীক্ষা দ্বারা সেটির বয়স নির্ণয় করে National Archives of India-র হেপাজতে জমা রাখুন; সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হেমিসেরও বয়স নির্ধারণ করুন এবং উভয় পরীক্ষার ফলাফল দেশবাসীর কাছে তথা জগতবাসীর কাছে প্রকাশ করুন। সেইসঙ্গে তিব্বতের মরবুর গোম্ফায় মিশন পাঠিয়ে ঐ পুঁথির পালি ভাষায় লেখা মূল কপির অস্তিত্ব বিষয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করা হোক, তবেই বিতর্কের যুক্তিপূর্ণ অবসান হবে। আর এ কাজ ভারত সরকারের কাছে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আজ নটোভিচ, স্বামী অভেদানন্দজী এবং ফ্রাঙ্কে সাহেব (সম্ভবত) কেউই জীবিত নেই। তাই সত্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব উত্তরসূরিদেরই নিতে হবে।

যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষার মূল বিষয় ছিল 'কর্মই ধর্ম', 'জীবে প্রেম', 'ঈশ্বরে বিশ্বাস'—এতো শ্রীকৃষ্ণেরই বাণী। সুতরাং তিনি যদি কৃষ্ণভক্ত হয়ে যীশু কৃষ্ণ থেকে যীশু খ্রীষ্ট তথা যেশাস ক্রাইষ্ট হয়ে থাকেন, তাতে আমি আপত্তিও করব না, আশ্চর্য ও হব না।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. The Unknown Life of Jesus Christ / Nicholas Notovitch / translated by J. H. Connelly and L. Landsberg / Nababharat Publishers, Calcutta 1981 / pp. 161-162.

২. কাশ্মীরে ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ / ব্রহ্মচারী ভৈরব চৈতন্য / শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ / পঞ্চম সংস্করণ / পৃ. ১৬৯ ১৭০

৩. ঐ পুস্তক, ভূমিকা পৃ. ১০-১১

৪. ঐ পুস্তক, পৃ. ৩৭-৩৮

৫. ঐ পুস্তক, পৃ. ১৭০

৬. কল্কি অবতার এবং মোহম্মদ সাহেব / ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় এম. এ. / সারস্বত বেদান্ত প্রকাশ সঙ্ঘ / প্রয়াগ। অনুবাদ : অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় / মাদ্রাসা পাবলিকেশন সেণ্টার / ৭৫ / ১১ মহাত্মা গান্ধী রোড / কলিকাতা-৭০০ ০০৯ / পৃ. ১২০-১২১ ('পুরাণে যিশুখৃষ্টের বর্ণনা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৭. ঐ পুস্তক, পৃ. ২৮ : ৯

৮. The Unknown Life of Jesus Christ / Nicvolas Notovitch / translated by J. H. Connelly and L. Landsberg / Nubabharat Publishers / Calcutta, 1981, pp. 76-77.

৯. Antiquities of India Tibet (Vol.) / A. H. Francke / Asian Educational Series / New Delhi / 1992 / p. 66

১০. Ladak the Mysterious Land (The History of 'Western Tibet) Cosmo Publications / New Delhi 1978 / pp. 99-100

উনবিংশ অধ্যায়

মুসলীম লীগের জন্ম ও পাকিস্তান প্রস্তাব

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে সতথ্য বর্ণনা করা হয়েছে, পৌরাণিক যুগ থেকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস। বর্ণনা করতে হয়েছে আজকের কাশ্মীর সমস্যার চরিত্র ও গতিপ্রকৃতি বোঝার সুবিধার জন্য। কিভাবে কাশ্মীর রাজ্য বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হয়েছে, ভুক্তিকরণ বৈধ কিংবা অবৈধ ইত্যাদি বুঝতে হলে কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করার একান্ত আবশ্যকতা আছে। কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সমস্যা আকারে কাশ্মীরের আত্মপ্রকাশ এবং তার ভারতভুক্তি একসূত্রে গ্রথিত।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা কোনদিন ভাবতে পারেননি যে, তাঁদেরই মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকামী এবং ভ্রান্ত তত্ত্বের এক শ্রেণীর উম্মাদ আছেন, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ধারাকে ভিন্নপথগামী করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবেন, যা তাঁদের ভবিষ্যত প্রজন্মদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি থেকে এযাবৎ একসঙ্গে এক লক্ষ্যে এক সাধনায় ব্রতী হয়ে ইংরেজ শাসকের ব্যাটন, বেয়নেট ও বুলেটকে অগ্রাহ্য করে তাঁদের সাধনার স্বপ্ন যখন সফল হবার মুখে, ঠিক তখনই ১৯40 খ্রীস্টাব্দের ২৪ মার্চ কুখ্যাত লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি, যা পরে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে প্রচারিত হয়। অবশ্য তার পূর্বে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দটি ছিল জাতির কাছে অপর একটি অশুভ বৎসর। কারণ ঐ বৎসর কোন এক কুলগ্নে ঢাকায় সৃষ্টি হয় ওই 'মুসলীম লীগ' নামের বিচ্ছিন্নতাকামী, ঈর্ষাকাতর, বিশ্বাসহন্তা ও সাম্প্রদায়িক দলটি, যাদের সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ তোষণ এবং হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতার মাধ্যমে মুসলীম লীগের স্বার্থরক্ষা। ওই সভায় উপস্থিত মহামতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের ভাষায় "...I was present at the sess on and remember the two reasons advanced for the establishment of the League. It was said that one of the objects of the League would be to strengthen and develop a feeling of loyalty to the British Government among the Muslims of India. The second object was to advance the claims of the Muslims against Hindus and other communities in respect of service under the crown

and thus safeguard Muslim interests and rights[১]..."

মুসলীম লীগের ওই লক্ষ্যের মধ্যে সর্বনাশের বীজ যে নিহিত আছে—এ সত্য বুঝতে কষ্ট হয়নি অসাম্প্রদায়িক দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক, —মৌলানা আবুল কালাম এবং সুভাষচন্দ্র বসুর। যেজন্য কংগ্রেসের মধ্য থেকে প্রথমজন এবং কংগ্রেস ও দেশের বাইরে থেকে দ্বিতীয় জন্য অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হক প্রথম দিকে যদিও মুসলীম লীগে যোগদান করেছিলেন, তিনি মুসলীম লীগের হিন্দু বিদ্বেষকে কোনদিনও সমর্থন করেননি। সেজন্য হক সাহেব সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের নীতিকে ভিত্তি করে এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সামনে রেখে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা কৃষক সমিতি' গঠন করেন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে এই সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে যে ইস্তাহার প্রচার করা হয়, তাতে (ক) ভারতে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা, (খ) মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষা করা, এবং (গ) মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়ে তোলার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়।[২]

হক সাহেবের গঠিত এই সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে মুসলীম লীগ হিন্দুতোষণের অত্যাশ্চর্য সূত্র আবিষ্কার করায় মুসলীম লীগ ক্রমশ হক-বিরোধী হয়ে ওঠে। জিন্নার মনস্তত্ত্ব ও দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে মৌলানা আজাদ এবং ফজলুল হক ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও যে প্রবল বিরোধিতা করে গেছেন, তাতে সন্দেহাতীত প্রমাণ হয় যে তাঁরা কি প্রকার সংস্কারমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। অথচ একই ধর্মাবলম্বী জিন্না ছিলেন এমন একটি ব্যক্তি যিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের মানুষ এক জাতি নয়। তাঁর ধারণায় গত বারশ বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভারত সকল সময়েই 'হিন্দু ভারত' ও 'মুসলিম ভারত' হিসাবে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে তারা ইংরেজদের বেয়নেটের ভয়ে কৃত্রিম ঐক্য বজায় রেখেছে, কিন্তু ভারত স্বাধীন হলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের পীড়ন করে হিন্দু রাজ্য কায়েম করবে।[৩] যেমন ইকবাল একটা ধারণা দেওয়ায় সেই ধারণাকে জিন্না বাস্তবে রূপায়িত করে একটা মিথ্যা বা ভুল তত্ত্বের পোষকার্থে কোটি কোটি মানুষের স্বার্থকে তথা একটি সুসভ্য প্রাচীন জাতির ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করেছেন, ঠিক তেমনই 'সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের পীড়ন করে হিন্দু রাজ্য কায়েম করবে' মুসলিম লীগের এই ধারণাকে যদি হিন্দু জাতি বাস্তবে রূপায়িত করতে যায়, সেক্ষেত্রে তারা যতখানি দোষী হবে, ততোধিক দোষী হবে মুসলীম লীগ ও তাদের এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই যে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের পীড়ন করে হিন্দু রাজত্ব কায়েম করবে—মুসলীম লীগের এ তত্ত্ব ভারতবর্ষে এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছে; কারণ স্বাধীনতার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হতে চলল এ চিন্তাধারা হিন্দুদের মনে এযাবৎ

স্থান পায়নি। এবং মুসলীম লীগ যদি ঐ তত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথগন্ন না হত, তাহলে আমার ধারণা, কোনদিনই এ ধরনের চিন্তাধারা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিত না। অথচ কি পরিতাপের কথা এই উম্মাদ ধারণার দ্বারাই তিনি তাঁর দ্বি-জাতিতত্ত্বকে ভারতের গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন ; যার ফলশ্রুতিতে ভারত পরবর্তীকালে বিভক্ত হয়েছিল। এর সুদূরপ্রসারী ফল যে আদৌ মঙ্গলজনক হবে না এ সত্য তখনই বুঝতে পেরেছিলেন মৌলানা আজাদ, ফজলুল হক, সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ—বুঝতে পারেননি মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং ভারত ভাগে সম্মতিদানকারী অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ।

ঐতিহাসিক রামগড় কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে মৌলানা আজাদ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন করে বলেছিলেন তাঁরা যেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলস্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করেন। এক স্বাধীন ও সুখী ভারত গড়ার জন্য তাঁরা যেন হিন্দুদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসংগে চলেন। তাঁর ভাষায়, "আমি একজন ভারতীয় হওয়ায় গর্বিত। আমি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অবিভাজ্য অংশ। আমি ভারতের এক অপরিহার্য অংশ এবং আমাকে বাদ দিয়ে এই দীপ্যমান ভারতভূমির গড়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি একটি একান্ত আবশ্যক উপাদান যা দিয়ে ভারতকে গঠন করা সম্ভব। আমি এ অধিকার কখনই পরিত্যাগ করতে পারি না।…"[৪]

কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য মুসলীম সম্প্রদায়েরও যে গোঁড়া, সাম্প্রদায়িক, এবং উদার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত তদানীন্তন মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশই মৌলানা সাহেবের ওই আবেদনের চেয়ে জিন্নার প্রচারিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের আবেদনকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে এইটুকু বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, জিন্না সাহেব দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষটির অঙ্কুরোদ্গম ঘটাননি ; তিনি চারাগাছ পেয়ে সেটিকে মহীরুহে পরিণত করেছিলেন। এ তত্ত্বের আসল স্রষ্টা কবি ইকবাল, এবং সমর্থনকারী ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ এবং কেম্ব্রিজ গ্রুপের চৌধুরী রহমত আলি, মহম্মদ আসলম খান (খাটক), শেখ মহম্মদ সাদিক (সাহিবজাদা), ও ইনায়েত উল্লা খান (চারছাদা), যাঁরা এই তত্ত্বটি জিন্নার মগজে ঢুকিয়ে দেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র মুসলীম রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে ইকবাল যে ভাষণ দেন, তাই কালক্রমে ভারতের রাজনীতিতে পাকিস্তান দাবিতে পরিণত হয়। ইকবালের ভাষণের কিছু অংশ, "…The principle of European democracy cannot be applied to India without recognising the fact of Communal groups. The Muslim demand for creation of a Muslim India is, therefore, perfectly justified…"[৫] তাঁর

সমগ্র ভাষণের মধ্যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রকাশ ও বিভেদের স্বচ্ছ ইঙ্গিত দেখা যায়। ইকবাল ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন প্যান-ইসলামিক মতবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক। সুতরাং তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যুক্ত করে চিন্তা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ইকবালের প্রদত্ত এই ভাষণের বক্তব্য পরিপূর্ণতা পায় তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ন্যাশনাল মুভমেন্টের সুপ্রীম কাউন্সিলের সভায়। ওই সভায় কেম্ব্রিজ গ্রুপ তরফে যে ভাষণ দেওয়া হয়, তাতে দাবি উত্থাপন করা হয় যে, মুসলীম জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিই দাবি করবে না, এমনকি হিন্দু অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্য সমূহে, যেখানে মুসলিম নৃপতিবৃন্দ আছেন, এবং আজমীড়ের মত মুসলিম তীর্থস্থান ইত্যাদি স্থানেও মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।[৬]

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ ভারতবাসীর কাছে তাই চরম অমঙ্গলকর দিন ছিল। ঐ দিন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত মুসলিম লীগ কনফারেন্স, যেখানে লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে ধারণার জনক ইকবাল, আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেম্ব্রিজে অধ্যয়নরত কতিপয় মুসলিম ছাত্র ইকবালের এই ধারণার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে 'পাকিস্তান ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট' নামে সংস্থাটি গঠন করেন এবং একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন যেখানে Pakistan শব্দটির প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। এই পুস্তিকায় PAKISTAN শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয় P অর্থে Punjab, A অর্থে Afghania (North-west Frontier Provinces), K অর্থে Kashmir, এবং I ও S অর্থে Sind and Beluchistan—এই পঞ্চ প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান, যার অর্থ হল পবিত্র মানুষের দেশ। এই Pakistan শব্দের বিশ্লেষণে লক্ষণীয় যে, পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ রূপে বের হয়ে গেলেও, Pakistan ঠিক থাকবে, কিন্তু Kashmir না যুক্ত হলে Pakistan থাকে না। সুতরাং Kashmir পাকিস্তানীদের চাই; এই মনস্তত্ত্ব-সহ কাশ্মীর আক্রমনের আরও গূহ্য কারণ তথা নেপথ্য কাহিনী ক্রমশ প্রকাশ্য।

বাংলায় দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ফজলুল হক মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর জোর আঘাত হানার চেষ্টা করেন। তিনি মুসলিমলীগের উক্ত তত্ত্বের সমালোচনায় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২১ জুন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে যে পত্র লেখেন তার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ নেতারা প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেন: ফজলুল হক একটি মীরজাফর। তিনি মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন। তিনি মুসলমানদের শত্রু।[৮] সুতরাং কতিপয় সংস্কারমুক্ত, উন্নতচেতা, অসাম্প্রদায়িক মহাজন মুসলমানের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের অগ্রগতি স্তিমিত করা যায়নি, যার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ভারত ভাগ তথা লাহোর প্রস্তাবের সফল রূপায়ণ।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. India Wins Freedom / Maulana Abul Kalam Azad / Orient Longman / 1989 / p 117

২. পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক / অমলেন্দু দে / রত্না প্রকাশন / ১৯৭২ / পৃ ১৫

৩. ঐ পুস্তক / পৃ ৪৭

৪. ঐ পুস্তক / পৃ ৫৩

৫. ঐ পুস্তক / পৃ ৭১

৬. ঐ পুস্তক / পৃ ৮৪

৭. ঐ পুস্তক / পৃ ১০৬

৮. ঐ পুস্তক / ১২৯

বিংশ অধ্যায়

ভারত ভাগে বৃটিশের, লীগের ও কংগ্রেসের ভূমিকা

বাজিকর ইংরেজ প্রভু সুতায় বাঁধা কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দকে কিরকম নাচিয়েছিলেন তার নেপথ্য কাহিনী খুব কম সাধারণ মানুষই জানেন। উভয় দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরই তখন ঘোর সম্মোহিত অবস্থা, যেজন্য জন্ম-দায়িনী ভারতজননীর অংগচ্ছেদের প্রস্তাবে তাঁরা অনুমোদন দিয়েছিলেন। আমি তো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যে এমন অপ্রতিরোধ্য পরিস্থিতি খুঁজে পাইনি যেখানে ভারত ভাগে সম্মতি প্রদান না করলে উপায় ছিল না। আমি ইতিহাসবেত্তাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি, এই অন্ধজনকে দয়া করে একটু আলোর নিশানা দিতে, যাতে করে আমার মনে হতে পারে সত্যিই ভারত ভাগে অনুমোদন না দিলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যেত? ভারত ভাগের পর বিগতপ্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ বৈষয়িক, সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্ত-র্জাতিক স্তরে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই যে ক্ষতি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, এর চেয়েও কি বেশি ক্ষতি হয়ে যেত, তখন যদি ভারত ভাগে উভয়পক্ষ সম্মত না হত? ইংরেজের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিলে তথা ভারত ভাগে সম্মত না হলে সম্ভাব্য কি ক্ষতি হত এবং ভাগ হয়ে যাবার পর কি ক্ষতি হয়েছে, তার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। অবশ্য এই বিশ্লেষণকালীন আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারত ভাগের অন্যতম প্রধান কারণ মুসলীম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা। তাঁদের এই মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী:

১। মুসলমানেরা একটি পৃথক জাতি,

২। এই জাতির ধর্মীয় মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান তথা ইস্লামিক কালচারের সংরক্ষণ ও বিবর্ধন প্রয়োজন,

৩। এইরূপ সংরক্ষণ ও বিবর্ধন অখণ্ড ভারতে সম্ভব নয়,

৪। কারণ, ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ইংরেজশাসনমুক্ত হলেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাবে। সুতরাং সংরক্ষণ ও বিবর্ধন তো দূরে থাকুক 'মুসলমান জাতি' হিসাবে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে।

এইরূপ ভ্রান্ত অথবা অভিসন্ধিমূলক তত্ত্ব যারা প্রচার করলেন এবং যারা তা মেনে নিলেন, তারা কি কেউই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না? যারা পৃথগন্ন হতে চাইলেন, তাদের এই মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি ছিল যে,—

(ক) দেশটি হিন্দুদের,

(খ) সহস্রাধিক বৎসর মুসলমান শাসনে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে,

(গ) তৎকালে শাসক সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী থাকায় হিন্দুরা সে

অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারেনি,

(ঘ) ইংরাজ আমলে হিন্দু ও মুসলমান সমভাবেই ইংরাজ শাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছিল, তাই 'সাধারণ স্বার্থে' উভয়ে মিত্রভাবে আন্দোলন করেছে,

(ঙ) অখণ্ড স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাধারণ স্বার্থের অবলুপ্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের ইস্লামিক কালচারের অবশ্যম্ভাবী বিপদ।

দেশকে উল্লিখিত কারণে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে হবে, এ বুদ্ধি গজায়নি মধ্যযুগের কোন অহিন্দু শাসকেরই ; গজায়নি, তাঁর কারণ তাঁরা এদেশকে তাঁদের নিজেদের দেশ এবং এই দেশের অন্তর্গত সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদেরই মিলিতভাবে মনে করা হত 'একজাতি',—সে জাতির নাম ভারতীয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য ঐ যুক্তির পোষকার্থে এই 'একজাতি' তত্ত্ব মানতে রাজি নয় মুসলীম লীগ। তাদের মুসলমান জাতির জন্য চাই পৃথক রাষ্ট্র—সে রাষ্ট্রের নাম হবে 'পাকিস্তান' অর্থাৎ 'পবিত্র মানুষের দেশ।' তাই তারা তাদের 'জাতির' মঙ্গলের জন্য ইংরেজ প্রভুর উস্কানি ও মদতে এবং কংগ্রেসের অদূরদর্শিতায় (১৪।৬।৪৭ তারিখে কংগ্রেসের সাধারণ সভায় ভারত ভাগের পক্ষে ২৯ জন অদূরদর্শী নেতা ভোট প্রদান করেন। মাত্র ২৯ জনের ইচ্ছায় ৪০ কোটি হিন্দু মুসলমানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল!) ভারত ভাগ করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অপার মঙ্গল সাধন করলেন ; যে মঙ্গলের ঠেলায় বিগত ৪৮ বৎসর ধরে উভয় দেশের (বর্তমানে তিনটি) প্রায় ১২০ কোটি মানুষ মর্মযন্ত্রণার তুষানলে দগ্ধ হয়ে মরছে এবং আরও কতকাল,—কতযুগ তাদের এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তা একমাত্র ঈশ্বর/আল্লাই জানেন!

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। অর্থাৎ ভারত ভাগে নেতারা রাজি না হলে কি ক্ষতি হত, আর ভারত ভাগ করায় কি ক্ষতি হয়েছে [আমার বিবেচনায় ভারত ভাগ হয়ে ভাগজনিত উপকার কণামাত্র হয়নি, তাই ভারত ভাগের ইতিবাচক দিক বিবেচনার কোনও প্রয়োজন দেখি না। যদি কোনও সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক নেতা কিম্বা ইতিহাসবেত্তা প্রমাণ করে দেখাতে পারেন তবেই আমি মেনে নেব, ততক্ষণ আমি স্বীকার করব না, ভাগজনিত অতিরিক্ত কল্যাণ উভয়দেশের কণামাত্র হয়েছে], তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

ভারত ভাগ না হলে যে ক্ষতি হতে পারত

১। লীগ নেতাদের উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। [কিন্তু ওই সম্ভাব্য দাঙ্গা মাত্র ততদিনই চলত, যতদিন না লীগ নেতৃত্বের উপলব্ধি হত যে, দাঙ্গায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়েরই জীবন ও সম্পত্তির

ক্ষতি বেশি হয়ে যাবে। জীবন ও সম্পত্তি হানির এই সম্ভাব্য ক্ষতি ভারত ভাগের পরবর্তীকালীন জাতিদাঙ্গায়, উভয়দেশের নাগরিকদের সম্পত্তির ক্ষতিতে এবং ভারত-পাক তিনটি যুদ্ধের সম্মিলিত ক্ষতির চেয়ে কম হত বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস]।

২। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিলম্বিত হত [কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ভারতবাসীর সকল সম্প্রদায়ের মিলিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ অনতিবিলম্বে অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হত]; ততদিন ভারত থেকে সম্পদের স্থানান্তর ঘটত এবং রাজদ্রোহের অপরাধে আরও কিছু প্রাণ বলি যেত।

ভারত ভাগ হওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে

১। মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায় যে ভারতের একটি অবিভাজ্য জাতি এবং ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির তারা অংশীদার,—এই উপলব্ধির গর্ব থেকে যেমন পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী মুসলমানেরা বঞ্চিত হয়েছে, তেমনই ভারতীয় মুসলমানদের ঐ গর্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থেকে যাচ্ছে।

২। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে অবস্থানকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও অমর্যাদা-সহ হিন্দু সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটানো হচ্ছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালের ঘটনার একটি মর্মন্তুদ বিবরণ : কিছু ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিকর্তৃক অযোধ্যায় বিতর্কিত সৌধ ভাঙার প্রতিশোধে বাংলাদেশে হিন্দুজাতি ও সংস্কৃতির উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, তা সেখানকার আমার এক স্নেহভাজন নাগরিকের প্রদত্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তুলে দিচ্ছি (সংগত কারণে আমি তার নাম প্রকাশ করছি না) : "…তন্মধ্যে গত ডিসেম্বরে ঘটে গেল এক তাণ্ডবলীলা। এতে সারা ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হলো, আর হবেই না বা কেন ? কারো ধর্মের প্রতি এভাবে হস্তক্ষেপ করা কোন মানবীয় গুণাবলীর লক্ষণগুলির মধ্যে পড়ে না বরং নারকীয় পদ্ধতিতে এই কাজ সমাধা হলো। একমাত্র ভারত সরকারের নমনীয়তার জন্যই এই ন্যক্কারজনক কাজ হয়েছে—এর জন্য আমি বিশেষ ভাবে অনুতপ্ত। আর অনুতপ্ত হলেই বা কি হবে এদিকে বাংলাদেশের জালাখাতে ইসলামী এক মৌলবাদী সংগঠন তথা কিছু সুযোগসন্ধানী লোক আছে তাদের দ্বারা বাংলাদেশের যে সংখ্যালঘু হিন্দু আছে এদের ধর্মস্থান মন্দির তো দূরের কথা, এরা লুণ্ঠন করেছে কয়েকলক্ষ হিন্দুর ধনসম্পদ। এছাড়া একমাত্র 'ভোলা' নামক স্থানে ৫০,০০০ লোক এখনও আকাশের তলে মাথা গুঁজেছে তাদের ঘর বাড়ী তথা গরু বাছুর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার জিনিস তো দূরের কথা, এইতো গত সংসদ অধিবেশনের গণনা অনুসারে পত্রিকায় উঠেছে ২০,০০০ মন্দির ধ্বংস এবং ৩ হাজার নারী ধর্ষিতা হয়েছে।

আর ৫০০ কোটি টাকার মালামাল ধ্বংস সহ ছাই হয়েছে। এই দৃশ্য চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। কলেজ ছাত্রী রিতা দাশ তার বাবুর জন্য সারাদিন হাত পেতে একটা কলা এনে দেয়। শম্পারাণী বেতের ঝোপে ১২ দিন থেকে বের হয় জীবন রক্ষার্থে, মান রক্ষার্থে। তাই বেশী লেখা ধৈর্য বাঁধ মানে না। আমাদের শুধু বেঁচে থাকার অধিকার আছে কিন্তু বড়লোক বা মুখতুলে কথা বলার মত স্বাধীনতা নেই···।" চিঠির তারিখ ২০।১।৯৩। ভারত ভাগ হয়ে ধর্মীয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের কি হাল হচ্ছে ঐ বর্ণনাতে সুধী পাঠকমণ্ডলীর অনুমান করতে অসুবিধা হবে না। একটা বিতর্কিত সৌধ কিছু ধর্মীয় উম্মাদ ভেঙে দেওয়ায় যারা বাংলাদেশে ঐ তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, সেই কৃতঘ্নরা কণা মাত্র মনে রাখা প্রয়োজন বোধ করে না যে, ভারতেরই সাহায্যে তারা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক বলে পৃথিবীতে পরিচিত হচ্ছে ; নতুবা তা সম্ভব হত না।

৩। রাষ্ট্রনৈতিক বিভাজনের জন্য সামরিক শক্তিরও বিভাজন হয়েছে।

৪। ঐ একই কারণে অর্থনৈতিক শক্তির অপরিপূর্ণতা সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

৫। ঈর্ষা ও ভ্রান্তনীতি সঞ্জাত দ্বি-জাতিতত্ত্বের ফলে উভয়দেশ পরস্পরের প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন থাকছে।

৬। পঞ্চম দফার কারণে সামরিক খাতে অতিরিক্ত ব্যয়জনিত অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

৭। কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ; যাকে কেন্দ্র করে তিনটি যুদ্ধ ইতি-মধ্যেই হয়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে আরও বড় রকমের যুদ্ধে, এমনকি পারমাণবিক যুদ্ধে উভয়দেশের জড়িয়ে পড়ার খুব বেশি সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

৮। পাকিস্তানের এই ঈর্ষাকাতর, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মৌলবাদী মনস্তত্ত্বপ্রসূত ভারত-পাক পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে মোড়ল দেশগুলি উভয়েরই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে চলেছে।

৯। বেলুচিস্তান থেকে ব্রহ্ম সীমান্ত এবং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী নিয়ে গঠিত (যে ভারত সাম্রাজ্য অতীতে বহু সময় ধরেই ছিল) সুবিশাল এক রাষ্ট্রের অখণ্ড শক্তি ও ঐশ্বর্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহসৃষ্টির সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছে।

উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ মতে বর্তমান প্রজন্মের ভারতবাসীরা যখন বুঝতে পারবে ভারত ভাগ করে তৎকালীন নেতৃত্ব কি ভুল করেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসবে না, উল্টে সৃষ্টি হবে ক্ষোভ, রাগ, দুঃখ ও তাঁদের প্রতি ঘৃণা। যাহোক, ভারত ভাগ প্রস্তাব অনুমোদন অবশ্য সহজে হয়নি। বিশেষত কংগ্রেসের কতিপয় নেতার তরফে এ বিষয়ে বরাবর প্রবল বিরোধিতাই করা হয়েছে ; কিন্তু সেই অনমনীয় মনোভাব তাঁরা শেষপর্যন্ত ধরে রেখেও সংখ্যালঘিষ্ঠের কারণে ভারত ভাগ আটকাতে পারেননি তথা মুসলীম

লীগের কাছে সমগ্র কংগ্রেসেরই চরম নৈতিক পরাজয় ঘটেছিল। কিভাবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দরূপ পুতুলগুলিকে ভারত রঙ্গমঞ্চে নাচাবার জন্য দক্ষ বাজিকরের ভূমিকা বৃটিশ সরকার গ্রহণ করেছিল, এবং নেতারাই বা কিভাবে নেচেছিলেন, তার সতথ্য বিস্তৃত বিবরণ আমি এবার প্রদান করছি। সমগ্র বিষয়টিকে তিনটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপন করছি: (ক) বৃটিশের ভূমিকা, (খ) লীগের ভূমিকা এবং (গ) কংগ্রেসের ভূমিকা।

ভারত ভাগে বৃটিশের ভূমিকা

'বৃটিশ পলিসি' শব্দটার সঙ্গে পরিচয় নেই, এমন ভারতবাসী সে যুগে ছিল না। বৃটিশ কর্তৃক মানুষের মনের কথা বুঝবার ক্ষমতাই তাঁদের ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করেছিল। নতুবা কয়েকজন অসামরিক ইংরেজ ব্যক্তি জাহাজে চড়ে বাণিজ্য করতে এসে প্রায় চল্লিশকোটি জনসংখ্যার একটি সুবিশাল সুসভ্য দেশকে অধিকার করে দীর্ঘ প্রায় দুশো বৎসর পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে রাখতে পারত না। তাদের সেই ভেদবুদ্ধির কূটনীতি ও দূরদর্শিতার চিরস্থায়ী স্বাক্ষর তারা দেশ ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্তেও রেখে যেতে ভুলেনি,—ভারত ভাগ করে দিয়ে।

সুচতুর ইংরেজ ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে নেতৃবৃন্দের ও জনগণের মনস্তত্ব পর্যবেক্ষণ করে চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাতেই কূটকৌশলী ইংরেজ বুঝে নিয়েছিল যে, এদের দাবিকে বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, কিন্তু যদি এই সুবিশাল দেশ ভারতবর্ষকে অদূর ভবিষ্যতে অখণ্ড স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তাহলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৃটিশের স্বার্থ প্রচণ্ড নাড়া খাবে; এমনকি যদি একই আন্তর্জাতিক সীমানা সম্বলিত সোভিয়েত ও চীনের সঙ্গে ভারতের ভালমতো সমঝোতা হয় বা থাকে তাহলে ইউরোপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে যে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলেছে, সেতো নষ্ট হবেই; চাই কি রাশিয়া ও চীনের প্রভাবে অখণ্ড ভারত সাম্যবাদীর দেশ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষ এক অভিন্ন জাতি ও অখণ্ড দেশ হিসাবে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, যাতে কম্যুনিস্ট দেশ হয়ে যেতে না পারে, সেজন্য তারা সুযোগের সন্ধানে ছিল। অবশেষে সে সুযোগ ইংরেজ পেয়েও গেল (কিম্বা তারা সৃষ্টি করে নিল), 'মুসলীম লীগ' নামক এক অন্ধ হিন্দুবিদ্বেষী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দলের মানসিকতার মধ্যে।

এ রহস্য-নাটকের সূত্রপাত হয় ঢাকায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই, যখন সম্ভবত স্যার উইলিয়াম হান্টার রচিত 'The Indian Musalmans' গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয় 'মুসলীম লীগ' নামে একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন, যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ওই পুস্তকে বিবৃত মুসলমানদের দুরবস্থা দূর করা তথা ইংরেজ প্রভুর প্রতি সভ্যদের আনুগত্য

বৃদ্ধি করা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে হিন্দুবিরোধিতা করে নিজসম্প্রদায়ের সুবিধা-সুযোগ করে দেওয়া।[১] মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সার্বভৌম পৃথক রাষ্ট্রগঠনের চিন্তা সম্ভবত তখনও তাদের মাথায় ঢোকেনি। সে চিন্তা লীগের মাথায় কি ভাবে ঢুকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণাটি পরিপক্বতা লাভ করেছিল, তা আমি 'ভারত ভাগে লীগের ভূমিকা'তে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। লীগের ঐ ধারণাটিকে কিভাবে কূটকৌশলী ইংরেজ কৌশলে ব্যবহার করে ভারত ভাগে সফল হয়েছিল, সেটাই এখানে বিশ্লেষণ করছি। তবে এখানে মনে রাখতে হবে, ভারত ভাগের পক্ষে শাসক ইংরেজ এবং বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলীম লীগ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে সহমত পোষণ করেছিল বলেই তারা অদূরদর্শী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে এত সহজে ভারত ভাগে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিল।

শাসক শ্রেণী হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করতে চেয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা থেকেই। তার অন্যতম প্রমাণ উল্লিখিত স্যার উইলিয়াম হান্টার রচিত সাম্প্রদায়িক বিভেদসৃষ্টিকারী ওই 'The Indian Musalmans' নামক গ্রন্থটি, যেখানে মিঃ হান্টার শাসক শ্রেণীর অযোগ্যতা ও অন্যায় ঢাকবার অপচেষ্টা করে মুসলমান সম্প্রদায়ের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবনতির জন্য সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদেরই দায়ী করেছেন। হান্টারের ওই পুস্তকে লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে (১৮৭১ খ্রীঃ প্রকাশিত) ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় 'মুসলীম লীগ' নামক গঠিত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের বক্তব্য হুবহু মিলে যাওয়া কখনই কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বিদ্বেষ প্রদর্শনের কোন কারণ ঘটেনি ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বর্ধিত হয়ে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চরম পরিণতি লাভ করে মুসলীম লীগের direct action-এর মধ্য দিয়ে। সুচতুর ইংরেজ মুসলমান সম্প্রদায়ের এই হিন্দুবিদ্বেষী মনস্তত্ত্ব কত নির্ভুল ও সম্পূর্ণভাবে ধরতে পেরেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ২৫.৩.৪৬ তারিখে হাউস অফ কমন্সের বিতর্ক সভায় ভারতে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের প্রাক্কালে মিঃ বাটলার প্রদত্ত ভাষণে। তাঁর ভাষণে তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "...First, anyone who has been living with the Indian problem for a long time must realise that the Misson will be brought sharply up against the main issue as to whether India is to be divided or not. In fact, the Mission will have ever before them the Muslim claim that the only way in which Muslim culture, civilisation and security can be assured is by the establishment of Pakistan..."[২]

যে-কোন ব্যক্তিই এই অংশটুকু থেকে বুঝতে অসুবিধাবোধ করবেন না যে,

হিন্দু-মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের গোপন সিদ্ধান্ত ইংরেজ সরকার বহু পূর্ব হতেই নিয়ে রেখেছিলেন। কেবল তাঁরা একটি অনুকূল পরিবেশ খুঁজছিলেন তার সফল রূপায়ণ করতে। সে সুযোগও তাঁদের করে দিয়েছিল মুসলিম লীগ অন্য একজন ইংরেজ লেখকের লেখায় প্রভাবিত হয়ে, যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রথমে গৃহীত যে ধারণা ধোঁয়ার আকারে ছিল, সেটিকে অনেকখানি বাস্তবে রূপ দিলেন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ আবদুল লাতিফ তাঁর 'The Cultural Future of India' (Bombay 1938) গ্রন্থে; যেখানে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, নিকটতম প্রতিবেশী হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানদের একসঙ্গে চলা সম্ভব নয়। তাই উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্নভিন্ন অঞ্চল চিহ্নিত করে এটি খিচুড়ী মার্কা সমাধান বাতলান। সেইসঙ্গে হিন্দু অঞ্চল ও মুসলমান অঞ্চলে পরস্পর লোকবিনিময়ের ব্যবস্থাপত্রও প্রদান করেন।[৩] সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের এই আলাদা ঘরকন্নার ইচ্ছার আভাস প্রভু ইংরেজ বহুপূর্বেই সম্যক অবগত থাকায় কমন্স সভার ওই বক্তৃতায় তার প্রতিফলন ঘটে।

কমন্স সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতবাসীদের বেদনা দূর করতে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে (করাচীতে, তখন করাচী ভারতে ছিল) এসে পেঁছায় ইং ২৩।৩।৪৬ তারিখে। মিশনের অন্যতম সভ্য ও ক্যাবিনেট মন্ত্রী মিঃ লরেন্স ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তাঁর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে ইং ২৭।৪।৪৬ তারিখে লিখিত পত্রে তিনি তাঁদের আলোচনার জন্য আহ্বান করেন। কি আলোচনার জন্য? না বৈদেশিক দফতর, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতকে হিন্দু ও মুসলমান প্রদেশে ভাগ করা হবে ইত্যাদি। তাঁর চিঠির ভাষায়,

"The future constitutional structure of British India to be as follows :

A Union Government dealing with the following subjects :

Foreign Affairs, Defence and Communications. There will be two groups of provinces, the one of the predominantly Hindu provinces and the other of the predominantly Muslim provinces, dealing with all other subjects which the provinces in the respective groups desire to be dealt with in common. The provincial governments will deal with all other subjects and will have all the residuary sovereign rights."[৪]

কি কথা! ভারতের জনগণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করছেন, তাঁদের নিজেদের দেশ তাঁরা কিভাবে শাসন করবেন, সে গাইডলাইনও কি ইংরেজ প্রভুকে

বলে দিতে হবে ? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বীজ সরকারীভাবে ভারতে এই প্রথম পোঁতা হল। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস সভাপতি মহামতি মৌলানা আজাদের নিকট থেকে তীব্র প্রতিবাদ গেল। তিনি তাঁর ২৮।৪ তারিখের উত্তরে ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে লিখলেন, "...We consider it wrong to form groups of provinces under the Federal Union and more so on religious or communal basis. It also appears that you leave no choice to a province in the matter of joining or not joining a group. It is by no means certain that a province as constituted would like to join any particular group. In any event it would be wholly wrong to compel a province to function against its own wish,"[৫] তিনি তাঁর ৬।৫ তারিখের পত্রে ইংরেজ সরকারকে আরও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন, "...We are emphatically of opinion that it is not open to the conference to entertain any suggestion for a division of India. If this is to come, it should come through the Constituent Assembly free from any influence of the present governing power."[৬] কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। যাঁরা ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছেন, যাঁদের হাতে মুসলিম লীগের ভারত ভাগে সম্মতিসূচক অব্যর্থ অস্ত্র আছে, তাঁরা এসব প্রতিবাদ গ্রাহ্যের মধ্যে আনবেন কেন ? এখানে এটুকু উল্লেখ না করে গেলে আমার বিশ্লেষণ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হওয়ার আশংকা থেকে যায় যে, হিন্দু মহাসভা সম্বন্ধে কিছু মানুষের সে সময়ে নাসিকা কুঞ্চন করতে দেখা গেছে, সেটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। যে সার্থক অর্থে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক ছিল, তার কণামাত্র আভাসও আমি হিন্দু মহাসভার তৎকালীন কার্যকলাপে পাইনি। ২৪।৪।৪৬ তারিখে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সংগে হিন্দু মহাসভা ক্যাবিনেট মিশনের কাছে যে স্মারকপত্র দিয়েছিল, তার কিছু অংশ সুধী পাঠকদের জন্য তুলে দিচ্ছি :

1. Declaration of Independence :

As all sovereignty in respect of India vests in the Indian people, it is the right of the Indians to be fully and completely free like all the free peoples in the world.

It is only absolutely unfettered freedom that will enable India to be a front-line nation in the world...

The Hindu Mahasabha, therefore, urges, that India should be fully free and independent, and that a declaration to that effect should be immediately made by the British Cabinet

through proper channel…

2. India's Integrity and Indivisibility :

Be the modes of living and worship of the Indian people what they may, there can be no doubt that geographically, historically, ethnologically, politically, and even culturally India is one, whole and indivisible, and it must remain so in future. This integrity and indivisibility must be maintained, whatever the cost and sacrifice be."[৭] যে সংগঠন এরূপ মুক্ত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে সমগ্র ভারতবর্ষকে এক এবং অবিভাজ্য বলে দাবিপত্র পেশ করেছিল, কেন যে তাদের প্রতি সাম্প্রদায়িকতার দুর্নাম রটানো হয়েছিল আমার বোধগম্য হয়নি। এমনকি কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা সাহেবের প্রতিবাদ পত্রেও এরূপ দৃঢ়তা দেখিনি, বরঞ্চ তা অস্বচ্ছ ছিল। যেখানে মুসলিম লীগ ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদের স্মারকপত্রে ক্যাবিনেট মিশনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সম্প্রদায়গত কোন বিভাজন নয়, সমগ্র ভারতবাসীদের অবিভাজ্য সত্তাস্বরূপ পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, সেখানে একমাত্র মুসলিম লীগের ১২।৫।৪৬ তারিখের প্রদত্ত স্মারকপত্রানুযায়ী হিন্দু-মুসলমান আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রদেশ তৈরির দাবিকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজ প্রভু ভাইসরয় এবং ক্যাবিনেট মিশন ১৬।৫।৪৬ তারিখে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন। আমি সুধী পাঠকমণ্ডলীর বিবেচনার জন্য ওই ঘোষণাপত্রের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দফার কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি :

"Statement by the Cabinet Delegation and the Viceroy, May 16, 1946.

* * *

4. It is not intended in this statement to review the Voluminous evidence that has been submitted to the Mission ; but it is right that we should state that it has shown an almost universal desire, outside the supporters of the Muslim League, for the Unity of India.

5. This consideration did not, however, deter us from examining closely and impartially the possibility of a partition of India ; since we were greatly impressed by the very genuine and acute anxiety of the Muslims lest they should find themselves subjected to a perpetual Hindu-majority rule.

This feeling has become so strong and widespread amongst the Muslims that it cannot be allayed by mere paper safe-

guards. If there is to be internal peace in India it must be secured by measures which will assure to the Muslims a control in all matters vital to their culture, religion, and economic or other interests.

We therefore examined in the first instance the question of a separate and fully independent sovereign State of Pakistan as claimed by the Muslim League...."[৮]

সুতরাং সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও লীগ কর্তৃক ইংরাজ তোষণের পুরস্কারের কথা এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের কথা ইংরেজ প্রতিভূরা মুহূর্তের জন্যও ভুলেননি। তাই সার্বভৌম পাকিস্তান গঠনের অসম্ভাব্যতার লোক-দেখানো অজুহাত খাড়া করে হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে ত্রি-স্তরে ভাগ করে সমাধানের পথ বাতলালেন, তথা ঐ ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দলিল মুসলিম লীগের হাতে তুলে দিলেন। ক্যাবিনেট মিশনের ঐ বিবৃতির অন্তর্নিহিত অর্থকে ফলবতী করার জন্য যাকে ভারতবর্ষে পরবর্তী বড়লাট করে পাঠানো হল, সেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন কি বিস্ময়কর দক্ষতায় মুসলিম লীগের স্বপ্নকে সফল করেছিলেন, এবং সেইসঙ্গে বৃটিশ সরকারের গোপন ইচ্ছার সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন, সেই অত্যাশ্চর্য নেপথ্য কাহিনীই এবার বর্ণনা করব।

বিলেতের ধূর্ত বৃটিশ সরকার যে অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না, তার ইঙ্গিত আমি ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে দিয়েছি। আর এ ধারণা তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি মহামতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মনেও ছিল। তাঁরই ভাষায়, "when I became aware that Lord Mountbatten was thinking in terms of dividing India and had persuaded Jawaharlal and Patel, I was deeply distressed. I realised that the country was moving towards a great danger. Partition of India would be harmful not only to Muslims but to the whole Country"[৯] একমাত্র যাঁর প্রজ্ঞা আছে, তিনিই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং সেই তিনি ছিলেন মহাত্মা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর আশংকা যে কতখানি সত্য ছিল তা বোঝা গেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন কংগ্রেসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই মর্মে যে, লীগকে কয়েকখণ্ড জমি ছেড়ে দিয়ে শক্তিশালী ভারত গঠন করতে। মৌলানা সাহেবের জবানীতে, "...Lord Mountbatten advised that it would be better to give up a few small pieces in the north-west and the north-east and then build up a strong and consolidated India..."[১০]

সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিলাতের মন্ত্রীসভা লর্ড

মাউন্টব্যাটেনকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভারত ভাগের অঙ্কুরিত চারাটিকে আচ্ছাদন দিয়ে মহীরুহে পরিণত করতে। সে কাজ তিনি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে যখন তাঁর কৃতিত্বের রিপোর্ট দেবার জন্য বিলাত পাড়ি দিলেন, তখন কংগ্রেস সভাপতির অনুরোধে যে ছলনা ও চাতুরীপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তার পরিণতি কি হয়েছিল, তা মৌলানা সাহেবের ভাষাতেই বলি, "...Lord Mountbatten gave me the impression that he was not going to London with a clear cut picture of partition nor had he given up the Cabinet Mission Plan completely. Later events made me change my estimate of the situation. The way he acted afterwards convinced me that he had already made up his mind and was going to London to persuade the British Cabinet to accept his plan of partition....The details of Lord Mountbatten's Plan were not yet published but I Knew that Lord Mountbatten had in view the partition of India ..In trying to explain why the Labour Government changed its attitude, I came to the painful conclusion that its action was governed more by consideration of British than Indian interests..."[১১] সুতরাং আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি শৃগালের চেয়েও ধূর্ত এবং শয়তানের চেয়েও কপটাচারী ইংরেজদের স্বরূপ যাঁরা চিনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন ব্যক্তি ছিলেন পুরোভাগে, সেই দুজন হচ্ছেন মহাত্মা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু; যাঁরা কোনদিন ইংরেজকে বিশ্বাস করেননি এবং দুজনেই অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে গেছেন,—একজন ভারতের মধ্যে থেকে, অন্যজন বাইরে থেকে।

ভারতকে খণ্ডিত করেও ধূর্ত ইংরেজ তৃপ্তি পায়নি, সেই খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতাও এমন একটি দিনে স্থির করা হয় (১৫ আগস্ট), যেটি ছিল জাপানের আত্মসমর্পণের দিন। যাতে অখণ্ড ভারত স্বাধীন হয়ে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তাকে ভাগ করা হল; তাও এমন একটি দিন স্থির হল, যার ফলে জাপানের সঙ্গে ভারতের দ্বিধাহীন ও বেদনাহীন মিত্রতা যেন কোনকালে গড়ে উঠতে না পারে। সেজন্যই এক জাতির পরাজয়ের দিনকে অন্য এক জাতির জয়ের ও আনন্দের দিন হিসাবে চিহ্নিত করতে মাউন্টব্যাটেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। কিন্তু তিনি নেহেরুকে রাজি করতে না পারায় সে ভার নেন তার স্ত্রী লেডি মাউন্টব্যাটেন, যিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে নেহেরুকে তুষ্ট করে তাঁকে রাজি করিয়েছিলেন ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে মেনে নিতে। কিন্তু জিন্না অধিকতর চতুর তাই, তার পূর্বদিন ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মদিন স্থির করেন। ভারতের দুর্ভাগ্য, ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য এহেন

মাউণ্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতেও বড়লাট হিসাবে রাখা হল চরম নির্বুদ্ধিতা দেখিয়ে, যার ফলে আজ এই অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।[১২]

ভারতভাগে মুসলিম লীগের ভূমিকা

ভারত ভাগে মুসলিম লীগের ভূমিকা পুরোপুরি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে বলা যায়। ইংরেজ পরোক্ষে এবং মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষভাবে দুই পৃথক স্বার্থে দুই পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে একই লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। মুসলিম লীগের দাবির পশ্চাতে মূল যে তত্ত্ব ছিল তার নামই দ্বিজাতিতত্ত্ব। মুসলমান এবং হিন্দু ভারতে দুই জাতি। মুসলমানদের ধর্মের ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিবর্ধন হিন্দু-প্রধান রাষ্ট্রে সম্ভব নয়, সেজন্য তাঁদের পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই,—এই দাবি ক্রমশ পরিপক্কতা লাভ করে ১৯৪০ সালে লাহোরে। লীগের ঐ সভায় সেই দাবি গৃহীত হয়, যা পরে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রচারিত হয়। ২২।৩।৪০ তারিখে লাহোরে সারাভারত মুসলিম লীগের ওই সভায় সভাপতি জিন্না যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি দাবি করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। উভয় ধর্মের পৃথক মহাকাব্য আছে। হিন্দুরা সাকারে এবং মুসলমান নিরাকারে বিশ্বাসী। সুতরাং এই দুই পৃথক জাতিকে অখণ্ড রাষ্ট্রে একত্রে থাকতে দিলে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে মুসলমানদের প্রতি অবিচার হবে। কারণ ইংরেজ বেয়নেটের সাহায্যে ভারতে কৃত্রিম ঐক্য বজায় রেখেছে, তারা চলে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান জাতির প্রতি অত্যাচার অনিবার্য। সুতরাং জিন্না আস্থা রাখেন যে, বৃটিশ সরকার এমন অবিমৃষ্যকারী কাজ করবেন না যাতে মুসলমানরা 'জাতি' হিসেবে নিজেদের বিপন্নবোধ করেন ইত্যাদি।[১৩]

এই প্রস্তাব ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেও এর সূচনা সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই তত্ত্ব প্রচার করেন।[১৪] এই ধারণা সঞ্চারিত হয় কবি ইকবাল, কেম্ব্রিজ গ্রুপের চৌধুরী রহমত আলি, মহম্মদ আসলাম খান, সেখ মহম্মদ সাদিক এবং ইনায়েত উল্লা খান সহ ডঃ সৈয়দ আবদুল লাতিফের মধ্যে, যাঁরা পরে এই তত্ত্বটি জিন্নার মগজে ঢুকিয়ে দেন।[১৫] ঐ ধারণার বশবর্তী হয়েই চৌধুরী রহমত আলি ২৮।১।৩৩ খ্রীস্টাব্দে 'Now or Never' নামে একটি পুস্তিকা কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশ করেন, যেখানে প্রথম PAKI-STAN শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যার P অর্থে Punjab, A অর্থে Afghania (North-west Frontier Province), K অর্থে Kashmir, I ও S অর্থে Sind এবং Baluchistan। আর, গোটা 'পাকিস্তান' শব্দের অর্থ 'পবিত্র মানুষের দেশ'। এই পুস্তিকাতে বলা হয়, এই পাঁচটি অঞ্চলে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁদের ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে ভারতের অন্যান্য অধিবাসী থেকে একটি পৃথক সত্তা আছে। তাদের পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র

মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করার সুযোগ দিতে হবে।[১৬]

এই ধারণাকে জিন্না সাহেব মনেপ্রাণে গ্রহণ করে মুসলিম লীগ নামক সাম্প্রদায়িক দলের মাধ্যমে তা বাস্তবে রূপায়িত করেন। জিন্নার এই ধর্মীয় স্পর্শকাতর আবেদনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় সাড়া দিতে দেরি করেননি। আর তাঁদের সেই সরল শিক্ষার আলোকহীন মনস্তত্বকে কাজে লাগিয়ে জিন্না, লিয়াকত আলী প্রমুখ কতিপয় ক্ষমতালিপ্সু নেতা ভারত ভাগ করে নিয়ে নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য যে বেহেস্তের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা যে ১৭।১২।৭১ তারিখের কালবৈশাখীর ঝড়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে তাঁর তত্ত্বকে পৃথিবীর কাছে উপহাস্যাস্পদ করবে এবং বৃটিশরা উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবে তাদের কূটনৈতিক চালের সাফল্য দেখে, তা বোধহয় বেচারা অপরিণামদর্শী জিন্না সাহেব স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

ভারত ভাগে কংগ্রেসের ভূমিকা

অনেক টালবাহানার পর কোয়ালিশন সরকার যখন গঠনের সিদ্ধান্ত পাকা হল, তখন, বোম্বাইতে ১০।৭।৪৬ তারিখে এক প্রেস কনফারেন্সে জহরলালকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিনিধি প্রেরণ সহ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা হুবহু গ্রহণ করেছে কিনা। এর উত্তরে জহরলালজী যে অবিমৃষ্যকারী উত্তর দেন, তা মৌলানা সাহেবের ভাষায় "...Jawaharlal in reply stated that Congress would enter the Constituent Assembly completely unfettered by agreements free to meet all situations as they arise...Press representatives further asked if this meant that the Cabinet Mission Plan could be modified. Jawaharlal replied emphatically that the Congress had agreed only to participate in the Constituent Assembly and regarded itself free to change or modify the Cabinet Mission Plan as it thought best"[১৭] তার ফল হল এই, ২৭।৭।৪৬ তারিখের লীগের সভায় ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct action) ঘোষণা করা হল, যার পরিণতি ১৬।৮।৪৬ তারিখে শুরু হল কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এই বিষয়ে মৌলানা সাহেবের খেদোক্তি তাঁর নিজেরই ভাষায়, "...This was one of the greatest tragedies of Indian history and I have to say with the deepest of regret that a large part of the responsibility for this development rests with Jawaharlal . His unfortunate statement that the Congress would be free to modify the Cabinet Mission Plan reopened the whole question of political and

communal settlement. Mr. Jinnah took full advantage of his mistake and withdrew from the League's early acceptance of the Cabinet Mission Plan"[১৮] এর পরেও যখন উভয়পক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করলেন, তখন কংগ্রেসের দ্বিতীয় বৃহৎ ভ্রান্তি ঘটল লীগকে অর্থ দপ্তর দেওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্যে। এমনিতেই অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল উভয় দলের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্যে; মুসলিম লীগকে অর্থ দফতর নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় সেটি অতিরিক্ত মাত্রা পেল। কংগ্রেস তরফে যা কিছু পরিকল্পনা করা হয়, এমনকি একটি পিয়নের নিয়োগ পর্যন্ত লীগের করুণা ভিক্ষা ছাড়া উপায় থাকে না। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারে কাজেকর্মে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে লাগল।

এইভাবে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্যে যখন অন্তর্বর্তী সরকার চলছিল, তখন জহরলাল-সখা মাউন্টব্যাটেন এলেন ভারতীয়দের কাছে দেবদূত হয়ে। যাঁর পরবর্তী কার্যক্রম এবং জহরলালের তা অনুমোদন শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও তাঁদের কীর্তিকে অক্ষয় করে রাখবে। মুসলিম লীগকে অর্থ দফতর দেওয়ায় উভয় দলের মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাকে ধূর্ত ইংরেজ মাউন্টব্যাটেন সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়েছিলেন। মৌলানা সাহেবের জবানীতে, "A truly pathetic situation had developed as a result of our own foolish action in giving Finance to the Muslim League. Lord Mountbatten took full advantage of the situation ...He also began to give a new turn to the political problem and tried to impress on both the Congress and the Muslim league the inevitability of Pakistan. He pleaded in favour of Pakistan and sowed the seeds of the idea in the minds of the Congress members of the Executive Council."[১৯] এর ওপর ছিল প্যাটেল ও কৃষ্ণ মেননের মুসলিম বিদ্বেষিতা। প্যাটেল সম্বন্ধে মৌলানা সাহেবের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "...When Lord Mountbatten suggested that partition might offer a solution to the present difficulty, he found ready acceptance to the idea in Sardar Patel's mind In fact, Sardar Patel was fifty percent in favour of partition even before Lord Mountbatten appeared on the scene. He was convinced that he could not work with the Muslim League He openly said that he was prepared to have a part of India if only he could get rid of the Muslim League. It would not perhaps be unfair to say that Vallabhbhai Patel was the founder of Indian Partition."[২০] তখনও পর্যন্ত কিন্তু জহরলালকে টলানো যায়নি।

অবশেষে ভারতভাগে রাজি করানোর সে গুরু দায়িত্ব তুলে নিলেন মাউন্টব্যাটেনের সুন্দরী স্ত্রী এডুইনা মাউন্টব্যাটেন, যিনি জহরলালকে ভারত ভাগে রাজি করিয়ে ইতিহাসে নিজস্ব স্থান করে নিলেন। মৌলানা সাহেবের চিন্তাধারা অনুসারে, "...I think one factor responsible for the change was the personality of Lady Mountbatten. She is not only extremely intelligent but has a most attractive and friendly temperament..."[২১] এ ধরণের চিন্তাধারা মৌলানা সাহেবের কেন হয়েছিল এবং তিনি 'has a most attractive and friendly temperament' বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা অনুমান করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এবং এই অনুমান সুধী পাঠকমণ্ডলী যে যার স্বাধীন চিন্তাধারা অনুসারে করে নিতে পারেন। নেহেরু-প্যাটেলকে এই বলেও তিনি সতর্ক করেন যে, ইতিহাস কংগ্রেসকে ক্ষমা করবে না, যদি তারা ভারত ভাগে রাজি হয়। তাঁরই ভাষায়,"... I warned Jawaharlal that history would never forgive us if we agreed to partition. The verdict would be that India was divided not by the Muslim League but by Congress."[২২] কিন্তু সবই বৃথা। শেষে তিনি ছুটলেন গান্ধীজীর কাছে। শেষ চেষ্টা। যদি পারেন তো একমাত্র 'জাতির জনক'ই পারবেন। গান্ধীজী সব শুনে বললেন যদি কংগ্রেস ভারত ভাগ করে, তাহলে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে করতে হবে। মৌলানা নিশ্চিন্ত। কিন্তু হায়, নেহেরু-প্যাটেলের বিরসবদন গান্ধীজীকেও টলিয়েছে। গান্ধীজীর মতের পরিবর্তন হয়েছে শুনে যখন তিনি গান্ধীজী সকাশে গেলেন, তখন তিনি ভারত ভাগের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। সব শেষ! বাকি রইল পার্টিশান। মৌলানা সাহেবের কথায় বলি, "...Gandhiji reminded me of this and said that the situation now was such that partition appeared inevitable. The only question to decide was what the form of partition should be..."[২৩]

সুধী পাঠকমণ্ডলী, আমি এই পুস্তকে একাধিকবার মন্তব্য করেছি যে, আমি এমন কোন পরিস্থিতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পাইনি, ভারত ভাগ না করে যাকে এড়ানো যেত না। আসল ঘটনা কি হয়ে চলেছিল,— জিন্না ও মাউন্টব্যাটেন ভারত ভাগের পক্ষে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে গেছেন, আর কংগ্রেস তাতে পতঙ্গের মত নিজেদের সঁপে দিয়েছেন; পরিস্থিতির বিরুদ্ধে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেননি। যেন ভারতখানা জিন্না, নেহেরু, প্যাটেলদের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাই পারিবারিক কলহ এড়াতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন! গান্ধীজী এখানে 'situation' বলতে বুঝিয়েছেন, আমার বিবেচনায়, একমাত্র 'মুসলিম লীগ কর্তৃক জাতি দাঙ্গা সৃষ্টি'র সম্ভাবনা; যে বেড়াল বুদ্ধিমান জিন্না বিয়ের রাত্রেই কেটেছিলেন। সেই গোদা পায়ের লাথির ভয় কেন অতগুলি

উর্বর মস্তিষ্কে ঢুকে পড়েছিল তা আমার মত অজ্ঞজনের মাথায় ঢোকেনি। তবে বৃহত্তর ক্ষতির (ভারত ভাগ জনিত) হাত থেকে রেহাই পেতে, সে ক্ষুদ্রতর ক্ষতি মেনে নিলেই ভারত ভাগ আটকানো যেত; যা আমি এই অধ্যায়ের গোড়ায় বলেছি ভারত ভাগে কংগ্রেস রাজি না হলে যে পরিস্থিতি ঘটত ব্যাখ্যায়। ঘটনার বিশ্লেষণ থেকে ভারত ভাগে কংগ্রেসের যে ভূমিকা বের হয়ে আসছে, তা হল সংক্ষেপে,—

(ক) ক্ষমতালাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন মুক্তকচ্ছ।

(খ) নেহেরুজী, যিনি চিন্তায় ও আচরণে যতটা ভারতীয়, তার চেয়ে বেশি ইংরেজ, তিনি মাউন্টব্যাটেন বিশেষত লেডী মাউন্টব্যাটেনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন।*

(গ) প্যাটেলের অন্ধ মুসলিম বিদ্বেষ, যেজন্য তিনি লীগকে এড়াতে চেয়েছিলেন।

(ঘ) প্রতি পদে জিন্নার কূটনৈতিক প্যাঁচে কংগ্রেসের ধরাশায়ী অবস্থা।

(ঙ) নেতাজীর মত ও পথকে অগ্রাহ্য করা।

সুতরাং প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে আজ সত্যিই খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা-কালীন কংগ্রেসের ভূমিকার তথা রণকৌশলের পুনর্মূল্যায়ন অতি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে; কারণ 'কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা এনেছে' (আমি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছি কংগ্রেস একক স্বাধীনতা আনেনি), এই প্রচারের আড়ালে রয়ে যাচ্ছে, 'কংগ্রেস ভারতকে ভাগ করেছে',—এই ততোধিক বাস্তব সত্য; যে সত্য স্বাধীন ভারতের প্রজন্মদের ইতিহাসের পাতায় শাসক কংগ্রেসের জমানায় এ পর্যন্ত লেখা সম্ভব হয়নি।

* এই সুন্দরী ইংরেজ মহিলা পণ্ডিত জহরলালকে ভারতভাগে এবং খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ১৫ আগস্ট দিনটিকে মেনে নিতে রাজি করিয়েছিলেন, সে বিবরণ আমি ভারতভাগে ইংরেজের ভূমিকায় দিয়েছি। এখানে আর একটি গুপ্তকথা এই যে,—যেহেতু জাপান ইংরেজের শত্রু এবং নেতাজী জহরলালের চক্ষুশূল, এবং যেহেতু ১৫ আগস্ট জাপানের আত্ম-সমর্পণের দিন এবং নেতাজী সেই জাপানের সাহায্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, ঠিক সে কারণেই ধূর্ত মাউন্টব্যাটেন এক ঢিলে দুই পাখি মারবার জন্য ১৫ আগস্টকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে স্মরণীয় করতে চেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. India Wins Freedom / Maulana Abul Kalam Azad / Orient Longman / Reprinted 1989 / P 117.

২. The Cabinet Mission in India / Anil Chandra Banerjee & Dakshina Ranjan Bose / A. Mukherjee & Co, Calcutta / First Edition 1946 / p 10.

৩. পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক / অমলেন্দু দে / রত্না প্রকাশন / প্রথম প্রকাশ ১৯৭২ / পৃ ৮৭ ৯০।

৪. The Cabinet Mission in India / Anil Chandra Banerjee & Dakshina Ranjan Bose / A. Mukherjee & Co., Calcutta / First Edition 1946 / p 44.

৫. ibid, p 46.

৬. ibid, p 53.

৭. ibid, pp 83-85.

৮. ibid, pp 91-93.

৯. India Wins Freedom / Maulana Abul Kalam Azad / Orient Longman / Reprinted 1989 / p 200.

১০. ibid, p 204.

১১. ibid, p 208.

১২. আনন্দবাজার পত্রিকা / ২১-৩-৯২ / পৃ ৪।

১৩. পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক / অমলেন্দু দে / রত্না প্রকাশন / প্রথম প্রকাশ ১৯৭২ / পৃ ৪৭ vide previous reference to Presidential Address delivered by Mr. Jinnah at All India Muslim league, Lahore / "Speeches and writings of Mr. Jinnah" / 6th Edition, Lahore, March 1960, Vol I / pp 143-163.

১৪. পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক / অমলেন্দু দে / রত্না প্রকাশন / প্রথম প্রকাশ ১৯৭২ / পৃ ৭২।

১৫. ঐ পুস্তক, পৃ. ৬৯।

১৬. ঐ পুস্তক, পৃ ৮১, with previous reference to 'Now or Never' Journal published from 3, Humberstone Road, Cambridge, England—1933 / pp 103—110.

১৭. India Wins Freedom / Maulana Abul Kalam Azad / Orient Longman / 1989 / pp 164-165.

১৮. ibid, p 170.

১৯. ibid, p 197.

২০. ibid, pp 197-198.

২১. ibid, p 198.

২২. ibid, p 202.

২৩. ibid, p 204.

একবিংশ অধ্যায়

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বৈধতা

১৯৪৭ সালের ২৫ জুলাই নয়াদিল্লীতে ভারতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন আসন্ন ভারত ভাগের প্রাক্কালে, তাঁদের ভারত অথবা পাকিস্তান ভুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য।[১] অবশ্য তার পূর্বেই ১৪ জুনের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় ভারতমাতার সুসন্তানেরা তাঁর অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন ২৯ পক্ষে এবং ১৫ বিপক্ষে ভোটে, কংগ্রেস সভাপতি মহাত্মা মৌলানা আজাদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও[২]। মৌলানা আজাদ সাহেব তার পূর্বে ভারতভাগের পক্ষে মতাবলম্বনকারী নেহেরু ও প্যাটেলকে বোঝানোর শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারত ভাগ হলে ভবিষ্যতে কি বিষময় ফল দাঁড়াবে তাও তিনি ব্যাখ্যা করতে ভোলেননি। তাঁর নিজেরই ভাষায় বলি, "When I became aware that Lord Mountbatten was thinking in terms of dividing India and had persuaded Jawaharlal and Patel, I was deeply distressed. I realised that the country was moving towards a great danger. Partition of India would be harmful not only to Muslims but to the whole country. ...The real problems of the country were economic, not communal. The differences related to classes, not to groups. Once the country became free, Hindus, Muslims and Sikhs would all realise the real nature of the problems that faced them and communal difference would be resolved. I did my best to persuade my two colleagues not to take the final step. I found that Patel was so much in favour of partition that he was hardly prepared even to listen to my other point of view.…"[৩] কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! শ্রীযুক্ত প্যাটেল অন্ধ মুসলিম বিরোধিতায় এবং শ্রীযুক্ত নেহেরু ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের বাগ্মিতায় এবং শ্রীমতী এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তার পূর্বেই ভারতভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন! প্যাটেলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মৌলানা সাহেবের ভাষায়, "...He openly said that he was prepared to have a part of India if only he could get rid of the Muslim league. It would not perhaps be unfair to say that Vallabhbhai Patel was the founder of Indian partition…" এবং নেহেরুর মত পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "...I think one factor responsible for the

change was the personality of Lady Mountbatten. She is not only extremely intelligent but has a most attractive and friendly temperament ...”[৪] বৃটিশের প্রতি এমনিতেই প্রচণ্ড দুর্বলতা নেহেরুজীর ছিল, তার উপর লেডি মাউণ্টব্যাটেন মহিলা ও সুন্দরী! সুতরাং তাঁর অনুরোধ তিনি ঠেলেন কি করে! নেহেরুজীর বৃটিশজাতির প্রতি দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁরই রাজনৈতিক গুরু গান্ধীজির মন্তব্য, “...He is more English than Indian in his thoughts and make up. He is often more at home with Englishmen than with his countrymen....”[৫] সুতরাং ভারত-ভাগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ইংরেজ প্রভু মাউণ্টব্যাটেন ওই সভা আহ্বান করেছেন, অতঃপর দেশীয় রাজন্যবর্গের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবার জন্য। মহামান্য বড়লাট রাজন্যবর্গের সম্মুখে আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন যে, তাঁরা যেন ভি. পি. মেনন রচিত রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন। তাঁরা ভারতবর্ষ বা প্রস্তাবিত পাকিস্তান যে-কোন রাষ্ট্রের মধ্যেই যোগ দেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বংশানুক্রমিক সুবিধা ও অধিকারগুলি অপরিবর্তিত থাকবে, বিশেষত ভারত ও পাকিস্তান (প্রস্তাবিত) যখন কমনওয়েলথভুক্ত হতে রাজি হয়েছে। সুতরাং তাঁদের আশংকার কারণ নেই—ইত্যাদি।

কোন্ দেশীয় রাজ্য কোন্ রাষ্ট্রে যোগদান করবে তা জানার প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বেই। সেজন্যই এই সভা। অবশ্য ভুক্তি বিষয়ে মূল নীতি নির্ধারিত হয়েছিল এই যে, ভৌগোলিক পরিস্থিতি অনুকূল সাপেক্ষে যে সকল দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যার বেশির ভাগ মুসলমান, কিন্তু ভারত রাষ্ট্রে পড়ছে; এবং যে সকল দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যার বেশীর ভাগ হিন্দু, কিন্তু প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মধ্যে পড়ছে, তাদের ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বেই গণভোট নিয়ে জানিয়ে দিতে হবে তারা কোন্ রাষ্ট্রে থাকতে ইচ্ছুক। অবশ্য মুসলিম লীগ তরফে জিন্নাসাহেব বলেছিলেন, দেশের শাসকের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, সেখানে গণভোটের প্রয়োজন নেই।[৬] এ বিষয়ে প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যই মতামত জানিয়ে দিয়েছিল; জানাল না কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ এবং জুনাগড়। কাশ্মীরে ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা, কিন্তু হিন্দু রাজা; হায়দ্রাবাদে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা এবং মুসলমান রাজা (নিজাম); এবং জুনাগড়ে ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা, কিন্তু মুসলমান নবাব। সুতরাং অন্যান্য দেশীয় রাজন্যবর্গের মতো সংকল্প গ্রহণ করা তত সহজ ছিল না ঐ তিনটি রাজ্যের।

১৬ সেপ্টেম্বর নাগাদ খবর পাওয়া গেল যে, জুনাগড় নাকি পাকিস্তানে যোগদান করেছে। কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদ—এই তিনটি রাজ্য গ্রাস করবার জন্য জিন্না যে জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন, তাতে এক মৎস্য ধরা পড়েছে। অন্য দুটির ক্ষেত্রেও তিনি খুবই আশাবাদী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা গেছে, জিন্নার কূটকৌশল ও জিদের কাছে কংগ্রেসী নেতারা বারে

বারে পরাজিত হয়েছেন, যার বিবরণ আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দিয়েছি। পাকিস্তান সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে জিন্নার জয় ও কংগ্রেসের পরাজয়। তাই জুনাগড়ের পাকিস্তানভুক্তির স্বীকৃতি তারই পরিচয় বহন করে। এবার বোধহয় নেহেরু ও প্যাটেলের একটু টনক নড়েছে। জুনাগড় সম্পর্কে প্যাটেলের এবং কাশ্মীর সম্পর্কে নেহেরুর দুর্বলতা আছে ব্যক্তিগত কারণে। তাছাড়া জুনাগড়ের পাকিস্তানভুক্তির প্রভাব যে কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের উপরেও পড়বে—এটুকু সত্য বোধহয় তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাই পাকিস্তানের কাছে প্রতিবাদ গেল, জুনাগড়ের পাকিস্তানভুক্তি ভৌগোলিক কারণে অনুমোদন করা যায় না। ব্যারিস্টার জিন্না উত্তর দিলেন, রাজ্যের শাসকের অপ্রতিরোধ্য ও অবাধ অধিকার এবং আইনগত ক্ষমতা আছে যে কোন রাজ্যে ভারত অথবা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হবার। সুতরাং এরপর আর কথা চলে না। কিন্তু জিন্না তখন ভাবতেও পারেননি যে, তাঁর ঐ আইনের ভাষ্য [তিনি আইনজ্ঞের মত সঠিক ভাষ্যই দিয়েছিলেন] বুমেরাং হয়ে তাঁরই কাছে ফিরে আসবে।

ভারতভুক্তির নীতি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জিন্না সাহেব খোয়াব দেখে রেখেছেন, কাশ্মীর রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবেই। দেশীয় রাজ্য অন্তর্ভুক্তিকরণের সূত্রানুযায়ী তখনকার পরিস্থিতিতে অবশ্যই কাশ্মীর পাকিস্তানের ভাগে পড়ত তথা অন্তর্ভুক্ত হত। কিন্তু জিন্না সাহেব এই প্রথম চালে ভুল করলেন, কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়ে, যার ফলে সমস্ত পরিস্থিতিটাই তাঁর প্রতিকূলে চলে যাওয়ায় পাকিস্তানের আফশোসের শেষ নেই,—শেষ নেই পাকিস্তানপন্থী কিছু মৌলবাদী ধর্মান্ধ ব্যক্তির ; যেজন্য ভারত ভাগের পরবর্তী কালে পাকিস্তান যে ইতর অধ্যায়ের সূচনা করেছে, তার বিস্তৃত বিবরণ এবং হানাদারদের বকলমে পাকিস্তান-ই যে কাশ্মীর আক্রমণকারী, তার স-তথ্য নিশ্ছিদ্র প্রমাণ পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের কারণে তা পাকিস্তানের প্রাপ্য হত,—একথা আপাতদৃষ্টে সত্য। কিন্তু এর পিছনে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল এবং যে প্রতিবন্ধকতা পাকিস্তান স্বয়ং সৃষ্টি করেছে, সেগুলি সর্বাগ্রে বিচার বিশ্লেষণ দরকার।

প্রথমত, কাশ্মীর ছিল স্বাধীন রাজ্য। সেই রাজ্যের শাসক ও জনপ্রতিনিধিগণ যদি রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে কোনও একটি দেশের সংগে merge করে যেতে চায়, তবে তা সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জুনাগড়ের মুসলমান নবাব যখন পাকিস্তানে যোগদান করায় ভারত উভয় পক্ষে স্বীকৃত ভৌগোলিক কারণ দেখিয়ে আপত্তি করেছিল, তখন ব্যারিস্টার জিন্না বলেছিলেন রাজ্যের শাসকের ইচ্ছাই সেখানে আইনসিদ্ধ[৬]। সুতরাং জুনাগড়ের নবাবের ইচ্ছায় পাকিস্তানভুক্তি আইনসিদ্ধ। পরে ভিন্ন আঙ্গিকে অনুরূপ ঘটনা যখন কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ঘটল, অর্থাৎ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যের হিন্দু রাজা বিপন্ন

রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করলেন, (উভয়ের মধ্যে ভৌগোলিক অনুকূল পরিবেশ বর্তমান), তখন সেই আইনবিদ জিন্নাই চোখের জলে রাষ্ট্রসংঘের সিঁড়ি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিলেন এবং ভারত যে কিরূপ পররাজ্যলোভী তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে পৃথিবীবাসীর কাছে নিজেকে সিন্ধুর জলের মতো পবিত্র বলে বোঝাতে লাগলেন।

দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরের মহারাজা ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক। তাঁর সর্বধর্ম ও সর্বসম্প্রদায় নিয়ে গঠিত একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল। মহারাজার ভারতভুক্তির সম্মতিপত্রে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স নামে রাজ্যের সর্ববৃহৎ প্রজাসংঘ স্বাক্ষরের জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন[৭]। এর পরও সেখানে গণভোটের প্রশ্ন যাঁরা তুলতে চান, তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, পাকিস্তান সৃষ্টি যে তত্ত্বের ভিত্তির উপর, অর্থাৎ দুই জাতিতত্ত্ব, সেটাই আমি সত্য বলে আদৌ মেনে নিতে পারি না; কারণ তা চরম মিথ্যা বলে। 'মুসলমান' একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, তারা জাতি হিসাবে ভারতীয় এবং ভারতের অবিভাজ্য জাতি।[৮] ভারতে আরও অনেক ধর্মাবলম্বী যুগ যুগ ধরে আছেন, তাদের কি 'ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে একটা জাতি' রূপে দেখব, অথবা তাদের 'ভারতীয় জাতি' হিসেবে দেখব? তাহলে তো ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অজুহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের সূচনা করতে হবে,—এ চিন্তা কোনও উন্মাদ করবে? সুতরাং পাকিস্তান প্রস্তাবের পিছনে না ছিল কোন সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি, না ছিল কোন নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি, না ছিল কোন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব এবং না ছিল কোন নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ। এ ছিল কেবল ধর্মীয় কারণে কতিপয় মৌলবাদী, স্বার্থান্বেষী ও ধান্দাবাজ মুসলমানের ক্ষমতালাভের অজুহাত। 'ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে জাতি' এবং অথবা 'এক সম্প্রদায় এক রাষ্ট্র'—এই চিন্তা বর্তমান বিশ্বে একমাত্র পাকিস্তান-পন্থীদের মতো উন্মাদরাই করতে পারেন।

চতুর্থত, কাশ্মীর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমন কি খ্রীস্টপূর্ব আড়াই হাজার বৎসরেরও পূর্ব থেকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে ইন্দ্রপ্রস্থ তথা দিল্লীর অধীনে ছিল, যার স-তথ্য প্রমাণ পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের যা কিছু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সবই তখনকার সময় থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাজ্যের ও রাজধানীর নাম-সহ কাশ্মীরের প্রতিটি ইঞ্চি ভূখণ্ডের সঙ্গে হিন্দু পুরাণকাহিনীর ও ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রয়েছে, যাকে অস্বীকার কিম্বা অগ্রাহ্য করার সাধ্য নেই পৃথিবীর কোন অশুভ সম্প্রদায়ের / জাতির / শক্তির। সুতরাং নবগঠিত পাকিস্তানের কি অধিকার আছে কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তির দাবি করার? কাশ্মীর বর্তমানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য

বলে ? এছাড়া আর কোনও যুক্তি পাকিস্তানের ঝুলিতে আছে কি ? এই অসার দাবির বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্বেও দিয়েছি, এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ দফাতে দিচ্ছি এবং পরেও দেব। ভারতে এখনও এমন অনেক গ্রাম, অঞ্চল, তহশীল, শহর, জেলা আছে যেখানে মুসলমান ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে ; পাকিস্তানের এই অসার যুক্তি মেনে নিতে গেলে তো সেই স্থানগুলিতে ঐ ধর্মাবলম্বীদের স্বায়ত্ত-শাসন, এমনকি সার্বভৌম স্বাধীনতা দিতে হয় !

পঞ্চমত, খ্রীস্টপূর্ব আড়াই হাজারেরও পূর্ব থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চার হাজার বৎসর কাল কাশ্মীর ছিল প্রথমে আর্য ও পরে হিন্দুপ্রধান রাজ্য। তা যেমন মূলত মুসলমান শাসকদের অবর্ণনীয় অত্যাচারে পরবর্তী চারশো বছরের মধ্যে (১৩৯৪ খ্রীঃ—১৮১৯ খ্রীঃ) মুসলমানপ্রধান রাজ্যে পরিণত হয়েছে ; ঠিক তেমনই কালেরই নিয়মে যদি কাশ্মীর আবার অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তখন সে পাকিস্তান থেকে বের হয়ে আসতে চাইলে পাকিস্তান মেনে নেবে সে দাবি ?

ষষ্ঠত, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করলে [পাকিস্তান সৃষ্টি এবং কাশ্মীরের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তির পশ্চাতে মুসলিম লীগের যুক্তি], সেই রাষ্ট্রে বেহেস্তের সর্বসুখ নেমে আসবে,—এই তত্ত্ব মেনে নিতে হলে পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসকে এক সমুদ্র জল দিয়ে মুছে ফেলতে হবে, যে চেষ্টা কোনও বেকুব করবে কি ? বরং ইতিহাস এই কথাই বলে, একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যত যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে এবং রক্তের নদী বয়ে গেছে, তত ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়নি। যেহেতু কাশ্মীরের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশেরও বেশী মুসলমান ধর্মাবলম্বী [কিভাবে মূলত জুলফিকাদির খাঁ, সুলতান সেকেন্দার খাঁ, ঔরংগজীব এবং আহমদশা দুরানি প্রভৃতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদেরই বর্বর অত্যাচার এবং 'হয় ধর্মত্যাগ, নয় মুণ্ড ত্যাগ' নীতির ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে, তার স-তথ্য বিবরণ পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দেওয়া হয়েছে, এবং কিভাবে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্তনীতি ও নিবুদ্ধিতার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের সামান্যতম অনুপাতটুকুও ভারতভুক্তির পর মুছে গেছে, তার তথ্য ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে], অতএব পাকিস্তানের কাশ্মীরকে পাওয়ার অধিকার আছে, এই যদি পাকিস্তানের যুক্তি হয় ; সেক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রবক্তা জিন্না সাহেব বেঁচে থাকলে তাঁকে প্রশ্ন করতাম, —আপনার সাম্রাজ্যের 'পূর্বপাকিস্তান' নামক রাজ্যটি কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হল ? কোথায় রইল আপনার 'এক ধর্ম এক রাষ্ট্র' বা হিন্দুমুসলমানের দ্বিজাতিতত্ত্ব ? 'ধর্ম' কখনও একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত হবার মুখ্য কারণ হতে পারে না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী কি তাই প্রমাণ করে ? কোনও একটা দেশ অন্য একটি দেশের সঙ্গে যুক্ত অথবা দেশ থেকে বিযুক্ত হয় বিভিন্ন

পারিপার্শ্বিক কারণে। যেমন, আমার বিবেচনায়, পূর্বপাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ হয়েছে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত কারণে,—ধর্মীয় কারণে আদৌ নয়। জার্মানি বিভক্ত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কারণে, এবং পুনরায় যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে। তিব্বত চিনের সঙ্গে, কিম্বা সিকিম ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে যথাক্রমে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে। কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং রাশিয়া বিভক্ত হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। এতগুলি যে উদাহরণ দেওয়া হল এরা কেউই ধর্মীয় কারণে যুক্ত বা বিযুক্ত হয়নি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বা নেতাদের ভ্রান্তি ধর্মীয় কারণে ভারত ভাগ। সেখানেও জাতির প্রতি নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা সহ সম-শক্তির একাধিক কারণ ছিল। কেবল ধর্ম নয়, ভারত ভাগ হয়েছিল মূলত রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে উপলক্ষ করে ইংরাজদের Divide and Rule [এক্ষেত্রে Rule অর্থে অর্থনৈতিক শাসন বুঝতে হবে] নীতির কূট চালে অদূরদর্শী কংগ্রেসী নেতারা মাত হয়ে গিয়ে। পাকিস্তানের সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদের এই ফর্মুলা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে তো বর্তমানে প্রায় ২২।২৩ কোটি ভারতীয় মুসলমানদের কাছ থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের পুনরায় ভাগ হয়ে যাবার যথেষ্ট ভীতির কারণ থেকে যাচ্ছে !

সপ্তমত, ভারতভুক্তির প্রাক্কালে হায়দ্রাবাদ ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য। ঐ রাজ্য ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার পর থেকে সেখানের ইসলামধর্মাবলম্বী নাগরিকদের কিছুমাত্র ধর্মভিত্তিক এবং সংস্কৃতিগত অসুবিধা হয়েছে কি ? শুধু হায়দ্রাবাদ কেন, ভারতের যেখানে যেখানে মুসলমান সম্প্রদায় আছেন, তাঁদের ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির কতখানি বিঘ্ন ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণের ফলে হয়েছে, অরাজনৈতিক কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে তার একটা সমীক্ষা করে সেই সমীক্ষাপত্র বিশ্বদরবারে রাখবার সাহস পাকিস্তানের আছে কি ?

তাহলে কাশ্মীরের মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাদের নিয়ে এত গেল গেল রব তুলছে কেন পাকিস্তান ? সেটা আদৌ মুসলমান প্রজাদের প্রতি দরদের জন্য নয় ; সেটা ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার আড়ালে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণ। কাশ্মীরের অবস্থানের আন্তর্জাতিক গুরুত্বই পাকিস্তানকে ঐ অজুহাত সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছে। যেহেতু রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণ দেখিয়ে কাশ্মীর পাওয়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে আর সম্ভব নয়, সেজন্যই জিগির তোলা হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে গণভোট ইত্যাদির।

প্রবচন আছে,—দুর্জনের ছলের অভাব নেই। পাকিস্তানের হয়েছে তাই। গণভোটের যুক্তি যথার্থতা পেত কেবল তখনই, কাশ্মীর রাজ্য কোন একটি রাষ্ট্রে যোগদানের পূর্বে। ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্রে আইনসিদ্ধ পথে অঙ্গরাজ্য হিসাবে

অংগীভূত হবার পর গণভোটের চিন্তা একমাত্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং / বা আবেগতাড়িত ব্যক্তিরাই করতে পারেন ;—যেমন সে চিন্তা করেছিলেন যথাক্রমে মাউন্টব্যাটেন এবং তার তোষামোদকারী ও ক্রীড়নক পণ্ডিত নেহেরু। যেজন্য নেহেরু মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে তড়িঘড়ি গণভোটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন[৯] এবং হানাদারদের একেবারে রাজ্য ছাড়া না করে জাতিসংঘের মোড়লদের ডেকে এনে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন[১০] যার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ আমি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করেছি।

অষ্টমত, খোদ পাকিস্তানের সৃষ্টিই কি গণভোটের মাধ্যমে হয়েছিল? অবিভক্ত ভারতের সমস্ত মুসলমানদের কি অভিমত নেওয়া হয়েছিল যে, তারা আদৌ পাকিস্তান রাষ্ট্র চান কিনা? স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বলে, পাকিস্তান রাষ্ট্র হয়েছিল জিন্না লিয়াকত আলি প্রমুখ মুষ্টিমেয় মৌলবাদী, বিচ্ছিন্নতাকামী ও ক্ষমতালোভী নেতার ক্ষমতালিপ্সা এবং বৃটিশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের যুগ্ম ফলশ্রুতি স্বরূপ, যার তথ্যভিত্তিক উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দিয়েছি।

নবমত, তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে খোদ মাউন্টব্যাটেনের প্রেস সচিব কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পর্কে যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন, সুধী পাঠক-বর্গের বিবেচনার জন্য, সেটি তাঁর ভাষাতেই তুলে দিচ্ছি ঃ "জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং পাকিস্তান সে ঘোষণা সরকারীভাবে মেনে নিয়েছেন। কাশ্মীরের মহারাজাও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই দুইটি দেশীয় রাজ্যের রাষ্ট্রভুক্তির ব্যাপারের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, দুই ঘটনাকে একই ধরণের ঘটনা বলে মনে করা যায় না। কেন করা যায় না, সেই বিষয়টি আমি এইভাবে বর্ণনা করেছি।

জুনাগড়ের অধিকাংশ প্রজার অভিমত ও ইচ্ছার কথাটা আমি আপাতত প্রসংগের মধ্যে আনছি না। প্রজার ইচ্ছার কথা বাদ দিয়েও বলা যায় যে, জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তি নীতিবিরুদ্ধ এবং প্রতিশ্রুতিবিরুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্থানের নেতারা পূর্বেই এই নীতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের বাস্তব সত্যটির দিয়ে লক্ষ্য রেখে দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্ত করতে হবে। কোন দেশীয় রাজ্যের পক্ষে এমন কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত হবে না, যে রাষ্ট্রের সংগে ভৌগোলিকভাবে কোন সংযোগ বা সম্পর্ক সেই দেশীয় রাজ্যের নেই। কিন্তু জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পাকিস্থান এই পূর্বঘোষিত নীতি ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছেন, কারণ জুনাগড় হলো পাকিস্থান সীমান্ত হতে দূরে এবং ভারতের অভ্যন্তরভাগে একটি দেশীয় রাজ্য। পাকিস্থানের সীমান্তের সংগে জুনাগড় রাজ্যের কোন ভৌগোলিক সংযোগ নেই।

কিন্তু দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরের অবস্থান এধরনের নয়। কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতভূখণ্ডের ভৌগোলিক সংযোগ রয়েছে। আর একটি বাস্তব সত্যও লক্ষ্য করার বিষয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, অথবা দেশরক্ষার জন্য সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনে, জুনাগড় পাকিস্থানের কাছে নিতান্তই মূল্যহীন। ঐ দুই উদ্দেশ্যের জন্য পাকিস্থানের পক্ষে জুনাগড়কে নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করার কোনই প্রয়োজন নেই, হেতুও নেই। কিন্তু ভারতের পক্ষে কাশ্মীরের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, ঐ দুই কারণেই—অর্থনৈতিক কারণে এবং রাষ্ট্রের দেশরক্ষার প্রয়োজনের কারণে।

এ ছাড়াও আরও দুটি ঘটনাগত বাস্তব ব্যাপার আছে যার জন্য কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সমর্থন করা যায় এবং জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তি সমর্থন করা যায় না। প্রথম হলো, কাশ্মীরের মহারাজা যে সময় কোন রাষ্ট্রেই অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি, সেই সময়েই অস্ত্রবলে মহারাজাকে রাজ্যচ্যুত করবার জন্য উপজাতীয়ের দল কাশ্মীরের উপর অভিযান ও আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু জুনাগড়ে এ ধরনের কোন ঘটনা হয়নি। জুনাগড় নবাবের পাকিস্থানে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার আগে জুনাগড়ে কোন হাঙ্গামাই হয়নি। দ্বিতীয়ত, ভারতভুক্তির আগে থেকেই কাশ্মীর রাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বৃহৎ রাজনৈতিক সংঘ ছিল। জুনাগড়ে এ ধরনের কোন রাজনৈতিক প্রজাসঙ্ঘ ছিল না।

এই সব 'অন্যান্য তথ্য' বিবেচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত না করে পারা যায় না যে, জুনাগড়ের পাকিস্থানভুক্তি সম্পূর্ণভাবে একটা খামখেয়ালী ব্যাপার মাত্র, এর পিছনে কোন বাস্তবসম্মত যুক্তি নেই। কিন্তু কাশ্মীরের ভারতভুক্তির ব্যাপার সুস্পষ্টভাবেই একটি বাস্তবসম্মত ঘটনা, যা সমর্থন করার মত যথেষ্ট যুক্তি আছে।"[১১]

একজন নিরপেক্ষ বিদেশী রাজকর্মচারীর বিবেচনায় কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পিছনে যে যুক্তি ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেক্ষেত্রে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র এমন যুক্তি দেখাচেছ, তাতে সমগ্র মুসলিম সমাজের তো লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়া উচিত। অবশ্য পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির লজ্জা বলে কিছু নেই; কারণ, তার সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে নির্লজ্জ ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্ব। জন্মলগ্নে যে রাষ্ট্রের এই ইতিহাস থাকে তাদের কাছ থেকে লজ্জা পাওয়ার আশা করা নিজেদের লজ্জা দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পর হানাদারদের বকলমে পাকিস্থানের কাশ্মীর তথা ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ৫।২।৪৮ তারিখে জাতিসংঘে কাশ্মীরের জনপ্রতিনিধি শেখ আবদুল্লা প্রতিবাদে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার কিছু অংশ— "...Under those circumstances both the Maharaja and the people requested the Govt. of India to accept accessi-

on. Pakistan has no right to say that we must do this and we must do that…" তিনি পুনরায় ২৫।৫।৪৮ তারিখে যে বক্তব্য রাখেন, তার কিছু অংশ, "…By her action Pakistan has permanently branded herself as an aggressor and we have made our choice and linked our destiny with India, and nothing can separate us now…"

সুতরাং উপরোক্ত বিশ্লেষণমতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বৈধতাকে অস্বীকার করার কণামাত্র সুযোগ থাকছে না। ঠিক সে কারণেই কপটাচারী পাকিস্তান সরকার ভবিষ্যতে তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কায় গিলগিট ও বালতিস্তান কাশ্মীরের অংশ নয় বলে একটা যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করেছিল, যেটা অধিকৃত কাশ্মীরের উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ গত ইং ৮।৩।৯৩ তারিখে প্রদত্ত ২২৮ পৃষ্ঠার এক ঐতিহাসিক রায়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খারিজ করে দিয়েছেন এই মর্মে যে, গিলগিট ও বালতিস্থান ঐতিহাসিকভাবেই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ[১১]। সুতরাং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারতভুক্তি আইনসিদ্ধ, বৈধ ও চূড়ান্ত প্রমাণিত হওয়ায় অধিকৃত গিলগিট ও বালতিস্তান সহ ঐ রাজ্যের যে কোন অংশকে অধিকার করে রাখার বিন্দুমাত্র সুযোগও আর পাকিস্তানের হাতে থাকছে না—এমনকি গণভোটের পচা-গলা অজুহাতেও নয়।

তবে যে রাষ্ট্রের জন্ম হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতির মধ্য থেকে, তারা যে ন্যায় ও নীতির অনুশাসন মেনে নেবে না,—এ বিষয়ে আমি একশভাগ নিশ্চিন্ত। সে কারণেই ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর নীতি তদনুসারেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। ভারতে মাউন্টব্যাটেন / মিঃ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন / আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী / ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ / পৃ ১১৬।

২। India Wins Freedom / Maulana Abul Kalam Azad / Orient Longman / 1989 / pp 214—216.

৩। ibid, pp 200—201.

৪। ibid, p 198.

৫। আমি সুভাষ বলছি (২য় খণ্ড) / পৃ ২৬৭।

৬। ভারতে মাউন্টব্যাটেন / মিঃ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন / আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী / ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ / পৃ ১৬৫, ২০৪, ২১০।

৭। Indian Complaint to the Security Council / Letter dated 1-1-1948 / Chapter—5.

৮। বীক্ষণ ১ম খণ্ড / অলকরঞ্জন পাল / রত্না বুক এজেন্সী / ১৯৯৩ / পৃ ২১-২২।

৯। ভারতে মাউন্টব্যাটেন / মিঃ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন / আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী / ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ / পৃ ২০২, ২০৪।

১০। ঐ পুস্তক, পৃ ২৪১—২৪২।

১১। ঐ পুস্তক, পৃ ২৮৭—২৮৮।

১২। কাশ্মীর স্বর্গচ্যুত / সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত / উজ্জ্বল সাহিত্যমন্দির / কলিকাতা ৭ / প্রথম প্রকাশ ১৪০১। পৃ ৩৫—৩৬।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কাশ্মীর যুদ্ধ

সে যুগে একটা ছড়া খুব প্রচলিত ছিল,—'হাত মে বিড়ি মুখ মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ;—তা তারা লড়েই পাকিস্তান নিয়েছিল অকর্মণ্য ও অদূরদর্শী কংগ্রেসের হাত থেকে। এবার কাশ্মীরকেও 'লড়কে লেঙ্গে'র প্রয়োজন হল। কারণ কবে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, এখনও বেয়াকুফ কাফের হিন্দু রাজাটার আক্কেল হল না পাকিস্তানে যোগ দিতে? জুনাগড় গেছে, হায়দ্রাবাদ গেছে, এবার যদি কাশ্মীরও যায়, তাহলে যে আফসোসের সীমা থাকবে না শাহেনশা জিন্নার! প্রায় দুমাস হতে চলল,—আর কত ধৈর্য ধরতে পারেন শাহেনশা তামাম পাকিস্তানের শাসনকর্তা মহম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব? কাশ্মীরে খাদ্যসম্ভার, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, পেট্রল ইত্যাদি সরবরাহ হত পাকিস্তানের যে শহরগুলি থেকে সড়ক পথে, তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—বেয়াদব মহারাজাটাকে একটু শাসন করে দিতে; তাতেও চৈতন্য হল না? কিন্তু দিল্লীতে কনাস্টটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লীতে বসে ইংরেজ প্রভুর ছত্র ছায়ায় বাক্‌যুদ্ধ করে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে পাকিস্তান লড়কে নেওয়া, আর সৈন্য পাঠিয়ে কাশ্মীর লড়কে নেওয়া—এ দুইয়ের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক। পাকিস্তানের সৈন্য পাঠিয়ে প্রকাশ্যভাবে কাশ্মীর দখল করতে গেলে যে বেকায়দায় পড়ে যেতে হবে, এ জ্ঞানটুকু অন্তত বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার পাকিস্তান স্রষ্টার মাথায় তখনও ছিল। মহারাজা কর্তৃক জিন্নার কাশ্মীর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, ভারতীয় দফতর কর্তৃক কাশ্মীরে ডাক ও তার বিভাগ চালু করা ইত্যাদি লক্ষণ দেখে জিন্না সাহেব অনুমান করেছিলেন যে, কাশ্মীর ভারতেই যোগ দিতে চলেছে। তবুও একটা আশা ছিল যে, কাশ্মীরী জনগণের মতের বিরুদ্ধে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগ দিতে ইতস্তত করবেন। কিন্তু মহারাজার সিদ্ধান্তের জন্যে বসে থাকা চলে না, কারণ ভারত ভাগ হবার পূর্ব থেকেই উচ্চ পর্যায়ের মুসলিম নেতৃত্ব ঠিক করে রেখেছিলেন যে PAKISTAN নামের 'K' অক্ষরটির জন্য কাশ্মীর তাদের চাই। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আবদুল কৈয়ায়ুম খানের নিকট থেকে যখন প্রস্তাব এল যে, তিনি হাজার হাজার পাঠান উদ্বাস্তুদের পবিত্র কাশ্মীর যুদ্ধের জন্য তথা কাশ্মীর লড়কে নেওয়ার জন্য পাঠাতে পারেন, তখন জিন্না সাহেব যেন হাতে চাঁদ পেলেন; এবং তারাও পেলেন যখন পশ্চিম পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী এ বাবদ অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। পাঠান উদ্বাস্তুদের বোঝানো হল, তোমরা কাশ্মীর দখল করে ওখানে বসবাস করতে পারবে ইত্যাদি। সৈন্য হল, টাকা হল—এবার চাই সেনাপতি। তাও পাওয়া গেল—একজন কর্নেল আকবর খাঁ, যিনি দিল্লীতে জিন্না সাহেবের অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য প্রায়ই যেতেন।

আকবর খাঁ এই পরিকল্পনার নাম দিয়েছিলেন 'অপারেশন গুলমার্গ'। এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বাহ্ণেই মেজর ওঙ্কার সিং কালকট জানতে পেরেছিলেন ; কিন্তু দিল্লীর মিলিটারী দফতরে সে সংবাদ জানাতে দেরি হয়। ১৯।১০।৪৭ তারিখে দিল্লীর সমর দফতর যখন জানতে পারে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই ২২।১০।৪৭ তারিখে কাশ্মীর আক্রান্ত হয়। এই সংবাদ মহারাজ হরি সিং-এর গোয়েন্দা দফতর জানতে পেরেছিল কিনা বোঝা যায় না। এ দুর্বলতা মহারাজা হরি সিং-এর প্রশাসনের। কারণ, পাকিস্তানের হাজার হাজার উপজাতীয়রা কাশ্মীর আক্রমণের তোড়জোড় করছে—এ সংবাদ যথাসময়ে সংগ্রহ করতে না পারার মতো অপদার্থতা আর নেই। যে রাজ্য এ সংবাদটুকু সংগ্রহ করতে না পারে এবং রাজ্য রক্ষার অগ্রিম ব্যবস্থা করতে না পারে, তার রাজ্য না থাকাই তো উচিত। সেই তিনি ভারতের সাহায্য চাইলেন—আক্রান্ত হবার পর। দ্বিতীয় সেনাপতি পাওয়া গেল খুর্শিদ আনোয়ারকে। যিনি সৈন্যবাহিনীর তহবিল তছরূপ করে বিতাড়িত হয়েছিলেন। জিন্নার প্রচ্ছন্ন মদতে এই ঈর্ষাপরায়ণ হঠকারীরা যখন সৈন্য, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের ব্রিটিশ অফিসাররা তা দেখেও প্রতিকার করা দূরের কথা সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত কাদিয়ানের ভাষায় : "...A number of British Officers, both in the civil and the military, could see what was happening. Some turned a blind eye, others actively co-operated. For example neither the police nor the army, both under British Officers based at Peshawar, tried to stop the tribals and their lorries from leaving the North West Frontier Province by crossing the Attock bridge...."[১]

আপাতত সাতহাজার পাঠান উদ্বাস্তু ও সীমান্ত উদ্বাস্তু পাওয়া গেল এই মহান কর্মের জন্য। কিন্তু এদের জন্য চাই অর্থ, রেশন, অস্ত্র-শস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি ; চাই অনেক যানবাহন। একটা রাজ্য জয় করতে যাওয়া বলে কথা ! সে চিন্তা থেকে হানাদারদের উদ্ধার করলেন মুসলমানদের উদ্ধারকর্তা জিন্না সাহেব [হিন্দুদের সঙ্গে যারা বসবাস করে, তারা দোজখের অধিবাসী। সেজন্যই তো তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য পাকিস্তান নামক বেহেস্তের সৃষ্টি করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন]। তাদের দেওয়া হল তিনশো লরি, যথেষ্ট পেট্রল, রেশনপত্র—আর দেওয়া হল চিহ্নছাড়া মিলিটারী পোশাক এবং অত্যাধুনিক রাইফেল কামান ইত্যাদি। সুতরাং আর দেরি নয়। 'অপারেশন গুলমার্গ'-এর এই পরিকল্পনা জেনারেল লকহার্ট অনেক পূর্বে জানতে পারলেও ভারত সরকারকে তা জানানো প্রয়োজন মনে করেননি। আর জেনারেল ফ্রাঙ্ক মেসার্ভি তো হানাদারদের রওনা হবার পরই লন্ডন পাড়ি দিলেন তাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র কিনতে। কাশ্মীর দখল করবার জন্য মুসলিমলীগ ও ব্রিটিশ অফিসাররা কি গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন, ভারতের কজন

নাগরিক তা জানেন ? এবার 'অপারেশন গুলমাগ"' পরিকল্পনা অনুযায়ী ২২।১০। ৪৭ তারিখের শুভলগ্নে হা-রে-রে-রে করে হানাদারদের বকলমে পাকিস্তান ঝাঁপিয়ে পড়ল অথর্ব কাশ্মীরের উপর, যার তখন সৈন্যসামন্ত বলতে কিছু পুলিশ এবং সাবেকী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কিছু ডোগরা ও মুসলমান সৈন্য। মুসলমান সৈন্যরা এ সংবাদ পেয়ে তাদের ধর্মপ্রীতি প্রদর্শনের তাগিদে হানাদারদের রাস্তা দেখিয়ে আহ্বান করবার জন্য মহারাজার আনুগত্য ত্যাগ করে চলে গেল। বাকি সামান্য ডোগরা সৈন্যদের নিয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিংজী রুখে দাঁড়ালেন। মহারাজের মিলিটারী ও পুলিশ নিয়ে প্রায় দশ হাজারের মতো বাহিনী। তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান। সুতরাং যে ছয়-সাত হাজার অস্ত্রধারী ব্যক্তি কাশ্মীরে রইলেন, তাঁরা কখনও যুদ্ধ করেননি। তাও ঐ ছয় সাত হাজারের মধ্যে বেশির ভাগই পাঠানো আছে গিলগিট, বালতিস্তান, জম্মু এবং লাডাকে। কাশ্মীর উপত্যকায় অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই আছে ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং-এর অধীনে, যিনি পশ্চিম সীমান্তে রয়েছেন। সুতরাং পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে কাশ্মীরের সীমান্ত শহর মজফফরাবাদ ও ডোমেলের পতন হতে দেরি হল না। মজফফরাবাদ দখল করে নিয়েই তারা লুঠ ও ধর্ষণে মনোযোগী হয়। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর শৃংখলার দায়িত্ব এদের নেই। এরা মধ্যযুগের লুটেরা। লুট শেষে লুটের সামগ্রী ও নারীদের ট্রাক বোঝাই করে পাঠিয়ে দেওয়া হল পাকিস্তানে। নাদির শাহ যদি ছিলেন রাক্ষস [তিনি উট ও ঘোড়া বোঝাই করে লুণ্ঠিত সামগ্রী ও নারীদের নিয়ে গিয়েছিলেন, সে যুগে ট্রাক ছিল না], তবে এ যুগের এরা খোক্কস,—যাদের নারকীয় আচরণ গল্পকথাকেও হার মানায়। সময়ের ব্যবধান থাকলেও এরা চরিত্রে এক ও অভিন্ন। দুর্বৃত্তদের কিন্তু উরিতে এসে আটকে যেতে হয়। সেখানে কাশ্মীর সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং তাঁর অধীনস্থ কেবল ডোগরা সৈন্যদের নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি হাজার হাজার অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাঠান সৈন্যদের বিরুদ্ধে মাত্র কয়েকশ ডোগরা রাজপুত সৈন্য নিয়ে ৪৮ ঘণ্টা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে বীরগতি প্রাপ্ত হলেন। বীর সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং যুদ্ধে নিহত হয়েও উরি রক্ষা করতে পারলেন না বটে, কিন্তু কাশ্মীর রক্ষা করে গেলেন। এই যুদ্ধই কাশ্মীরের ইতিহাস ভিন্নপথে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যদি সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং তাঁর ঐ সামান্য সৈন্য নিয়ে অসামান্য যুদ্ধ করে উরিতে পাক হানদারদের দুদিন আটকে রাখতে না পারতেন, তাহলে ভারতীয় সৈন্য আকাশপথে উড়ে এসে দেখত শ্রীনগর দখল হয়ে গিয়েছে এবং তখন আর করার কিছু সুযোগ থাকত না। ঐ দুদিনের সুযোগে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদান পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ভারতীয় বাহিনী আকাশপথে এসে রাজধানী শ্রীনগর এবং বিমানঘাঁটি রক্ষা করার জন্য সুযোগ পেয়েছিল। এই অসম যুদ্ধে আমরা চারজন বীর সেনাপতিকে হারিয়েছি। প্রথমে কাশ্মীরের সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং, পরে ভারত যুদ্ধে নামার পর তিন ভারতীয় সেনাপতি কর্নেল দেওয়ান রণজিত রাই,

মেজর-সোমনাথ শর্মা এবং ব্রিগেডিয়ার ওসমান, যাঁদের বীরত্বগাথা আমি ক্রমশ বর্ণনা করছি।

উরিতে কাশ্মীর সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংজী যখন মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত, মহারাজা হরি সিং তখন রাজধানীতে উৎসবে ব্যস্ত। সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং মারা যাওয়ায় মহারাজার চৈতন্য হয় বুঝি। তিনি দ্রুত ভারত থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু স্বাধীন কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য যায় কোন্ অধিকারে? সুতরাং মহারাজা ভারতভুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। মহারাজা হরি সিং ভারতভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দানের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের সীমারেখা ভারতের সীমারেখা, কাশ্মীরের ভূখণ্ড ভারতের ভূখণ্ড গণ্য হওয়ায়, তা রক্ষার জন্য ভারতের বীর সেনানীদের নিয়ে প্রথম তিনখানি ডাকোটা বিমান যখন আকাশে ডানা মেলল, তখন ঝরে পড়ে তাদের মাথায় প্রভাতী সূর্যের রাঙা আশীর্বাদ। তারিখ ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ। শুরু হল স্বাধীন ভারতের সেনানীদের প্রথম যুদ্ধ-যাত্রা। তিনখানি ডাকোটায় মাত্র ১৫০ সৈন্য নিয়ে বহু কষ্টে মহারাজার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তৈরি ছোট্ট বিমানক্ষেত্রে এসে নামলেন দুঃসাহসী বীর কর্নেল রণজিত রাই। এই ছোট বিমানঘাঁটিতে যুদ্ধবিমান কিভাবে ভারতের বীর পাইলটরা নামিয়েছিলেন—সেটাই ছিল বিপুল বিস্ময়। বিমান তিনখানি সৈন্যদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে যায় আরও সৈন্য আনতে। কিন্তু এক বা দু দফায় বাহিত ঐ মুষ্টিমেয় সৈন্যদের নিয়ে হাজার হাজার সুশিক্ষিত হানাদারদের তথা পাক সৈন্যের মোকাবিলা কিভাবে করবেন, কিভাবে রাজধানী শ্রীনগর রক্ষা করবেন, এবং কিভাবেই বা সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এই চিন্তা কর্নেল রাইকে মুহূর্তমধ্যে করে নিতে হয়েছিল। সে সময়ের একটি সেকেন্ডের অর্থ একটি যুগ। সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংজীর বীরগতি প্রাপ্তির পর হানাদারেরা উরি দখল করে বারামুলায় এসে অবস্থান নিয়েছে। তার আগেই তারা মহুরা দখল করে রাজ্যের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চুরমার করে গোটা উপত্যকাকে নিষ্প্রদীপ করে দেয়। সুতরাং তাদের আর এক ইঞ্চি এগিয়ে আসতে দেওয়ার অর্থ রাজধানী শ্রীনগরকে তাদের কামান-বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এনে দেওয়া। অতএব আরও সৈন্য না আসা পর্যন্ত তাদের ওখানেই আটকে রাখতে হবে,—এক ইঞ্চি আর এগোতে দেওয়া চলবে না। যে চিন্তা সেই কাজ। শহরের যেখানে যেখানে ভাঙা ফুটো বাস লরী ছিল—সেগুলিকেই ভারতীয় মেকানিকেরা অপূর্ব দক্ষতায় দ্রুততার সঙ্গে মেরামত করে নেয়, ভারতীয় সৈন্য এগিয়ে চলে এক অসম যুদ্ধে পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তি রাখবার জন্য। ঝিলম নদীর তীরে বারামুলায় কর্নেল রাই-এর সেনাপতিত্বে মাত্র তিনশ ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে মেজর খুর্শিদ আনোয়ারের সেনাপতিত্বে হাজার হাজার সুশিক্ষিত পাঠান সৈন্যের সেদিন ৩৬ ঘণ্টার যে অসম যুদ্ধ হয়েছিল এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে রাজেন্দ্র সিংজীর সঙ্গে হানাদারদের যুদ্ধ। এই দুটি যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা চলে এমন যুদ্ধ পৃথিবীতে কোথাও হয়েছে

কিনা আমার জানা নেই। ঠিক উরি যুদ্ধের মতই বারামুলা যুদ্ধে স্বাধীন ভারতের প্রথম শহীদ বীর সেনাপতি রণজিত রাই বীরগতি প্রাপ্ত হলেন, কিন্তু পরিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর ভারতজননীর মাথায় বিজয়মুকুট। কারণ ঐ ৩৬ ঘণ্টার সুযোগে ভারতীয় বিমানবহর অপূর্ব দক্ষতায় আরও দেড় হাজার সৈন্য নামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিতে। তাই রক্ষা পেয়েছিল রাজধানী শ্রীনগর সহ কাশ্মীর উপত্যকা।

ভারতমাতার সুযোগ্য বীর সন্তান স্বর্গত লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রণজিত রাই-এর অমর আত্মার প্রতি সেদিন সমগ্র ভারতবাসী চোখের জলে এবং সরকার মহাবীরচক্রে ভূষিত করে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। আর কাশ্মীরের জনগণ, আজ যাদের কিছু অংশ ভারতকে বিদেশ বা শত্রু বলে মনে করছে—তাদের পূর্ব-বর্তী প্রজন্মের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ঘর থেকে বের হয়ে এসে সেকি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য, সেকি আমোদ ও উচ্ছ্বাস ভারতীয় সৈন্যদের ঘিরে! এঁরা আমাদের ত্রাতা, আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের ভাই বলতে বলতে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি সেদিন। সেই জনগণেরই পরবর্তী প্রজন্ম একি আচরণ করে চলেছে তাদের সেই রক্ষাকর্তা, নির্লোভ, অসাম্প্রদায়িক, সর্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল ভারতবর্ষের প্রতি,—যে ভারতবর্ষ তাদের হাজার হাজার বৎসর ধরে বুকে আশ্রয় দিয়ে এসেছে অঙ্গরাজ্য হিসেবে? সেই ভারতেরই অঙ্গরাজ্য হিসেবে আজ তাদের থাকতে কেন এত অনীহা—এত জড়তা—এত দ্বিধা—এত সন্দেহ?

এরপর স্বর্গত কর্নেল রাই এর স্থান পূরণ করতে যিনি এলেন, তিনি বহু যুদ্ধ বিজয়ী বহুদর্শী ব্রিগেডিয়ার লাওনেল প্রতীপ সেন বা এল. পি. সেন। এদিকে কাশ্মীর উপত্যকা রক্ষায় যখন ভারতীয় বাহিনী ব্যস্ত, অন্যদিকে গিলগিটে তখন ৪ নভেম্বর পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করলেন ব্রিটিশ সেনাপতি মেজর ব্রাউন। এটি একটি চমৎকার বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। ব্রিটিশরা ষড়যন্ত্র, চাতুরী, ভেদবুদ্ধি ও মিথ্যাচারে এতোই রপ্ত ছিল যে, ঐগুলিকে মূলধন করেই তারা ভারত দখল করে তা প্রায় দুশো বছর শাসন করেছে। সেদিনও সুদূর পৃথিবীর ছাদের কাছে গিলগিটে তাদের দ্বারা কি প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার সংবাদ সমভূমির সাধারণ ভারতবাসী কিভাবে জানবেন? কে জানাবেন সেই বিশ্বাসহন্তাদের কাহিনী? তাদেরই তাঁবেদারে তো তখনও দেশ ছেয়ে আছে। সামরিক বিভাগের বেশির ভাগ অংশই তখনও ব্রিটিশ প্রভাবাধীন। এ কাহিনী বুঝতে হলে গিলগিট এজেন্সির বিষয়ে কিছু বিশদ হওয়া দরকার। ডোগরা রাজা ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে গিলগিট অধিকার করার ফলে তাঁর রাজ্যের সীমা হয় উত্তরে রাশিয়া—চিন এবং আফগানিস্তান, দক্ষিণে পঞ্জাব, পূর্বে চিন ও তিব্বত এবং পশ্চিমে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। অর্থাৎ কাশ্মীরকে ঘিরে থাকল চারটি রাষ্ট্র—রাশিয়া, চিন, আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারত। সুতরাং কাশ্মীর রাজ্যের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। কাশ্মীরের

পাঁচটি প্রদেশ—জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকা, লাদাক, বাল্তিস্তান এবং গিলগিটের মধ্যে গিলগিটের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ একমাত্র গিলগিট দিয়েই পাঁচটি (বর্তমানে) রাষ্ট্রে প্রবেশ করা যায়—রাশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও চিন (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ব্রিটিশ চায় না সাম্যবাদের বীজ রাশিয়া থেকে গিলগিটের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানে সঞ্চারিত হোক। ভারত বেয়াড়া। তাকে বশে রাখা যাবে না। আজ ভারতের হিন্দুস্তানীদের জন্য [এটা তাদের ধারণা ; আমরা সকল সম্প্রদায় সমানভাবেই লড়াই করে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করেছি] ভারত সাম্রাজ্য হারাতে হয়েছে। বরঞ্চ গিলগিট (গোটা কাশ্মীরটা হলেই ভাল হয়) পাকিস্তানকে দিলে তারা সাম্যবাদের বিষাক্ত বীজকে ঢুকতে দেবেনা, ফলে পাকিস্তান, ও ভারত কম্যুনিস্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। ব্রিটিশের কাশ্মীর নীতির পশ্চাতে এই মনস্তত্ত্ব বরাবর কাজ করে গেছে। তাই তারা কাশ্মীরের মহারাজার উপর নির্ভর না করে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে গিলগিট এজেন্সি মহারাজাকে ষাট বৎসরের জন্য লীজ দিতে বাধ্য করে।[২] সেখানে তৎকালীন হিসাবে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার মুসলমান এবং দেড় হাজারের মত হিন্দু ও শিখ বসবাস করতেন। যখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে ব্রিটিশ দেশত্যাগে উদ্যোগী হল এবং দেশীয় রাজ্য হিসাবে কাশ্মীর হয় ভারত নয় পাকিস্তানে যোগদান করবে বুঝতে পারা গেল অথবা বলতে পারা যায় দুটি রাষ্ট্রের যে কোন একটিতে যোগদান করা ছাড়া কাশ্মীরের কাছে বিকল্প ছিল না, তখন ব্রিটিশেরও প্রয়োজন থাকল না গিলগিট আগলে রেখে খরচান্ত হওয়ার। এ অবস্থায় গিলগিটের শাসনভার ও দখল তার মালিক কাশ্মীর মহারাজকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত—নীতিগত ও আইনগত উভয় দিক থেকেই ব্রিটিশ তা ফেরত দিতে বাধ্য। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে ৪ নভেম্বর ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সেনাপতি সেখানে পাকিস্তানের পতাকা তোলেন কোন্ অধিকারে বা কোন্ বিবেচনায় ? কাশ্মীরের মহারাজা কি ইংরেজদের গিলগিট লীজ দিয়েছিলেন পাকিস্তানকে খয়রাতি করার জন্য ? কি ছিল এর নেপথ্য কাহিনী ? ব্রিটিশ গিলগিট ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে মহারাজা ব্রিগেডিয়ার ঘানসার সিংকে প্রেরণ করেন গিলগিটের গভর্নর করে তাঁর অধীনে সৈন্য দিয়ে। ব্রিটিশের উচিত ছিল নবনিযুক্ত গভর্নরকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থাৎ যার রাজত্ব তাকে ফেরত করে দিয়ে সেখান থেকে তার সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যখনই হানাদাররা গিলগিট আক্রমণ করল, সেখানে ব্রিগেডিয়ার সিং-এর অধীনস্থ কাশ্মীর সেনাপতি আবদুল মাজিদ স্বভাবসিদ্ধ বিস্বাসঘাতকতায় হানাদারদের দলে গিয়ে ভিড়লেন। তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা [অবশ্য ভারতে ব্রিটিশদের কীর্তি যতই পড়ছি, আর বিস্মিত হতে পারছি না] ইংরেজ সেনাপতি মেজর উইলিয়ম ব্রাউন, যাঁর কাশ্মীর মহারাজার হয়ে ব্রিগেডিয়ার সিং-এর সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করা উচিত ছিল, তিনি তো তা করলেন না, উপরন্তু হানাদারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ব্রিগেডিয়ার সিং-এর শিখ সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করলেন

এবং বিজয় গর্বে ৪ নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখে গিলগিটে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করলেন।[৩] পাকিস্তানের কব্জায় প্রায় বিনা মেহনতেই এসে গেল গিলগিট এজেন্সি ও বালতিস্তান।

গিলগিট এজেন্সি ও বালতিস্তান উদ্ধার করতে গেলে কাশ্মীর উপত্যকা রক্ষা হয় না। তাই ভারতীয় বাহিনী আপাতত জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হানাদার উৎখাতে নিযুক্ত হল। পাকিস্তান থেকে কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি পাকা সড়ক থাকার জন্য সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভার চলাচলের যে সুযোগ পাকিস্তান পেয়েছিল, তার একটা ভগ্নাংশ সুবিধা যদি ভারতীয় বাহিনীর থাকত, তাহলে ১৯৪৭ সালের পর কাশ্মীরের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। পাকিস্তানের সমর বিশারদদের এবং জিন্না সাহেবের মাথায় সে খুশির চিন্তা ছিল বলেই তারা কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল এই নিশ্চিত আশায় যে, দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত পার হয়ে কোন দিক থেকে কোনপ্রকার সাহায্য পৌঁছানোর আগেই তারা তাদের প্রভুর জন্য কাশ্মীরের সিংহাসনটি দখল করে নিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে পারবে। কিন্তু দুর্মদ, দুর্দম, দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসী ভারতীয় সেনানীদের কাছে দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত যে কোন বাধাই নয়, এবং ফলে তারা যে শাহেনশার এত সাধের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেবে,—এ তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। কিন্তু সেই অভাবনীয় সংবাদটাই যখন জিন্না সাহেব অ্যাবেটাবাদে বসে শুনলেন, তখন তাঁর প্রায় উন্মাদ অবস্থা। আর হবেই বা না কেন? এ যে সোনা বোঝাই ময়ূরপঙ্খী তীরে এসে ডুবতে বসেছে—এ অবস্থায় কার মাথার ঠিক থাকে? তাই তিনি তৎক্ষণাৎ লেঃ জেনারেল স্যার ডগলাস গ্রেসীকে টেলিফোনে হুকুম দিলেন কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথাগত প্রকাশ্য যুদ্ধযাত্রা করতে। গ্রেসী তৎক্ষণাৎ পরামর্শের জন্য উভয় রাষ্ট্রের যৌথ প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল অকিনলেককে জানালেন। অকিনলেক ছিলেন যুদ্ধবিশারদ। তিনি এই হঠকারী উন্মাদকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আদেশ রদ করালেন।[৪] তাই সেদিন সদ্যপ্রসূত পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা পেয়েছিল। কারণ কূটকৌশলী সমরবিশারদ ইংরেজ সৈনাধ্যক্ষরা বুঝেছিলেন যে, পার্বত্য যুদ্ধে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ অত্যন্ত দুরূহ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনী যেভাবে মার দিতে দিতে সীমান্তের দিকে হানাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে,—এদের যদি পাকিস্তানের সঙ্গে ঘোষিত যুদ্ধের সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে সমভূমিতে পাকিস্তানকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এদের কয়েকদিন সময়ও লাগবেনা। তাদের সে হিসাব ও দূরদর্শিতা ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধে পুরো-পুরি মিলে গেছল; কিন্তু ভারত সরকার সে সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি—তার বিশ্লেষণ আমি 'ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি' অধ্যায়ে দিয়েছি। সুতরাং ঐ যুদ্ধযাত্রার আদেশ বাতিল করিয়ে তিনি পাকিস্তানের অস্তিত্বকে রক্ষা করেছিলেন। আবার এদিকে আর এক সেনাপতি ভারতের দুষ্টগ্রহ লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেহেরুকে পরামর্শ দিলেন কাশ্মীরের বিজয়ী সৈন্যদের থামিয়ে দিতে। এর পিছনের রহস্যও

আমি উক্ত অধ্যায়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেছি।

এদিকে সংবাদ পাওয়া গেল হানাদারেরা শ্রীনগরকে ও বিমানঘাঁটিটিকে সাঁড়াশী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সর্বনাশ! বিমানঘাঁটি চলে গেলে যে কিছুই থাকবে না। দিল্লীর সঙ্গে শ্রীনগরের একমাত্র যোগসূত্র এই বিমানঘাঁটি। সেটি যদি শত্রুকবলিত হয় তাহলে ভরাডুবির আর বাকি থাকবে না কিছু। শ্রীনগর থেকে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিমানঘাঁটিটি রক্ষা করার জন্য কুমায়ুন রেজিমেন্টের চতুর্থ ব্যাটেলিয়ানকে পাঠানো হল মেজর সোমনাথ শর্মার অধীনে। এই দুর্ধর্ষ কুমায়ুন বাহিনীর কতিপয় সৈন্য ৭০০ হানাদারের ২০০ জনকে বিমানঘাঁটির নিকট বাদগামের যুদ্ধে সমনসদনে পাঠায়, তাদের মাত্র ১৫ জনের জীবনের বিনিময়ে। বাদগামের যুদ্ধ জয় হল। বিমান ঘাঁটি রক্ষা পেল—রক্ষা পেল কাশ্মীর। কিন্তু সে জয় এল এক সমুদ্র শোকের বিনিময়ে। ঐ যুদ্ধে সেনাপতি মেজর শর্মা বীরগতি লাভ করেন। এই বীর সেনানীকে ভারত সরকার সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান 'পরমবীর চক্রে'র মরণোত্তর সম্মানে ভূষিত করেন। বাদগামের যুদ্ধের পর শ্রীনগরের যুদ্ধেও হানাদারেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এবার তাদের পালানোর পালা। ভারতীয় সৈন্যরা তাদের কুকুর তাড়ানো করে নিয়ে যেতে শুরু করে। কাশ্মীরের তৃতীয় শহর বারামুলা পুনরুদ্ধারের পর হানাদারদের যে অত্যাচার ও বর্বরতার চিহ্ন ভারতীয় বাহিনী দেখেছে তা বর্ণনার অতীত। ব্রিগেডিয়ার এল. পি. সেন তাঁর রোজনামচায় লিখে গেছেন, "...The sight that greeted us in Baramula is one that no period of time can erase from the memory...every where one looked...there were signs of pillage, arson or wanton destruction...patients in the hospital had been slaughtered in their beds...out of a population of 14,000 at least 3000 had been slain. These included six Europeans and fourteen nuns. The women including the pregnant wife of a retired army officer had also been raped..."৫ শয়তানরা খ্রীস্টান পাদ্রী সন্ন্যাসিনীদেরও রেহাই দিল না। রেহাই পেল না হাসপাতালের রোগী ও গর্ভিনীরা। শয়তানরা পাদ্রীদের ও সন্ন্যাসিনীদেরও লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল। পাকিস্তানের ইংরাজ সেনাপতিরা যখন হানাদারদের 'আটকব্রীজ' পার করিয়ে কাশ্মীর বিজয়ের শুভযাত্রার সূচনা করেছিলেন, তখন ভাবতেও পারেননি যে শয়তানকে সহযোগিতা দিলে নিজের ক্ষতি আগে হয়। তাদের ভাবা উচিত ছিল দাবানলকে বাড়তে দিলে সে বাছ-বিচার করে দহন করবে না। শুধু হিন্দু বা খ্রীস্টানই নয়, দস্যুরা রেহাই দিল না নিজ ধর্মের পুরুষ ও নারীদেরও। তাদের ধন-সম্পত্তি তো লুট হলই, শেষে লুট হল নারীত্ব। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন মকবুল শেরোয়ানী। তাঁর অপরাধ তিনি মুসলমান হয়েও অসাম্প্রদায়িক।

জিন্না যখন বারামুলায় এসেছিলেন ভাষণ দিতে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচার করতে, তখন এই শেরোয়ানীই তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—'হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সবাই এক—সবাই মানুষ'। শেরোয়ানী ঠিকই বলেছিলেন। কারণ, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান ইত্যাদি সবাই এক—এ হিসাব যেমন মানুষের কাছে সত্য, তেমনই সত্য মানুষবেশী শয়তানদের কাছে। উভয় শ্রেণীই বাছ-বিচার করে না—এক শ্রেণী প্রেমের চোখে সব এক দেখেন—অন্য শ্রেণী শয়তানী চোখে এক দেখে। যেজন্য তাদের বর্বরতার কাছে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-শিখ—সব এক। তাদের একটিই পরিচয়, তারা শয়তান, তাদের একটিই জাতি—বর্বর, তাদের একটিই কর্ম—অত্যাচার, তাদের একটিই ধর্ম—হত্যা। সুতরাং শেরোয়ানীর উপর সেই রাগ এবার বর্বররা তুলল তার পিঠকে চাবুকে চাবুকে ক্ষত-বিক্ষত করে। শেষে তাকে প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হল। কাফেরটা উপযুক্ত শাস্তি পেল হিন্দু-মুসলমান এক জাতি বলার জন্য।

এই বর্বরতার ও নৃশংসতার কথা কি ভুলে গেছে সেদিনের কাশ্মীরবাসী যারা আজও বেঁচে আছে? নাকি সে বর্বরতার ইতিহাস কাশ্মীরের কোনও ইতিহাসের বইতে লেখা হয়নি,—যেজন্য কাশ্মীরের বর্তমান প্রজন্মের রাইফেলের নলগুলি পাকিস্তানের দিকে না ঘুরিয়ে ভারতের দিকে ঘুরিয়ে ধরেছে? কে শোনাবে এই সমস্ত ভ্রান্ত পথিকদের সেদিনের বীভৎস বর্বরতার কাহিনী,—যে বীভৎসতা ও বর্বরতা থেকে কি মুসলমান—কি হিন্দু—কি খ্রীস্টান—কি শিখ, কি সদ্যোজাত—কি অশীতিপর, কি কিশোরী—কি যুবতী কেউই রেহাই পায়নি? কিম্বা কে দেখাবে তাদের সত্যের পথ—ন্যায়ের পথ? কে চেনাবে তাদের শত্রু-মিত্র? যে ভারত চিরকাল আশ্রিতকে দিয়েছে আশ্রয়, ক্ষুধার্তকে যুগিয়েছে অন্ন, অসহায় ও আর্তকে দিয়েছে সেবা; সেই দেশকে আজ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে,—ঈর্ষা, হিংসা, বর্বরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে যার জন্ম। আর, কেবল ঐ রাষ্ট্রের মানুষ একই ধর্মাবলম্বী বলে কাশ্মীরের কিছু ভ্রান্ত যৌবন ভুল পথে যেতে চাইছে অসৎ শিক্ষা ও কুপরামর্শে।

এদিকে জম্মুর ফ্রন্টগুলির মধ্যে নৌশেরা এবং ঝানগড় ভারতীয় বাহিনীর দখলে এল। ঝানগড় দখল করতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে হারাতে হল ভারতমাতার আর একটি সুযোগ্য সন্তান বীর ব্রিগেডিয়ার ওসমানকে। তিনি স্বাধীন ভারতের তৃতীয় শহীদ সেনাপতি। ঝানগড় দখলে তাঁর বীরত্ব প্রবাদের মতো সে সময় মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। হানাদার কর্তৃক জম্মুর অধিকৃত স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখ্য নৌশেরা, ঝানগড়, কোটলী ও মীরপুর। এগুলির মধ্যে নৌশেরা ও ঝানগড় উদ্ধারের পর ভারতীয় বাহিনী এই প্রথম ভুল করে, মীরপুর উদ্ধার না করে কোটলী উদ্ধারে গিয়ে। ফলে মীরপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর নাগরিকরা চরম বিপদের মধ্যে পড়ে রইল। তার উপর মীরপুরের অবস্থান কাশ্মীর ও জম্মুর সঙ্গে পাকিস্তানের কয়েকটি বড় পাকা সড়কের সংযোগস্থলে। কাশ্মীর উপত্যকায়—

মজফ্‌ফরাবাদ এবং জম্মুতে মীরপুর ভারতীয় বাহিনীর দখলের বাইরে থাকায় স্থলপথে সৈন্য, অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহের সুযোগ রইল না। তবে জম্মুর অসাফল্য কাশ্মীর উপত্যকার সাফল্যে কিছুটা ঢাকা পড়ল। প্রথম বারামুলা—তারপর উরি। তারপর পুঞ্চ দখল করা হল ২০ নভেম্বর। পুঞ্চ দখল করার সময় বিমান সৈন্যাধ্যক্ষ মেহের সিং এবং প্রীতম সিং যে রণকৌশল প্রদর্শন করেছিলেন, তা বিমানযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতীয় বাহিনীর হাতে মার খেতে খেতে হানাদারেরা যখন সীমান্তের দিকে ছুটে চলছে,—কাশ্মীর উপত্যকার মজফ্‌ফরাবাদ ও ডোমেল এবং জম্মুর মীরপুর ও কোটলী উদ্ধার করলেই হানাদারদের জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে দেওয়া সম্ভব হবে এবং তারপর নজর দেওয়া হবে গিলগিটের দিকে ; ঠিক তখনই সেই দুষ্টগ্রহ মাউন্টব্যাটেনেরই পরামর্শে ১।১।৪৮ তারিখে জাতিসংঘে পাকিস্তানের নামে অভিযোগ দায়ের করে যে ভুল করলেন নেহেরু সরকার, তা আমি 'ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি' অধ্যায়ে সতথ্য বিশ্লেষণ করেছি। ভারতীয় বাহিনী ওখানে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে নজর দিলেন লাডাকের দিকে। হানাদার বাহিনী যদি শ্রীনগর-লাদাক সড়ক দখল করে নেয়, তাহলে লাডাকের রাজধানী 'লে'র সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই ভারতীয় বাহিনী জোজিলা গিরিবর্ত্ম বরাবর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। ঐ অভিযানে যোগ দিলেন গোর্খা, মারাঠা, জাঠ এবং জেনারেল কারিয়াপ্পার নিজস্ব রেজিমেন্ট। প্রায় ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় এই ভয়ংকর যুদ্ধে হানাদারেরা পযুর্দস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। লে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

এরপর যখন ভারতীয় বাহিনী নবউদ্যমে পাল্টা আঘাত করে (এতদিন চলছিল আত্মরক্ষা, এবার শুরু হবে আক্রমণ) জম্মু ও কাশ্মীরকে শত্রুমুক্ত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ঠিক তখন ১।১।৪৯ তারিখে অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘে আবেদনের ঠিক একবছর পরে সেই দুষ্টগ্রহ মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে নেহেরু সরকার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন। আর, তখনই কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল,—ঠিক যে যুদ্ধবিরতিতে পলাশীর আমবাগানে ভারতের কলঙ্কিত ইতিহাস রচিত হয়েছিল। তখনও পাকিস্তানের দখলে রয়ে গেল বাল্‌তিস্তান ও গিলগিটের সম্পূর্ণ অংশ, এবং কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মুর কিছু অংশ। আর সেই বেআইনী দখলীকৃত স্থানের সীমা বরাবর তৈরি হল ভাঙাগাঁয়ের মোড়ল রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় Line of Control (Loc) বা নিয়ন্ত্রণরেখা,—যে রেখার ওপারে রয়ে গেল পাকিস্তান অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত ভারত ভূখণ্ড জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ। এই যুদ্ধবিরতির আদেশ প্রদানের চাঞ্চল্যকর নেপথ্যকাহিনী আমি 'ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি ও ফলাফল' অধ্যায়ে সতথ্য বর্ণনা করেছি।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books / New Delhi 1993 / p 79.

২। Kashmir Politics and Imperialist Manoeuvres / N. N. Raina / Patriot Publishers / New Delhi 1988.

৩। The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books / New Delhi 1993 / p 85.

৪। ভারতে মাউন্টব্যাটেন / অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন / আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ / পৃ ২০৬।

৫। The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books / New Delhi 1993 / pp 93-94.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রসংঘ নাটক

বাংলায় বাবু কালচারের যুগে প্রভাবশালী ও বিত্তশালী বাবুদের একটা বৈঠকখানা থাকত (সেটা নাচঘর হতেও বাধা নেই)। সেই পবিত্র স্থানে বাবুর পরিচিত ও পরিজন (বেশীর ভাগই মোসায়েব) জমায়েত হয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি-রসিকতা-বাইজীনাচ ইত্যাদিসহ রসাসিক্ত হয়ে চিত্তবিনোদনে অপার আনন্দে সময় অতিবাহিত করতেন। ওই মজলিসে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বড়, ছোট মাঝারি বহুপ্রকার সমস্যার কথাই উঠত; কিন্তু সেটা উঠত বাবুদের ও তাদের মোসায়েবদের চিত্তবিনোদনের মাধুর্য বৃদ্ধির অঙ্গস্বরূপ ;—সেটা নিয়ে বৈঠকখানার সভ্যদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলার জন্যও নয়, কিম্বা দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপনের জন্যও নয়। শ্রীযুক্ত আমেরিকাবাবুরও অনুরূপ একটি বৈঠকখানা আছে, সে বৈঠকখানার নাম জাতিসংঘ। সেই বৈঠকখানার সভ্য বাবুরা বাংলার একদা বাবুদের মতো একই কায়দায় চিত্তবিনোদন করেন। এবম্বিধ বাবু কালচারে বোধ করি জাতি-কুলমান বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট মান ধার্য আছে; যার স্থান, কাল পাত্রের তফাৎ হলেও মজলিসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিতই থাকে। বাংলার বাবুদের মতোই এঁরা সমস্যা সমাধানের জন্য মজলিশে আসেন না; কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করতে কিম্বা জিইয়ে রাখতে এঁদের জুড়ি নেই—বৈঠকখানার শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজনে।

ভারতীয় বাহিনী যখন হানাদারদের কুকুর তাড়ানো করে সীমান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভারতের দুষ্টগ্রহ নেহেরু-বন্ধু ঐন্দ্রজালিক লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেহেরুকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ঐ মজলিশে গিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল চিন্তা করে তওবা তওবা বলতে বলতে যেখানের বর্বর সেখানে ফিরে যাবে; এই আশাতেই তো জাতিসংঘে ১।১।৪৮ তারিখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নেহেরু সরকার অভিযোগ জানিয়েছিলেন এবং ১।১।৪৯ তারিখে বিজয়ী সৈন্যদের থামিয়ে দিয়েছিলেন? সে আশা আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও পূরণ হয়েছে তো? সেই সহজ সরল আঞ্চলিক বিষয়টাকে ঐ মোড়লদের বৈঠকখানা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন জট পাকিয়ে দিয়েছে যে, ভারতকে অনেকখানি মূল্যই দিতে হবে। কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ বলরাজ পুরির ভাষায়,"···In any case, the loss of the POK territory was the price India had to pay for the inordinate delay in settling the question of accession."[১] গত ১।১।৪৮ তারিখে ভারত জাতিসংঘে অভিযোগ জানিয়েছিল, আর আজ আমি প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইতিবৃত্ত লিখছি, তার মধ্যে পশ্চিমী বাবুদের ঐ বৈঠকখানা ৫।১।৪৮ তারিখে

একটি ফুটখানেক নামের উপসংস্থা করে দিয়েছিল, যাকে বলা হয়—United Nations Commission for India and Pakistan বা UNCIP, ব্যস—ঐ পর্যন্তই। তারপর অর্ধশতাব্দী যাবৎ গঙ্গা ও সিন্ধু দিয়ে কত জলই বয়ে গেছে; কিন্তু সমস্যা হিমবাহের এতটুকুও গলে ঐ নদী দুটিতে পড়েনি,—বা বলতে পারা যায় গলে পড়তে দেওয়া হয়নি। আমি পূর্বেও বহু প্রসঙ্গেই বলেছি, ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতিই এজন্য মূলত দায়ী। শ্রীযুক্ত পুরিরই ভাষায়: "The Kashmir policy of the country is thus based on ignorance or only a partial knowledge of the facts and any debate on it generates more heat than light…"

গত ১।১।৪৮ তারিখে ভারত যখন জাতিসংঘে অভিযোগ দাখিল করেছিল, তার প্রায় দেড়মাস বাদে কোনও সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় তৎকালীন ভারতবাসীর মনে জাতিসংঘ সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি হচ্ছিল তা লর্ড মাউন্টব্যাটেন সাহেবেরই প্রেস সচিব মিঃ ক্যাম্বেল জনসনের রোজনামচা থেকে তুলে দিচ্ছি, "…কোন দেশের শান্তি বিঘ্নিত হবার উপক্রম হলে সেই বিঘ্নকে দূরীভূত করবার জন্য দায়িত্ব পালনের বিশেষ আদর্শ নিয়েই রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতের মূল অভিযোগ গ্রহণে যেভাবে বিলম্ব করছেন, তাতে শান্তিকেই বিঘ্নিত করা হয়েছে—এই ধারণাই এখানের লোকের মনে ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে ক্ষোভের একটা মূল কারণ হয়ে উঠেছে। এই থেকেই সন্দেহ বেড়ে উঠছে যে রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা হলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি সংস্থা। রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন প্রতিনিধি ওয়ারেন অস্টিন এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধি নোয়েল বেকার দুজনেই যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেই অভিমতই প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে এবং ভারতীয় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠছে। দুজনেরই বিরুদ্ধে নির্লজ্জ পাকিস্তানপ্রীতির অভিযোগ বেশ রূঢ়ভাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে। কেন তাঁরা পাকিস্তান দরদী হয়েছেন, তার নানারকম যুক্তিও দেখানো হচ্ছে, যেগুলি দুজনের কারও সম্মান বৃদ্ধি করছে না।" উক্ত রোজ-নামচার তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। কথাগুলি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যেমন সত্য ছিল, আজ ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ততোধিক সত্য বলে প্রমাণিত। অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের ভারতবাসীর চিন্তাধারা আজ ১৯৯৫-তে পৌঁছে একশত ভাগ সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

স্থূল জাগতিক ক্ষেত্রে কারণ ছাড়া কার্য হয় না। জাতিসংঘে আমেরিকা ও ইংলন্ডের প্রতিনিধিগণের সেদিনের (এবং আজও) উল্লিখিত নির্লজ্জ পাকিস্তান-প্রীতি তথা ভারতের স্বার্থবিরোধী আচরণ কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। কেন ব্রিটিশরা পাকিস্তান সৃষ্টিতে মদত দিয়েছিল, কেন পাকিস্তানস্থ ইংরেজ সেনা-পতিরা হানাদারদের বকলমে পাকিস্তানি সৈন্যদের কাশ্মীর অভিযানে বাধা প্রদান

করেনি, কেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরকে ভারতে যোগ দিতে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি (একথা পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মীর সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল না, সে ছিল ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য এবং কাশ্মীরস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অঙ্গুলি হেলনেই মূলত কাশ্মীরের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত ; নতুবা কাশ্মীর ভূখণ্ড গিলগিটে ব্রিটিশ সেনাপতি মেজর উইলিয়াম ব্রাউন ৪।১১।৪৭ তারিখে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করতে পারতেন না। বস্তুত কাশ্মীর ছিল ইংরেজের অধীনে অসহায় এক প্রায়-পরাধীন রাজ্য), কেন তিনি নেহেরুকে জাতিসংঘে অভিযোগ করতে ও বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীকে থামিয়ে দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কেন জাতিসংঘে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের হানাদারী কার্যকলাপকে নির্লজ্জ সমর্থন জানিয়েছিলেন ও জানাচ্ছেন, কেন উগ্রপন্থীরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর এবং পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর মধ্যস্থতা দাবী করছে" এবং কেনই বা পাকিস্তানের উঁচু পার্বত্য এলাকায় আমেরিকা ও পাক সৈন্যের যৌথ যুদ্ধ মহড়া চলছে,—এ সমস্ত বিষয়গুলি একই কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত।

আমার বিশ্লেষণমতে এর পশ্চাতে ছিল (এবং আছে) আন্তর্জাতিক রাজনীতির গূঢ় রহস্য। ধূর্ত ব্রিটিশ বুঝেছিল যে, ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পর তারা কোনদিন ব্রিটিশের তাঁবে থাকবে না এবং কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবে না। যে দেশকে তারা প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ শাসন ও শোষণ করছে,—সেদেশের মানসিকতা কোনদিন শোষণকারী দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবে না। বরং যাকে সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেই নবজাত পাকিস্তান তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত থাকবে ; যে কারণে তারা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির দাবি উপেক্ষা করেও মুসলিম লীগের আবদার বরাবর মেনে এসেছে এবং তাদেরই দাবিমূলে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে ; দ্বিতীয়ত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অধীনে দিলে তারা পাকিস্তানের বকলমে রাষ্ট্রগ্রন্থি কাশ্মীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। সুতরাং ব্রিটিশ এবং তাদের জীবনসাথী আমেরিকার সহানুভূতি ও সমর্থন নবজাত পাকিস্তানের দিকেই স্বাভাবিক নিয়মে যাবে। আর যেহেতু পাকিস্তানকে তাঁবে রাখা যাবে, সেহেতু কাশ্মীরকে তাদের নিয়ন্ত্রণে দেওয়ার আবশ্যকতা আছে (অধৈর্য জিন্না কাশ্মীরে হানাদার সৈন্য পাঠিয়ে ইংরেজের এই ছককে ওলটপালট করে দিয়েছিল ; তাই দোস্ত আমেরিকার সাহায্যে আজও সমানে সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে কাশ্মীরের বাকি অর্ধেকটাও পাকিস্তানভুক্ত করা যায়)। কারণ, ব্রিটিশরা গিলগিট থেকে (বা সামগ্রিকভাবে কাশ্মীর থেকে) সরে এলেও তখন পাকিস্তানের বকলমে সে ঐ রাষ্ট্রগ্রন্থি গিলগিটকে (রাশিয়া, চিন, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংযোগস্থল) নিয়ন্ত্রণ করতে তথা সাম্যবাদী ভাবধারার বিষাক্ত জীবাণুর অনুপ্রবেশ রুখতে পারবে। সেই উদ্দেশ্যেই বিশ্বাসঘাতক ইংরেজের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মেজর ব্রাউন সেদিন কাশ্মীর

মহারাজার সম্পত্তি গিলগিট এজেন্সিকে মানসপত্র পাকিস্তানকে উপহার দিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। আর আজ তো বৈঠকখানার বড়শরিক আমেরিকাবাবু কাশ্মীরের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, আর সেজন্যই সে এখন বারবার বলে চলেছে সমগ্র কাশ্মীর প্রশ্নটিই বিতর্কিত বিষয়। সুতরাং এই সমস্ত ঘটনার পারম্পর্য আগে বুঝতে হবে, তবেই রাষ্ট্রসংঘ নাটক বোঝা সম্ভব হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ৫।১।৪৮ তারিখে UNCIP গঠন করে জাতিসংঘ তার প্রথম পবিত্র কর্তব্য করেছিল। তারপর ৬।২।৪৮ তারিখে ঐ উপসংস্থার প্রথম বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হল দেখা যাক,—

(ক) কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে,

(খ) কাশ্মীরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হবে,

(গ) সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ তদারকিতে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা হবে।

সুধী পাঠকমণ্ডলী একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কি সূক্ষ্ম কৌশলে ভারতকে কাশ্মীর থেকে উৎখাত করে দেবার চক্রান্ত করা হয়েছিল। ভারত অবশ্য প্রতিবাদ করায় পরে সিদ্ধান্ত সংশোধিত হয়েছিল, সে কথায় পরে আসছি। এখন দেখা যাক, ঐ সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকলে কি ঘটতে পারত : (১) কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা (অর্ধেকটা ইতিমধ্যেই গেছে) পাকিস্তানের আগ্রাসী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে যেত, যেহেতু পাকিস্তানকেও তার হানাদার সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি (যারা হানাদার, তাদের সরে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল না, সরে যেতে হল তাদের, যারা আইনত ভূখণ্ডের মালিক)। (২) কাশ্মীরের অন্তর্বর্তী সরকারকে হানাদার বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করত এবং (৩) রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদের যোগসাজসে গণভোটের যে মহড়া হত, তার ফলাফল সহজেই অনুমেয়। যাহোক, অদূরদর্শী নেহেরু সরকারের বোধহয় তখনও সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়নি, তাই ওই সিদ্ধান্তের ফলাফল কি ঘটবে কিছুটা বুঝতে পেরে আপত্তি করায় ২১।৩।৪৮ তারিখে এক সংশোধিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভারত কাশ্মীর উপত্যকায় প্রয়োজনীয় সৈন্য রাখতে পারবে,—বাকি সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ঐ তারিখের পুনর্বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না যে, হানাদারী পাক সৈন্যদের (আমি হানাদারদের পাক সৈন্য বলতে বাধ্য ; কারণ তারা যদি সত্যই হানাদার হত, তাহলে যুদ্ধবিরতি চুক্তিটা পাকিস্তানের সঙ্গে হত না) অবস্থান কি হবে ; কিম্বা ভারতভুক্তি যদি আইনসিদ্ধ হয়, তাহলে কাশ্মীরে তথা ভারত ভূখণ্ডে পাকসৈন্যের অবস্থানই বা কিভাবে চিহ্নিত হবে ইত্যাদি। বাবুদের বৈঠকখানা অবশ্য এ সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেনি যে, যদি ভারতীয় সৈন্যদের থামিয়ে না দেওয়া

যায়, তাহলে তাদের মোড়লী করার তথা পিঠে ভাগের বাঁদরামি করার কারণ থাকবে না ;—তাদের সে চিন্তাধারা পূর্বেই সঞ্চারিত ছিল স্বাধীন ভারতের বিলাতি গভর্নর পাকিস্তান প্রেমিক যুদ্ধ বিশারদ লর্ড মাউন্টব্যাটেন নামক দুষ্ট গ্রহটির মধ্যে। তাই তিনি ভারতীয় সৈন্যদের থামিয়ে দিয়ে ১।১।৪৯ তারিখে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণার ব্যবস্থা করলেন। মহৎ ব্যক্তিরা নাকি একই রকম চিন্তা করেন ; ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ (যাঁরা ক্যাবিনেট মিশন ও মাউন্টব্যাটেনকে পাঠিয়েছিলেন ভারত ভাগ করে ভারতবাসীদের উদ্ধার করতে), রাষ্ট্রসংঘে ইংলন্ড ও আমেরিকার প্রতিনিধিবৃন্দ, এবং স্বাধীন ভারতের ব্রিটিশ নাগরিক বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন—প্রভৃতি সকলেই গ্রেট মেন অর্থাৎ মহান ব্যক্তি। এঁদের চিন্তাধারা তাই একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। মহাপুরুষ বচন মিথ্যা হবার নয়। কেবল সেটা ধরতেই যা পারেননি তৎকালীন ভারতের বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দ। সেজন্য যুদ্ধ করল যেখানে হানাদারেরা (পাকিস্তান কোনদিন স্বীকার করেনি, যে কাশ্মীরে যুদ্ধ করেছে), নেতারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে গেলেন পাকিস্তানের সঙ্গে এবং সেই মোড়ল বাবুদেরই মধ্যস্থতায়। তারিখ ২৭শে জুলাই ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ, স্থান করাচী !! ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করলেন এস. এম শ্রীনাগেশ, পাকিস্তানের পক্ষে মিঃ জে. কাউথর্ন এবং মোড়লদের পক্ষে হার্নাণ্ডো স্যাম্পার এম. ডেলভো। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের মৃত্যু হয়েছিল ১।১।৪৯ তারিখে, ঐ তারিখে তার শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকল এবং বাবুরাও নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। আইনত, ন্যায়ত, ধর্মত যে ভূখণ্ডের এক ইঞ্চিও পেতে যে দেশ হকদার নয় সে আজ তার খুশীমতো দর হাঁকছে। আর সহস্র সহস্র বৎসর ধরে যার অঙ্গরাজ্য—যার সঙ্গে নাড়ির টান, যার পক্ষে আইনের অনুশাসন, সেই ভারতের হাত থেকে চলে যেতে বসেছে। আজকের ৯০ কোটি ভারতবাসী কাকে এজন্য দোষ দেবে—ঈশ্বরকে, নাকি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নির্বুদ্ধিতা, অদূরদর্শিতা ও অপদার্থতাকে ? সুতরাং এর পরও কোনও বেওকুফ বলতে পারবে যে, জাতিসংঘ ভারতের জন্য কিছু করেনি ? তারা যুদ্ধ থামিয়েছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়েছে, গত ৪৭ বৎসর ধরে সেই পবিত্র নিয়ন্ত্রণরেখা বা LOC-তে বসে পর্যবেক্ষণ করেছে যেন একটি ভারতীয় সৈন্যও অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে পড়তে না পারে ; কিন্তু হাজার হাজার পাকিস্তানী নাগরিক ও সন্ত্রাসবাদীরা যাতে নিরাপদে ভারতে ঢুকে পড়তে পারে ; এবং সিমলা চুক্তির পর বলতে পেরেছে,—ওটা ওদের দুদেশের ব্যাপার। সুতরাং রাষ্ট্রসংঘ ভারতের জন্য করেনি কি ?

পূর্ব কাহিনীতে ফিরে আসি। রাষ্ট্রসংঘ একটি আদালত বিশেষ। বিবাদ নিষ্পত্তি করা তাদের বিবিধ কাজের অন্যতম। তার গঠনতন্ত্র আছে, আইন-কানুন আছে, দুর্বল দেশের উপর বড় মোড়লের ইঙ্গিতে বোমা ফেলার জন্য সৈন্য-বাহিনী আছে—ইত্যাদি অনেক বিভাগ আছে। যেখানে আমাদের মোহগ্রস্ত নেতারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন Chapter VII-এর স্থলে

Chapter VI অনুযায়ী, যেখানে কেবল আপোসমূলে নিষ্পত্তির বিধান দেওয়া আছে। সুতরাং ঐ ধারায় তাকে 'আগ্রাসী' আখ্যা দিয়ে উৎখাত করা যায় না। কি মনোমুগ্ধকর নির্বুদ্ধিতা নেতাদের ! কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ বলরাজ পুরির ভাষায়, "...This was near as any UN representative could come round to supporting any Indian demand to declare Pakistan the aggressor. The Security Council did not make a formal declaration to that effect because its members argued that India had sought UN intervention under Chapter VI of the chapter for settlement of the dispute, and not under chapter VII for evacuation of an aggressor."[৫] অনুরূপ ক্ষেত্রে মামলার আর্জিতে ভারতের যে কোন দেওয়ানী আদালতের নবিশ আইনজ্ঞও অনুরূপ ভুল করতেন না। ৬।২।৪৮ তারিখে UNCIP জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তাতে না দেওয়া ছিল সময়সীমা, না করা হয়েছিল বাধ্য পাকিস্তানকে তা মেনে নিতে। কারণ, সে সময় গণভোট নিশ্চিত ভারতের পক্ষে যেত। তাই ধূর্ত পাকিস্তানী নেতারা বাহানা দেখিয়ে তা বিলম্বিত করেছে ততদিন, যতদিন না তাদের গোয়েন্দা বিভাগ কাশ্মীরীদের একটা অংশকে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন করে তৈরি করতে পেরেছে। একথা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাষ্ট্রপ্রধান সর্দার ইব্রাহিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ১৯৯১ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ঘোষণা করেন।[৬] সুতরাং পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান যখন UNCIP-এর গৃহীত সিদ্ধান্তকে এড়িয়ে চলছিল, তখনও কি তাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের কিছু করার ছিল না ? ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান যখন বিনা প্ররোচনায় ছাম্বের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল এবং ভারত পাল্টা আঘাত হেনে লাহোর ও শিয়ালকোট অবরোধ করেছিল, তখন চাপ দেওয়া হয়েছিল তা তুলে নিতে ; অথচ পাকিস্তানের কাশ্মীরে জবরদখলের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হল না। ভারত যে অন্যের রাষ্ট্র জয় করে ছেড়ে দিয়ে, নিজের রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অন্যের কাছে বিলি করে দিয়ে ইত্যাদি অনেক প্রকারের নির্বুদ্ধিতা গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ দেখিয়ে প্রেম বিতরণ করে এল, তাতে তার জনসাধারণের কতটুকু বেদনা সে লাঘব করতে পেরেছে ? শান্তি ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেমের জন্য কোন নেতার ভাগ্যে নোবেল পুরস্কারটাও তো মিলল না ? পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান এবং কাশ্মীরের কোটি কোটি ছিন্নমূল হতভাগ্যদের জন্য একফোঁটা চোখের জল না দেখা গেছে বৈঠকখানার বাবুদের চোখে, না দেখা গেছে ভারতীয় নেতাদের চোখে ; বরং সেই হতভাগ্যদের নিয়ে নোংরা ও ইতর রাজনীতির খেলা দেখানো হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। আর বীরভোগ্যা বসুন্ধরার নীতি যারা অনুসরণ করেছে, তারাই আজ জয়ী হতে চলেছে। দয়া, অনুগ্রহ ইত্যাদি দিয়ে কেউ কাউকে ভূখণ্ড এনে দিতে পারবে না,—এ কথাটা যুদ্ধবিরতি

করার সময় ভারতীয় নেতাদের বোঝা উচিত ছিল। আজ তাদের ডজন ডজন ভ্রান্তির কি মূল্য দেশকে দিতে হবে কে বলবেন ?

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে Chapter VI অনুযায়ী আবেদনে ভারত যে মানবতা ও মহত্ত্ব দেখিয়েছে, এবার তার কথায় আসি। উক্ত আবেদনের ১৩ নং দফার কিছু অংশ আমি তুলে দিচ্ছি, "...Since the aid which the invaders are receiving from Pakistan is an act of aggression against India, the Government of India are entitled, under International Law, to send their armed forces across Pakistan territory for dealing effectively with the invaders. However, as such action might involve armed conflict with Pakistan, the Government of India, ever anxious to proceed according to the principles and aims of the United Nations, desire to report the situation to the Security Council under article 35 of the Charter..." অর্থাৎ ভারত ইচ্ছা করলে আন্তর্জাতিক আইনের সুযোগে পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে সৈন্য পরিচালনা করে হানাদারদের ধ্বংস করতে পারত ; কিন্তু সে তা না করে নিরাপত্তা পরিষদকে শ্রদ্ধা জানাবার সদিচ্ছায় ধর্মবিতারদের সবিবেচনার উপর নির্ভর করে এই আবেদন দাখিল করে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে ! কি পেয়েছে ভারত ঐ তেল মাখানো আবেদন পত্রের মহত্ত্ব দেখিয়ে ! জাতিসংঘ বিনিময়ে কণামাত্র ন্যায় ও নীতির প্রতি কি শ্রদ্ধা দেখিয়েছে ! তাদের কোনও মোড়ল কি আজ পর্যন্ত বলেছে যে, পাকিস্তান আগ্রাসী ! তাহলে ঐ রূপ একটি অকর্মণ্য, ও পক্ষপাতদুষ্ট সংঘের সভ্য থেকে লাভ কি ৯০ কোটির দেশ ভারতবর্ষের ? এবং কি বিপুল আশ্চর্যের কথা, ঐ দফার আবেদনে মোড়লদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন রক্তলোলুপ নেকড়েকে হরিণশাবক খেতে নিষেধ করে দেয়। তার কাছে কি আবেদন রাখা হল ?—

"(1) To prevent Pakistan Government personnel, military and civil from participating or assisting in the invasion of Jammu and Kashmir State.

(2) To call upon other Pakistan nationals to desist from taking any part in the fighting in Jammu and Kashmir State ;

(3) To deny the invaders : (a) access to any use of its territory for operations against Kashmir, (b) military and other supplies, (c) all other kinds of aid that might tend to prolong the present struggle...."

চোর কোনদিন ধর্মের কাহিনী শুনেছে ? আমার জানা নেই যে, ওই আবেদন-

পত্র পেয়ে নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানকে নিরস্ত করতে কোনপ্রকার আদেশ নির্দেশ দিয়েছিল কিনা। বরঞ্চ যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল, তা হল—ভারতকেই তার সৈন্যদের তার ভূখণ্ড কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নিতে হবে। কি বিচিত্র এই রাজনীতির খেলা !

১৯৫৪ সালে পাকিস্তান যখন আমেরিকার সঙ্গে যৌথ সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখনই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞরা বুঝতে পেরেছিলেন—কি ঘটতে চলেছে। সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে ভারত কিছুটা রেহাই পেল, যখন ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন কাশ্মীর ভ্রমণ করে জাতিসংঘে গণভোটের প্রস্তাবের উপর ভেটো প্রয়োগ করলেন। বিভিন্ন সামরিক জোটের সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তিগুলি ভারতকে সোভিয়েতের প্রতি আরও ঝুঁকে পড়তে বাধ্য করে এবং সোভিয়েতের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করতে হয়। অর্থাৎ একটা সামান্য আঞ্চলিক বিষয় মোড়লদের কূটকৌশলে কিভাবে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক আকার ধারণ করল—তা সত্যই বিস্ময়কর। শ্রীযুক্ত কাদিয়ানের ভাষায়, "...Meanwhile Mountbatten continued to influence Nehru's judgement. On his advice on 1 January, 1948, the Indians Lodged a complaint with the United Nations Organisation; a regional problem thereby became truly International..."[৭] এদিকে সোভিয়েতের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব সোভিয়েত শত্রু চিনকে ভাবিয়ে তুলল। সে তখন পঞ্চতন্ত্রের নীতি প্রয়োগ করে শত্রুর শত্রুকে মিত্র করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিন। কোথায় রইল তার কমুনিজমের গালভরা নীতি, কোথায় রইল তার হিন্দী-চিনি ভাই-ভাই-এর ধাপ্পাবাজি বুলি। পাকিস্তানও তাই দরাজ হাতে অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে রাস্তা করার জন্য চিনকে ক্ষমতা দিল। চিন ভারতেরই ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে ভারতেরই জবরদখলকৃত ভূখণ্ড আকসাই চিন পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করে নিল। অর্থাৎ কাশ্মীর রাজ্য যেন বেওয়ারিশ মাল, যে যেমন পারে লুটে নিলেই হল। এ বিষয়ে আমদানীকৃত সাম্যবাদী ভাবধারার একনিষ্ঠ দেশসেবকরা কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য করা প্রয়োজন মনে করেননি। অন্য কোনও দেশও কিছু বলতে সাহস দেখায়নি; কারণ চিন সেই বিখ্যাত বৈঠকখানার অন্যতম মোড়ল। সুতরাং কাশ্মীর সমস্যা সমাধান না হওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন ভারতীয় নেতাদের নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতা মূল ভূমিকায় থাকলেও, বাবুদের বৈঠকখানার স্থায়ী সভ্য বাবুদের সদিচ্ছাও অনেকখানি দায়ী। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ায় একঘরে ভারত আজ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে বড় মোড়লদের কতখানি তৈল মর্দন করবে, সেটাই এখন দেখার।

প্রসঙ্গ পঞ্জী

১. Kashmir towards Insurgency / Balraj Puri / Orient Longman 1993 / p 17
২. ibid / p 3
৩. ভারতে মাউন্টব্যাটেন / অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন / আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী / বাং ১৩৫৯ / পৃ ২৭৮
৪. The Statesman / 22. 10. 93 / p 1
৫. Kashmir towards Insurgency / Balraj Puri / Orient Longman 1993 / pp 17-18
৬. ibid / p 18
৭. The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books 1992 / p 96

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন

কাশ্মীর আজ অগ্নিগর্ভা। এ পরিস্থিতি সৃষ্টির বেশির ভাগ কৃতিত্বই পাক সরকার তথা পাক গোয়েন্দাচক্র ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স সংক্ষেপে আই. এস. আই-এর প্রাপ্য। তার ব্যর্থতার বেশিটাই অদূরদর্শী ভারত সরকারের, যে স্বয়ম্বরাকে পেয়েও আজ হারাতে চলেছে [নির্বুদ্ধিতার জন্য অর্ধেকটা তো আগেই হারিয়েছে]। আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়ে অতি তিক্ততার সঙ্গে মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে, স্নায়বিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে পাকিস্তানী বুদ্ধিমত্তার কাছে ভারতীয় নেতৃত্ব তথা সরকারের বারে বারে পরাজয় ঘটেছে। এ অযোগ্যতা, অবিমৃষ্যকারিতা এবং অদূরদর্শিতার ক্ষমা নেই। আজ কাশ্মীরের বেশ কিছু সংখ্যক জনগণ ভারত সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে বর্তমানে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছে এর পশ্চাদপট খুবই ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কিন্তু অনধিগম্য নয়। হানাদারের বকলমে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করায় যে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে ভারতে যোগদানের জন্য তাদের দেশের মহারাজাকে কাতর অনুনয় এবং গ্রহণকারী দেশ ভারতকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল, সেই জনসাধারণের বর্তমান প্রজন্মের কিছু অংশ কেন ভারতের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে চাইছে এর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কি আমাদের ক্ষমতাসীন নেতারা করেছেন কোনদিন ? এ রক্তদুষ্ট তো একদিনে সৃষ্ট হয়নি,—সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর যাবৎ ভারত সরকারের একটার পর একটা ভ্রান্তিবিলাসের ফলে (ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি ও তার ফলাফল অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হতে পেরেছে, বস্তুত ভারত সরকারই এই ব্যাধি সৃষ্টি হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত বলরাজ পুরি যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "The Kashmir policy of the country is thus based on ignorance or only a partial knowledge of the facts and any debate on it generates more heat than light."[১]

কাশ্মীরের সামগ্রিক আন্দোলনকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়,—(ক) গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন, (খ) অগতান্ত্রিক সশস্ত্র আন্দোলন সম্পর্কে আমি পরবর্তী পৃথক অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের পশ্চাদপট, গতি-প্রকৃতি ও বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের অব্যবহিত পূর্বে কাশ্মীরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তা প্রায় নিয়মতান্ত্রিক ধাঁচেরই ছিল। রাজ্যের বৃহত্তম দল 'ন্যাশন্যাল

কনফারেন্স'-এর নেতা ছিলেন শেখ আবদুল্লা। সেই দলসহ কাশ্মীরের সমগ্র জনগণই ভারতভুক্তির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেইমতো তাদের মহারাজা ভারত যোগদানও করেছিলেন। ভারতের বীর সৈনিকরা যখন হানাদারদের বকলমে পাকিস্তানী সৈন্যদের কুকুর তাড়ানো করে নিয়ে যাচ্ছিলেন সীমান্তের দিকে, তখন কাশ্মীরী জনগণের উল্লাসের সীমা ছিল না। সেই একান্ত অনুকূল পরিবেশকে আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা কি অপূর্ব দক্ষতায় তিল তিল করে দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে নিয়ে গেছেন, তার নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণ 'ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি ও ফলাফল' অধ্যায়ে করেছি। তাঁরা না পেরেছেন আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কূটকৌশলের পরিচয় দিতে, না পেরেছেন অভ্যন্তরীণ রঙ্গমঞ্চের কুশীলবদের দিয়ে সঠিকভাবে নাটক মঞ্চস্থ করতে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে রাষ্ট্রনেতাদের দ্বিধা ও জড়তাপূর্ণ চিন্তা।

১৯৪৭-এর শেষের দিকে শেখ আবদুল্লা যখন কাশ্মীরে গণভোটের অপ্রয়োজনীয়তার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করলেন, তখন নেহেরু তার প্রতিবাদ না ক'রে বরং সেটাকে issue করে ঘোষণা করলে পারতেন—কাশ্মীরের নেতৃবৃন্দ তথা জনগণ যখন গণভোটের অপ্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করছেন, তখন ভারতের আর বাধ্যবাধকতা থাকল না,—অতএব ও প্রসঙ্গের এখানেই ইতি করা হল। এমনকি ভারতের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে United Nations Commision for India and Pakistan বা UNCIP সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ তদারকিতে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের একতরফা সিদ্ধান্ত হয়, তখনও প্রতিবাদ করা হল না যে,—দেশের জনগণ যেখানে গণভোট চাইছেন না, সেখানে মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ কেন? এমনকি ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে শেখ আবদুল্লার প্রধানমন্ত্রীত্বে কাশ্মীরের শাসনভার ন্যাশন্যাল কনফারেন্স দলের হাতে গেল, তখনও রাষ্ট্রসংঘের গণভোটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাশ্মীরের মন্ত্রীসভার সাহায্যে রাষ্ট্রসংঘ থেকে আবেদন প্রত্যাহার করে নিলেও পরিস্থিতি ভারতের অনুকূলে যেতে পারত; কারণ তখনও যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়নি, সুতরাং আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে এগিয়ে যাবার আদেশ অনায়াসে দেওয়া যেত।

এরপর ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। তাতে শেখ আবদুল্লার ন্যাশন্যাল কনফারেন্স দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। বলা বাহুল্য শেখ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হলেন। কাশ্মীর Constituent Assembly কাশ্মীর থেকে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে কিছু গঠনমূলক কাজ ও ভূমিসংস্কারের কর্মসূচী হাতে নিলেন। কিন্তু মাসছয়েক পরেই শেখ আবদুল্লা সাহেবের সুর বদলাতে থাকে। তিনি স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন এবং ১৯৫২ সালের এপ্রিলের অধিবেশনে ভারতীয় সংবিধানের কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন

তুলে বেশ কিছুটা জল ঘোলা করলেন। নেহেরু সাহেব আবার ভুল করলেন। শেখ আবদুল্লা তাঁর প্রাণের বন্ধু। তিনি তাঁকে দিল্লীতে ডেকে এনে ৩৭০ ধারার স্থায়ীকরণে তাঁর সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করলেন সেই কালাচুক্তিই ভারতের অন্য অংশের জনগণের সংগে কাশ্মীরের জনগণের একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টির সুযোগ করে দিল। আমি মনে করি, কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঐ নেহেরু-আবদুল্লা চুক্তির ফলে ভিন্নপথে মোড় নিতে শুরু করে। কাশ্মীরের জনগণের মনস্তত্ব যদি অপরিণামদর্শী নেহেরু সরকার বুঝতেন, তাহলে আবদুল্লার সংগে ঐ চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়ে তিনি প্রথম সুযোগেই ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরকে অন্যান্য রাজ্যের সমপর্যায়ে নিয়ে আসতেন। নেহেরু-আবদুল্লার ঐ আত্মঘাতী চুক্তির ফলে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল এবং বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখার্জীর পুত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাশ্মীর জেলে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যু আজও রহস্যে ঢাকা রয়েছে। শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধে সহকারী প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ আন্দোলন করে ক্ষমতা দখল করে প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং শেখ আবদুল্লাকে জনস্বার্থবিরোধী আন্দোলন করার জন্য জেলে পাঠালেন। তারিখটা সেদিন ছিল ৯ই আগস্ট ১৯৫৩ সাল।

সুধী পাঠকমণ্ডলী,—অন্তর্ভুক্তির পর এ পর্যন্ত কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ে আপনাদের কি মনে হচ্ছে না যে, শেখ আবদুল্লার ভারতবিরোধী মনোভাবকে তৎকালীন কাশ্মীরী জনগণও সমর্থন করেননি ? নতুবা প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকারে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে জেলে পাঠানো সম্ভব হত না। এর অর্থ কি ? তখনও কাশ্মীরের জনগণ স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখেনি। বরং ভারতের সংগে যুক্ত থাকা অধিকতর মংগলজনক হবে বিবেচনায় বিচ্ছিন্নতা-কামী আবদুল্লাকে মন্ত্রীত্ব হারিয়ে জেলে যেতে হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন এতে ভারত সরকারের কলকাঠি আছে। আমি তা মনে করি না এজন্য যে, কাশ্মীরের প্রায়-স্বাধীন Constituent Assembly-র উপর ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং নেহেরু যত শক্তিশালীই হোন, জনমতের বিরুদ্ধে আবদুল্লাকে জেলে পাঠাতে পারতেন না বা সুদীর্ঘকাল তাকে জেলে রাখতে পারতেন না। জনগণ শেখ আবদুল্লার সংগে ছিল কোন্ সময়ে ? যখন ভারত-ভুক্তির অব্যবহিত পরেই জেনেছিল আবদুল্লা ভারতের পক্ষে ততদিন এবং ভারতের ভ্রান্তনীতির ফলে যখন জনমত বিরুদ্ধে গেল, তারপর থেকে আবদুল্লার মৃত্যু পর্যন্ত। অর্থাৎ যে সময় পর্যন্ত কাশ্মীরের জনমত ভারতের পক্ষে ছিল, ততদিন কোনও কাশ্মীরী নেতার ভারতবিরোধী মনোভাবকে তাঁরা মেনে নেননি। শেখ সাহেব কারাগারে বসে চিন্তা করতে থাকলেন, তিনি স্বাধীন কাশ্মীরের দাবিতে জেলে গেলেন, আর যাঁরা ভারতের সংগে যুক্ত থাকতে চাইলেন তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রইলেন,—শেখ সাহেবের এই মনস্তত্বের সঠিক খবর পাক

গোয়েন্দাচক্র রেখেছিল এবং তারা ঐ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হল। অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র বদলাতে শুরু হল।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে এই প্রথম ভারতের পক্ষে একটি প্লাস পয়েন্ট পাওয়া গেল,—তা হল কাশ্মীর Constituent Assembly ভারতভুক্তির বৈধতার চূড়ান্ত অনুমোদন দিলেন। অর্থাৎ পাকাপোক্তভাবে সরকারী সিদ্ধান্ত তথা কাশ্মীরী জনগণের রায় ভারতভুক্তির পক্ষে এল। আমি যতদূর জানি কাশ্মীর সরকারের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে কোনপ্রকার গণবিক্ষোভ হয়নি। এটা কি যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না যে কাশ্মীরী জনগণ ভারতেই থাকতে চায়,—অন্তত ঐ ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত! এর পরও ১৯৫৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর শ্রীনগরে ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন যখন ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের জনগণ তাদের চূড়ান্ত মতামত জানিয়েছে তারা ভারতেই থাকতেই চায়, সে সুযোগকে ঠিক-মতো কাজে লাগানো হয়নি।

সম্ভবত ঐ প্লাস পয়েন্টের ভিত্তিতে নেহেরু সরকার কিঞ্চিৎ সাহস দেখিয়ে সংবিধানের ৭ম সংশোধনীতে 'B' States-এর অবলুপ্তি করে Article I-এর অন্তর্ভুক্ত করে কাশ্মীরকে অন্যান্য রাজ্যের সমপর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন ৩৭০ ধারা বলবৎ রেখেই। এটা খানিকটা হাঁসজারু বা বকচ্ছপ গোছের ব্যাপার হয়েছিল। তবে নেহেরু সরকারের এক এবং অদ্বিতীয় প্লাস পয়েন্ট ছিল ৩০।১০।৫৬ তারিখের ঐ সংশোধনীতে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ঘোষণা। এছাড়া নেহেরু সরকার কাশ্মীরকে ভারতে রাখার জন্য আর কোনরূপ নম্বরই পেতে হকদার নন।

ইতিমধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত শেখ আবদুল্লা ১৯৫৮ সাল নাগাদ তাঁর কেরামতি পুন-রায় দেখাতে শুরু করলেন। তিনি কারান্তরাল থেকে বের হয়ে এসেই শুরু করে দিলেন গণভোটের দাবীতে সারা উপত্যকা জুড়ে আন্দোলন (অথচ কয়েক বছর পূর্বে তিনিই বলেছিলেন গণভোটের প্রয়োজন নেই এবং তিনিই জনপ্রতিনিধি হিসাবে ভারতভুক্তির আর্জি জানিয়েছিলেন ভারতের কাছে!)। ইতিমধ্যে পাকিস্তান গোয়েন্দা চক্র কিছু কিছু নাগরিকদের বোঝাতে শুরু করেছে এবং অর্থানুকূল্যে সফলও হয়েছে যে, পাকিস্তান-ই একমাত্র বেহেস্তের রাস্তা। কাফের-দের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে দোজখ ছাড়া তোমাদের গতি নাই। পাক গোয়েন্দা চক্রের চিন্তাধারার সঙ্গে শেখ আবদুল্লার চিন্তাধারার বোলআনাই মিল দেখে তখন কেউ কেউ বলতে শুরু করেছিলেন যে, আবদুল্লা পাকিস্তানের চর। ফলে ভারতের টনক নড়ে। আবার তাঁকে কয়েদে পাঠানো হয়। মাঝে ১৯৬২ সালে ভারত চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হওয়ায় কাশ্মীর বিষয়ে স্বাভাবিক ভাঁটা পড়ে। ইং ১১।১০।৬৩ তারিখে বক্সী গোলাম মহম্মদের প্রধানমন্ত্রীত্বের অবসানে সাম সুদ্দিন স্থলাভিষিক্ত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাক চরচক্রের একটি বাহাদুরীতে সামসুদ্দিনের পতন হয়, এবং গোলাম মহম্মদ সাদিক প্রধান-

মন্ত্রী হন। সে বাহাদুরী হচ্ছে ইং ২৬।১২।৬৩ তারিখে হজরতবাল মসজিদ থেকে হজরতবাল অপহরণ। প্রশাসনিক তরফে কঠোরতা প্রদর্শনের ফলে হজরতবাল যথাস্থানে ফিরে আসে। এই হজরতবাল অপহরণের পশ্চাতে পাক গোয়েন্দা চক্রের হাত ছিল—এ বিষয়ে তৎকালীন প্রায় প্রতিটি পত্র-পত্রিকাই কঠোরভাবে সরকারকে জানিয়েছিল এবং কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের নেতা ও পার্লামেন্ট সদস্য সৈয়দ নাজির হোসেন সামগানি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, এটা কাশ্মীরে গোলমাল সৃষ্টি করার এবং অঙ্গরাজ্যরূপে যাতে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি-কে কাশ্মীরী জনগণ না মেনে নেয় সেই উদ্দেশ্যে একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত।

ঐ হজরতবাল অপহরণকে কেন্দ্র করে সারা উপত্যকা আন্দোলনে ও বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। ফলে ভারত সরকারের অপদার্থতা কাশ্মীরী জনগণের কাছে আর গোপন থাকে না। তাদের আস্থাতে সেই প্রথম ফাটল ধরাতে সক্ষম হল পাক গোয়েন্দা চক্র। আর আমাদের কুম্ভকর্ণরা, যাদের নাসারন্ধ্রে কেবলই বিশুদ্ধ সরষের তৈল প্রদান করতে হয়, তারা ওটাকে 'অমৃতং বালভাষিতম্' মনে করে পাশ্ব' পরিবর্তন করে নিদ্রার মধ্যে কাশ্মীরের তখত-ই-তাউসের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন। সুতরাং সেই প্রথম কাশ্মীরী জনগণ ভারত সরকার এবং কাশ্মীরের সরকার উভয়কেই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহের দিকে কাশ্মীরকে নিয়ে যাবার জন্য পাক গোয়েন্দা চক্র যে একটি বীজ পুঁতলেন, এ রণকৌশল ধরবার মতো ঘিলু ভারতীয় নেতাদের মাথায় ছিল না। থাকলে, নৈঋতের কাল-বৈশাখী মেঘকে শরতের মেঘ বলে ভ্রম হত না।

১৯৬৪ সালের এপ্রিল নাগাদ গোলাম মহম্মদ সাদিকের প্রধানমন্ত্রীত্বকালীন শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দেবার পরই শেখ সাহেবকে কেন যে পাকিস্তানে পাঠাবার প্রয়োজন হয়েছিল, তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। তাঁকে মঞ্জুর করা হল যে পাশ-পোর্ট, সে পাশপোর্টে তাঁর নাগরিকত্বের পরিচয় দেওয়া হল তিনি 'কাশ্মীরী মুসলমান'। অর্থাৎ তিনি ভারতীয় নাগরিক নন। তিনি বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার শুরু করে দিলেন কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার খেলা। ইতিমধ্যে ২৭।৫।৬৪ তারিখে নেহেরুজীর মৃত্যু হলে বেঁটেখাটো কিন্তু লৌহকঠিন মানুষ লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হলেন। নেহেরু মারা গেছেন, পাক গোয়েন্দা চক্র কাশ্মীরের জনগণকে অনেকটাই বিরূপ করে তুলতে পেরেছে। এবং দোস্ত আমেরিকা অনেক ট্যাঙ্কসহ অন্যান্য মারণাস্ত্র দিয়েছে। সুতরাং বিদ্রোহ সৃষ্টি করে কাশ্মীর পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে এই সুযোগ। ভারত আক্রমণ করা মাত্রই অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাক সেনাবাহিনী দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন দখল করে ফেলতে পারবে। এই চিন্তায় তারা ১।৯।৬৫ তারিখে ছাম্বের কাছে ভারত ভূখণ্ডে বিনা প্ররোচনায় ঢুকে পড়ে। সেদিনও জিন্না সাহেব একই ভাবনা নিয়ে আবেটাবাদে বসেছিলেন কাশ্মীরের সিংহাসনের আশায়। কিন্তু সে-

দিনও যেমন, আজও তেমনি ভারতীয় বাহিনী সাবেকী অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই একি খেলা দেখাতে শুরু করল। দিল্লী তো দূরে অস্তু, এদিকে লাহোর ও শিয়ালকোট যে যায়। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সাহেব হাতে-পায়ে ডজনখানেক ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে ধর্না দিলেন। ফলে ২৩।৯।৬৫ তারিখে যুদ্ধবিরতি হল এবং তাশখন্দে ১০।৬।৬৬ তারিখে 'তাশখন্দ চুক্তি' হল। ভারতের ঐ যুদ্ধে জয় হল, কিন্তু তাশখন্দ থেকে প্লেন নিয়ে এল কফিনে ঢাকা ছোটখাটো দৃঢ় মানুষটির মৃতদেহকে, এ ঘটনা সকলেরই জানা। ভারতের তখন বড়ই দুঃসময়। এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন নেহেরুতনয়া দৃঢ়চেতা ইন্দিরা গান্ধী, যিনি অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপোস করেননি তাঁর বাবার মতো। কিন্তু তাঁরও পররাষ্ট্র নীতিতে দুর্বলতা ছিল বা কূটনৈতিক ত্রুটি ছিল ; যা আমরা দেখেছি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিজয়ী সৈন্যদের শূন্য হাতে ফিরিয়ে আনার সময়।

এরপর কাশ্মীরের রাজনীতিতে দ্রুত পট পরিবর্তন হতে শুরু করল। আবদুল্লার নেতৃত্বে জম্মু-কাশ্মীর নাগরিক কমিটি গঠিত হল কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য। ১৯৭১-এর জানুয়ারীতে গণভোটের দাবীকে অবৈধ কার্যকলাপ আইন অনুসারে অগ্রাহ্য করা হল এবং তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হল। ফলে কাশ্মীর উপত্যকার অধিকাংশ নাগরিক চিন্তা করতে শুরু করল, -- ভারত তাদের গণতান্ত্রিক পথে কার্যকলাপ চালাতে দেবে না। এই মনস্তত্ত্ব পাক গোয়েন্দা চক্রের অজানা থাকেনি। তারা যে বীজ হজরতবাল অপহরণ করে বপন করেছিল, সেটিতে এবার সার প্রয়োগ করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন ও ভাষা আন্দোলনের ফলে গণবিক্ষোভ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার নিল। সেই সুযোগ গ্রহণ করল ভারত। তার ফলে পাকিস্তানের ধূমায়িত আগুনে ঘি পড়ল। তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বসল। তারিখটা ৩।১২।১৯৭১। ভারত এটাই চাইছিল। সে ভুলের মাশুল পাকিস্তান ভালমতো দিল তার একটি অঙ্গচ্ছেদ করে দিয়ে। এখানে ভারত যে ক্ষমার অযোগ্য ভ্রান্তি দেখিয়েছে, তার বিশ্লেষণ আমি 'ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি ও তার ফলাফল' অধ্যায়ে দিয়েছি। ভারত পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা করবার পর সে রাষ্ট্র প্রতিশোধস্পৃহায় ভীষণ হয়ে উঠবে এ জানা কথা। এজন্যই পরবর্তী কালে বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন তৈরি করে তাদের দিয়ে ভারতে অন্তর্ঘাত করতে পাঠানো, কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ সৃষ্টি করা, আণবিক অস্ত্র তৈরি করে ভবিষ্যতে ভারতকে শিক্ষা দেবার কর্মসূচী তৈরি করা ইত্যাদিতে পাকিস্তান মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে। সুতরাং ভারত-পাক তৃতীয় যুদ্ধের পর অর্থাৎ তাদের একটি প্রদেশ ভারতেরই সহযোগিতায় হাতছাড়া হবার পর পাঞ্জাবকে ও বিশেষত কাশ্মীরকে তারা সম্পূর্ণ অগ্নিগর্ভ করে গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অর্থাৎ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ব্যাপারটি গণতান্ত্রিক পথের পরিবর্তে বারুদের মুখে এসে দাঁড়াতে শুরু করে। ফলে কাশ্মীর প্রশাসনে এমনই উতোর-চাপানের খেলা চলতে থাকে

যার ফলে ৮।৯।৮২ তারিখে শেখ আবদুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফারুক আবদুল্লা মন্ত্রীসভা গঠন করলেও তা স্থায়ী হয়নি। ২।৭।৮৪ তারিখে ফারুককে বরখাস্ত করে গোলাম মহম্মদ শাহকে গদীতে বসানো হয়। তাঁর সময়ে ১৫।৮।৮৫ তারিখে ভারতবিরোধী মিছিলে পুলিশের গুলিচালনা উপত্যকাবাসীরা ভালোচোখে নিতে পারেনি। ফলে ৭।৩।৮৬ তারিখে শাহ মন্ত্রীসভার পতন এবং ৭।১১।৮৬ তারিখে কংগ্রেসের সংগে কোয়ালিশনে ফারুকের পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভ। ইতিমধ্যে জম্মু-কাশ্মীর স্বাধীনতা মোর্চা বা J K L F গঠিত হয়ে গেছে এবং উপত্যকার জনসাধারণের মধ্যে বেশ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এই J K L F-এর লক্ষ্য হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে কাশ্মীরে স্বাধীনতা অর্জন। অর্থাৎ ভারতের দুর্বলতার সুযোগে ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনী যে বীজ বপন করেছিল, সেটি এখন মহীরুহে পরিণত হয়েছে—তার দোস্ত আমেরিকার অস্ত্র-সাহায্যে, মধ্যপ্রাচ্যের ভ্রাতৃবৃন্দের তৈলডলারের আনুকূল্যে এবং জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে। J K L F ৭।৫।৮৯ তারিখে কাশ্মীর বন্ধের ডাক দিয়ে স্বতস্ফূর্ত সাড়া পেল। তারা ১৪।৮।৮৯ তারিখে পাকিস্তানের জন্মদিন পালন করল ঘটা করে এবং পরদিন ১৫।৮।৮৯ তারিখে ভারতের স্বাধীনতা দিবসে কাশ্মীর বন্ধ সফল করল। এছাড়াও তারা J K L F-এর প্রতিষ্ঠাতা মকবুল ভটের মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী প্রাক্তন জজ নীলকান্ত গাঞ্জুকে হত্যা করল। এইভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র উপত্যকা জংগী আন্দোলনের আওতার মধ্যে এসে পড়ল। ১৯৯০-এর শুরুতে ফারুক মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পথে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কবর রচিত হয়ে গেল। এরপর কাশ্মীরে যা কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন সবটাই সশস্ত্র আন্দোলন, যার বিস্তৃত আলোচনা 'সশস্ত্র আন্দোলন' অধ্যায়ে করেছি।

মূল্যায়ন ও অস্থায়ী সমাধান

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত থেকে এটা স্বচ্ছ জলের মতোই পরিষ্কার হয়ে আছে যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় থেকে ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরী জনগণ সম্পূর্ণভাবেই ভারতের পক্ষে ছিল। তাই ভারত সরকারের আশা ছিল যে গণভোট নিলে তারা অবশ্যই ভারতে যোগদান করবে। তবে তা করা হবে সমগ্র কাশ্মীরকে নিয়ে অর্থাৎ দখলীকৃত কাশ্মীরকে মুক্ত করার পর (এটা একান্তই আমার অনুমান)। এই যদি নেহেরু সরকারের উদ্দেশ্য থেকে থাকে তা হলে বুঝতে হবে গণচরিত্র বোঝার ক্ষেত্রেও তিনি দূরদর্শিতা দেখাতে পারেননি। ইতিমধ্যে ঝিলাম দিয়ে অনেক জলই গড়িয়ে গেছে। জনমত একটা পরিবর্তনশীল অব্যক্ত ব্যাপার যার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা করা চলে না। সুতরাং বিষয়টিকে ঝুলিয়ে না রেখে গরম থাকতেই ইস্ত্রী করে নেওয়া উচিত ছিল। তাতে নেহেরুজীর প্রতিশ্রুতি রক্ষাও হত, আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কারও

কিছু বলার থাকত না। এরপর যখন দখলীকৃত কাশ্মীরের ফয়সলা হত, তখন সে অংশে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিলেই চলত। কিংবা কাশ্মীর Constituent Assembly যখন ৫৪ সালে ভারতভুক্তির বৈধতা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করল, তখন এ বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে গণভোট বিষয়ে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে কারও কিছু বলার ছিল না। সুতরাং যুদ্ধবিরতির পর কাশ্মীর সমস্যাকে বর্তমান আকারে পরিণত করার বা হওয়ার পেছনে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি দায়ী বলে আমি মনে করি, তা হল,—

১। সংবিধানে ৩৭০ ধারার প্রবর্তন।

২। নেহেরু-আবদুল্লা চুক্তি বা দিল্লীচুক্তি।

৩। জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বোঝাপড়ার অভাব।

৪। জম্মু প্রদেশের ও কাশ্মীর উপত্যকার অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান মেটাতে কেন্দ্রের ব্যর্থতা।

৫। ক্রমবর্ধমান বেকারী ও অর্থনৈতিক সমস্যা।

৬। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনে দুর্বলতা ও দীর্ঘসূত্রী ব্যবস্থা।

৭। তৃণমূলস্তরে মানুষদের কাছে গিয়ে ভারতের নীতি ও আদর্শ তুলে ধরতে ব্যর্থতা, (বস্তুত সরকারী তরফে সেরকম কোন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনার কথা আমার জানা নেই)।

৮। পাকিস্তানের গোয়েন্দা দপ্তরের শক্তিকে ছোট করে দেখা।

৯। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বক্তব্য বোঝাতে এবং জঙ্গীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার নৈতিক সমর্থনলাভে শোচনীয় ব্যর্থতা।

এক্ষেত্রে এটুকু বলে নিই যে, সম্ভবত সকল কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ-ই উপরি-উক্ত কারণগুলিতে একমত হবেন; কেউ কেউ একটি অতিরিক্ত কারণ যোগ করতে চাইবেন (চাইছেন), তা হল, কাশ্মীরকে অধিকতর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দেওয়াতেই এই সশস্ত্র গণবিদ্রোহ। আমি এ মতবাদ কণামাত্র সমর্থন করি না। প্রথমত, Instrument of Accession অনুযায়ী তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তো দূরে থাকুক, প্রায় স্বাধীনতাই ভোগ করে চলছিল। দ্বিতীয়ত, Instrument of Accession মূলে প্রাপ্য অধিকারের অতিরিক্ত কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি তো ভারত দেয়নি, সুতরাং তা দেবার প্রশ্ন আসবে কেন? তৃতীয়ত, কাশ্মীরকে যদি ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের পর্যায়ে আনতে হয়, তা হলে যে অতিরিক্ত সুবিধা-সুযোগ কাশ্মীরবাসী ভোগ করছে তা প্রত্যাহার করতে হয়। যে নাগরিকবৃন্দ ভারতভুক্তিতে উদ্বাহু হয়ে একদা নৃত্য করেছে, তারা আজ কেন 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' চাইছে, সেটা বোঝা দরকার। আঞ্চলিক 'স্বায়ত্তশাসন' আর 'সার্বভৌমত্ব' এক বিষয় নয়। যাদের দাবি 'স্বাধীন কাশ্মীর' তাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিলেও তারা থেমে থাকবে না, যতক্ষণ তথাকথিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে

না পেঁাছাতে পারে। অথবা তাদের যতক্ষণ না নির্দোষভাবে বোঝানো যাচ্ছে যে ভারতের সঙ্গে থেকেই তাদের লাভ। সুতরাং কোনপ্রকার অধিকতর আঞ্চলিক সুবিধাদি প্রদানে এ রোগ সারবে না। ভারতান্তর্গত কাশ্মীরের আজকের সমস্যার সমাধান (স্থায়ী সমাধানসূত্রের জন্য 'প্রায়শ্চিত্ত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) নিম্নলিখিত পথে হবে।—

১। এই মুহূর্তে ৩৭০ ধারা এবং নেহেরু-আবদুল্লা চুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

২। যতটা প্রয়োজন ততটাই শক্তি প্রয়োগ করে উপত্যকাকে জঙ্গীমুক্ত করতে হবে।

৩। গণচরিত্রের পরিবর্তনে নিম্নলিখিত মর্মে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা তথা ইসরাইলের বিদেশমন্ত্রী সাইমন পেরেজের সুপারিশ কার্যকর করা।[২]

(ক) উপত্যকায় ছিন্নমূল অমুসলমানদের এই মুহূর্তে স্বস্থানে ও সসম্পদে স্থাপন করা।

(খ) ভারতের অন্যান্য স্থানে যদি ছিন্নমূল কাশ্মীরী মুসলমান থাকে, তা হলে তাদেরও এই মুহূর্তে স্বস্থানে ও সসম্পদে স্থাপন করা।

(গ) ভারতের অন্যান্য স্থানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত অমুসলমান উদ্বাস্তুদের কাশ্মীরে বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া (ভারতের অন্য কোন রাজ্যের উদ্বাস্তুদের ওখানে পুনর্বাসন দেওয়া চলবে না)।

(ঘ) ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের কাশ্মীরে ভূসম্পত্তি খরিদ করা ও বসবাস করায় উৎসাহ দান করা।

৪। সীমান্তে নিশ্ছিদ্র পাহারা বসানো।

আমি মনে করি কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে উপরি-উক্ত প্রক্রিয়াই এখন শুরু করা প্রয়োজন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মীমাংসা হয়ে গেলেও এগুলি চালিয়ে যেতে হবে (স্থায়ী সমাধানের জন্য 'প্রায়শ্চিত্ত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

[illegible]

১ Kashmir towards Insurgency / Balraj Puri / Orient Longman / 1993 / p 3.

২. আনন্দবাজার পত্রিকা / [illegible] ৯৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কাশ্মীরে উগ্রপন্থী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

গত ১০।৭।৯৩ তারিখের আনন্দবাজারে সুনীত ঘোষ তাঁর 'সরকারের কাশ্মীর নীতিতে গোড়া থেকেই দ্বিধাগ্রস্ততা এবং চিন্তায় অস্বচ্ছতা' নামক প্রবন্ধে একটি আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, তথা 'কুলের কথা' ফাঁস করে দিয়েছেন। সরকারী আনুকূল্যে দিল্লীতে নিশ্চিন্তে আরামে বসবাসকারী ফারুক সাহেবের দিল্লীস্থ প্রতিনিধি অধ্যাপক সোজ নাকি ভয়ানক চটে গেছেন ইসরাইলের বিদেশ-মন্ত্রী সাইমন পেরেজের উপর। তিনি নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, কাশ্মীরে স্থায়ী সমাধান করতে হলে ওখানে গণচরিত্রের পরিবর্তন আনতে হবে। তাতেই শ্রীযুক্ত সোজের গোঁসা। সেজন্য তিনি হুমকি দিয়েছেন যে চেষ্টা করা হলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর সবচেয়ে কৌতুকের কথা, কোনও একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল নাকি এতে শয়তানি খুঁজে পেয়েছে।

সুধী পাঠকমণ্ডলী, রাষ্ট্রপুঞ্জে বসে ভারতেরই প্রতিনিধি ফারুক সাহেব প্রেস কনফারেন্স ডেকে পরামর্শ দিলেন যুদ্ধবিরতিরেখাই আন্তর্জাতিক সীমারেখা হোক। আর তাঁরই দিল্লীস্থ প্রতিনিধি দিলেন কাশ্মীরে গণচরিত্র পরিবর্তনের সুপারিশে উপত্যকায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার হুমকি! তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কাশ্মীরকে ভারত মনে করে অন্য রাজ্যের কোনও দুর্বুদ্ধি নাগরিক সেখানে কোনদিন বসবাস করতে পারবে না? কাশ্মীরের মৃত্তিকাকে কোনদিন অমুসলমান প্রজন্ম জন্মভূমি ও মাতৃভূমি বলতে পারবে না? সে ধরনের ভূখণ্ড ভারতের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতের কোন্ গৌরব বৃদ্ধি করবে? হাস্য-লাস্যময়ী চিরযৌবনা কাশ্মীরকে আজ রক্তাক্ত কাশ্মীরে পরিণত করার মূলে বাহাদুরি কি কেবল পাক গোয়েন্দা চক্রের,—মূল দায়ভার কি কেবল কেন্দ্রীয় নেতাদের? কাশ্মীরের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং ভারতের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কি আন্তরিকভাবে চান ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষে থেকে ভারতবাসী হিসাবে কাশ্মীরবাসীদের সম্মানিত করতে? পারত কি তাহলে কাশ্মীরে উগ্রপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠতে? অন্ন ও বাসস্থান দিয়ে যাঁরা উগ্রপন্থীদের তথা সন্ত্রাস-বাদীদের আশ্রয়, প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাকামী কথাবার্তায় তাদের সহযোগিতা দিচ্ছেন—তাঁরা কারা? যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে কাশ্মীরের কিছু কিছু ঘরে তারা আশ্রয় পেয়ে চলেছে? যুদ্ধবিরতি সীমারেখাকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা করার সুপারিশ ফারুক সাহেব প্রেস কনফারেন্সে বলেন কোন্ ক্ষমতায়? কোন্ রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদ করেছে? ভারত সরকার কি এ মর্মে প্রথমে প্রস্তাব রাখতে কোনও অধিকার দিয়েছেন? অদূরদর্শী নেতারা যখন সিমলা চুক্তির মধ্যে কাশ্মীর প্রসঙ্গ ঢুকিয়ে পাকিস্তানকে কাশ্মীর বিষয়ে নাক

গলাবার পাকা লাইসেন্স করে দিয়েছেন, তখন দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসেই স্থির করা হবে, পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর ছেড়ে দেওয়া হবে কিম্বা গোটা কাশ্মীরটাই ছেড়ে দেওয়া হবে, অথবা কাশ্মীরের এক ইঞ্চি ভূমিও দেওয়া হবে না? সে বিষয়ে তাঁকে আমেরিকায় প্রেস কনফারেন্স ডেকে বলতে হবে কেন? নেতাদের এ সমস্ত 'আলগা কথাবার্তায়' বিদেশের মানুষেরা ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি সম্পর্কে কি ধারণা নেবেন? আজ এজন্যই আমেরিকার সহকারী বিদেশ সচিব শ্রীমতী রবিন রাফায়েলের এতদূর স্পর্ধা হয়েছে কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে চলেছে বা করা হচ্ছে। সুতরাং কাশ্মীরে আজকের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তথা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এ সমস্ত কিছুর মিলিত ফল, কেবল পাকিস্তানকে এজন্য দোষারোপ করলে চলে না। পাকিস্তান যদি মনে করে থাকে তারা অতিরিক্ত জিদ দেখিয়ে কাশ্মীরে ও ভারতের অন্যত্র অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং কাশ্মীরে পাকিস্তানে যোগ দিয়ে ফেলবে, তাহলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর ২৫।১১।৯৩ তারিখে ইসলামাবাদে শীর্ষ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মত ব্যক্ত করেছেন যে স্বাধীন কাশ্মীর অবাস্তব।[৩] এই আত্মদর্শন অথবা সত্য-দর্শন যদি পাকিস্তানের সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় সুমীমাংসা করে নিলে দাদাদের দাদাগিরি করার হাত থেকে উভয় দেশ রক্ষা পেত, —সেটা কি ভালো হত না? তাহলে আলোচ্য উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে উভয় দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসত। এবার এই উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, কি আছে এর নেপথ্য কাহিনী; তথা বেনজিরজীর উক্ত মন্তব্য মুখোশনিঃসৃত অথবা উপলব্ধিজাত সত্য। আর সেটা পাকাপাকিভাবে বুঝতে পারা যাবে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে পাকিস্তানের ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত দেখে।

আলোচ্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শুরু হয় ১৯৬৫ সালে J K L F বা জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমি দ্বিধা-হীন চিত্তে বলেছি যে, হজরতবাল অপহরণ দিয়ে পাক গোয়েন্দাচক্র কাশ্মীরে বিদ্রোহ ও অন্তর্ঘাতের সূচনা করেছিল,—সে বিষয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা ও সমর বিভাগ যদি গুরুত্ব বুঝতে পারত, তথা অঙ্কুরেই যদি বিনষ্ট করে দিতে পারত, তাহলে সেদিনের অঙ্কুরিত বিষবৃক্ষ শাখা-প্রশাখা নিয়ে আজ কাশ্মীরে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারত না। না প্রতিরোধ করা হয়েছে পাক গোয়েন্দা চক্রের ষড়যন্ত্র,—না প্রতিরোধ করা হয়েছে কাশ্মীরী জনগণের মধ্যে বেড়ে ওঠা অসন্তোষ,—যেজন্য আজ তার সমাধান করা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জন-গণের মনে যদি অসন্তোষ না থাকত, তাহলে কাশ্মীরের মাটিতে দাঁড়িয়ে কোনও

জঙ্গী সংগঠনই ভারতের বিরোধিতা করতে পারত না। যাই হোক, তৃণমূলস্তরে কাশ্মীরীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করেছি। এখন সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ বিশদ হওয়া যাক। পূর্বেই বলেছি এর শুরু ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে J K L F-এর গঠনের মধ্য দিয়ে। তারপর আজ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দেখা যাচ্ছে কয়েক ডজন জঙ্গী সংগঠন কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। একটা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যে এভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো জঙ্গী সংগঠন গড়ে ওঠে কি করে—এটাই আমার কাছে একটা বিরাট বিস্ময়। সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর ধরে ভারতের গোয়েন্দা ও পররাষ্ট্র বিভাগ কি পরিমাণ সরষের তেল নাসিকারন্ধ্রে ঢেলেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কয়েকডজন উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে যে দুটি মূলগোষ্ঠী অগ্রভাগে আছে তারা হল,—জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট বা J K L F এবং জামাত-ই-ইসলামীর নিয়ন্ত্রণাধীন 'হিজিবুল মুজাহিদিন' গোষ্ঠী। আমি প্রথমে J K L F-এর মূল সংগঠন এবং শাখা সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বর্ণনা করব। তবে একথা স্বীকার করি,—আমার এই বর্ণনায় যথেষ্ট ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা ; কারণ মূলত জঙ্গী-গোষ্ঠীর সমস্ত কিছুই অতি গোপনীয়, তাই তাদের গঠনতন্ত্র ও কার্যকলাপ সঠিক জানা সম্ভব নয় ; দ্বিতীয়ত, যদিও ভারতীয় গোয়েন্দা ও সামরিক বিভাগ সঠিক কিছু জেনে থাকেন, তা জাতীয় স্বার্থে তাঁরা অপ্রকাশ রেখেছেন। সুতরাং এই ইতিবৃত্ত আমাকে বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তকে লিখিত বিবরণ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছে। তাই তাদের বিবরণে যদি ভুল থাকে, আমার এই বিবরণেও ভুল থেকে যেতে পারে।

J K L F প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে যা পূর্বেই বলেছি। এই সংগঠনের বহু শাখা সংগঠন আছে এবং এদের কার্যকলাপ নিখুঁত নিয়মে পরিচালিত হয়। এই সংগঠনটির গঠনতন্ত্র কিছুটা গণতান্ত্রিক বলা যায়। মুজাহিদিন গোষ্ঠীর মতো এরা চরম উগ্রতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। এই সংগঠনের একজন সুপ্রিম কমান্ডার বা সর্বাধিনায়ক আছেন। যিনি এই দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর নাম আমানুল্লা খান,—যিনি এখন ভারতের অভিযোগক্রমে বেলজিয়ামে বন্দী।* তাঁর স্থান গ্রহণ করেছেন জাভেদ মীর। ভারত সরকার কর্তৃক বর্তমানে নিষিদ্ধ এই সংগঠনের ওই নেতা আমানুল্লা খানকে বেলজিয়ান সরকার বন্দী করেও তাকে ভারতে প্রেরণ করছে না উল্টে তারা বলছে আমানুল্লা খানের কার্যকলাপ 'সন্ত্রাসবাদী'র অথবা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'র কার্যকলাপ আগে বেলজিয়ান সরকার তা খতিয়ে দেখবে, তবেই সেমতো ব্যবস্থা তারা নেবেন। কি সাংঘাতিক কথা! ভারতকে বেলজিয়ান

---

* বেলজিয়ান সরকার আমানুল্লাখানকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া দূরে থাকুক তাকে পাকিস্তানের টিকিট কেটে আদর করে বিমানে তুলে দিয়েছে।

আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে আমানুল্লা খান স্বাধীনতা সংগ্রামী নয়, সে সন্ত্রাসবাদী! অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য নয়, ভারতের অঙ্গরাজ্য। ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের কি দৈন্যদশা, তা জানতে এর বেশি প্রমাণের দরকার হয় না। ওই সর্বাধিনায়কের অধীনে মিলিটারী উপদেষ্টা আলতাফ এবং সহকারী সেনাপ্রধান রাফক আহমেদ। অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলির মধ্যে আছে J K S L F বা জম্মু-কাশ্মীর ছাত্র মুক্তি মোর্চা, যাদের কাজ হচ্ছে স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সংগঠিত করে আন্দোলনে সামিল করা। দ্বিতীয় শাখা K L A বা কাশ্মীর লিবারেশন আর্মি, যাদের কাজ সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অর্থাৎ রেগুলার আর্মি। দক্ষ পাক সেনাপতির অধীনে এদের পাকিস্তানের বিভিন্ন যুদ্ধশিক্ষা শিবিরে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করে কাশ্মীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় শাখা K A C বা কাশ্মীর আমেরিকান কাউন্সিল, যাদের কাজ হচ্ছে বহির্বিশ্বের সমর্থন সংগ্রহ করা এবং কাশ্মীরসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে গণবিক্ষোভ সৃষ্টি করা। এই শাখা সংগঠনই আমেরিকার B M S K নামক সংস্থার সাহায্য নিয়েছিল কাশ্মীরে গণবিদ্রোহ সৃষ্টি করার জন্য। চতুর্থ শাখা 'ইখওয়ান-ই-মুসলিমেন'। এই বিভাগের কাজ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অপহরণ করে পণবন্দী করা এবং পণ আদায় করা। পঞ্চম শাখা—'অল-উমর'। এই বিভাগের কাজ দেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত করা। এদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির আছে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে। সেখানে দক্ষতা অর্জনের পর এদের অন্তর্ঘাত করার জন্য ভারতের বিভিন্নস্থানে পাঠানো হয়। ষষ্ঠ শাখা —সামরিক উপদেষ্টা বিভাগ, এদের কাজ ভারতীয় সামরিক ব্যবস্থার হাল-হকিকত জানা, ভারতীয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করা এবং সম্মুখ যুদ্ধের ক্ষেত্রে রেগুলার আর্মিকে পরামর্শ দেওয়া। সপ্তম শাখা —মহিলা সংগঠন। এদের তিনটি উপ-বিভাগ আছে—(ক) 'ইসলামিক-তারিখ-ই তুলবা' যাদের কাজ মহিলাদের মধ্যে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ সৃষ্টি করা; (খ) 'ইসলামি-জামাত-ই-তুলবা', যাদের কাজ অন্তর্ঘাত করা বা অন্তর্ঘাত পরিচালনা করা; এবং (গ) 'দুখতারান-ই-মিলাত', যাদের কাজ শত্রুকে হত্যা করে বা অন্তর্ঘাত করে আত্মহত্যা করা অর্থাৎ 'সুইসাইড স্কোয়াড'। অষ্টম শাখা—আইন বিভাগ। এদের কাজ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর রাজ্যের এবং কাশ্মীরের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা ও মূল সংগঠনকে আইনের পরামর্শ দেওয়া।

কাশ্মীরের এই বৃহত্তম জঙ্গী সংগঠনটির গঠনতন্ত্র লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এটি অন্যান্য জঙ্গী সংগঠন অপেক্ষা গণতান্ত্রিক এবং এদের মূল লক্ষ্য সমগ্র কাশ্মীরের সার্বভৌম স্বাধীনতা। এই সংগঠনটি গড়ে ওঠার পিছনে প্রয়াত নেতা শেখ আবদুল্লার যথেষ্ট প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। কারণ আবদুল্লা সাহেবের আজাদ কাশ্মীর দাবির সঙ্গে এই সংস্থার দাবি ও লক্ষ্য এক

ও অভিন্ন ছিল। এই সংগঠনটির প্রতি তৎকালীন কাশ্মীর সরকার ও কাশ্মীরী জনগণের গোপন প্রশ্রয় না থাকলে শাখা-প্রশাখাযুক্ত মহীরুহে পরিণত হতে কিছুতেই পারত না। এই সংগঠনটির সৃষ্টির মূলে ছিল পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের প্রচেষ্টা। তখন পাকিস্তান ভেবেছিল এদের সাহায্যে কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে। কিন্তু J K L F নেতৃবৃন্দ বোধহয় অধিকতর ধূর্ত ছিলেন। সে জন্য তারাই উল্টে পাক সহযোগিতায় নিজ সংগঠনকে মজবুত করে নিয়ে স্বাধীন কাশ্মীরের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকে। ফলে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে, এবং J K L F-কে দুর্বল করার জন্য পাল্টা চরম উগ্রগোষ্ঠী তৈরি করতে থাকে; যাদের মধ্যে বর্তমানে 'হিজবুল মুজাহিদিন' অন্যতম উগ্র জঙ্গী গোষ্ঠী এবং সারা কাশ্মীরে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ব্যস্ত আছে। এই গোষ্ঠীটি সম্পর্কে আমি পশ্চাতে বিশদ বিবরণ দেব।

J K L F প্রধান আমানুল্লা খানকে হাজার সভ্য ও সমর্থক সহ নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করতে না দেওয়ার পিছনে পাকিস্তানের যতটা ছিল আন্তর্জাতিক চাপ, তার চেয়েও বেশি ছিল নিজ স্বার্থহানির চিন্তা। কারণ J K L F যদিও জঙ্গী গোষ্ঠী, তবুও এরা গণতন্ত্রে ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীরের স্বাধীনতা চায় না,—সে চায় কাশ্মীরকে তার অঙ্গরাজ্য হিসাবে পেতে। যদি কাশ্মীর স্বাধীন হতে চায়, তাহলে J K L F-কে আর সাহায্য-সহযোগিতার প্রশ্ন ওঠে না। দুই, কাশ্মীর যদি স্বাধীনই হয়, তাহলে ভারতের সঙ্গে বিরোধিতা করার কারণ থাকে না; যেহেতু পাকিস্তান J K L F-এর কার্যক্রমে বর্তমানে আদৌ সন্তুষ্ট নয়। পাকিস্তান যে ভারতে ক্রমাগত অন্তর্ঘাত চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, এর নিশ্চিত প্রমাণ মেলে খলিস্তান আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা ও রূপকার সোহন সিংহের কথায়।" তিনি নাকি বলেছেন যে, পাকিস্তানে যে সরকারই আসুক তারা ভারতে অন্তর্ঘাত চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর; সুতরাং দুই ও দুইয়ে চারই হয়। কাশ্মীর স্বাধীন হয়ে গেলে তো সে উদ্দেশ্য সফল হবে না। সেজন্যই বোধ করি বেনজিরজী ২৫।১১।৯৩ তারিখে ইসলামাবাদের শীর্ষ প্রেস কনফারেন্সে মন্তব্য করেছেন স্বাধীন কাশ্মীর অবাস্তব। আর সেজন্যই J K L F-কে ছেড়ে দিয়ে এবার তাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁদেরই সৈন্যবাহিনী দিয়ে 'জামাত-ই-ইসলামী'র সমর্থনপুষ্ট হিজবুল মুজাহিদিন গোষ্ঠী। আর ঠিক সে কারণেই আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে ঐ উগ্র গোষ্ঠীর ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজার মুস্তাক আহমেদের মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল আত্মঘাতী মন্তব্য,—তারা পাকিস্তানেও যোগ দিতে পারে।"

পাকিস্তান J K L F-এর উপর নির্ভর না করে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তৈরি করার পিছনে অতঃপর আত্মনিয়োগ করে। আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত ঘটনাবলী

তাকে সাহায্য করে। ভারত-বন্ধু রাশিয়ার ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় পাকিস্তান-বন্ধু আমেরিকার ভূমিকা তাকে মদত যোগায়। হয়ত-বা পাকিস্তানের পক্ষে অনুকূলে বাতাবরণ সৃষ্টির জন্যই আমেরিকার সহকারী বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী রবিন রাফায়েলের মন্তব্যে ভারতভুক্তির বৈধতার প্রশ্ন অগ্রিম তুলে রাখা হয়েছে। সমগ্র কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে পৃথিবীকে স্বীকার করানো এবং ভারতে রাখার পিছনে যে অদৃশ্য শক্তি ছিল এবং যে অদৃশ্য শক্তির ভারসাম্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছিল এবং সমগ্র কাশ্মীরকে ভারতে রাখা সম্ভব হত, তথা ভারতের অনুকূলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হত, সেই অদৃশ্য শক্তির তথা সুরক্ষা চক্রের মধ্যে ভারত আর নেই। ভারতের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ জো-হুজুর পাকিস্তান এবং তার সৃষ্টিকর্তা বৃটিশ এবং ধাত্রী আমেরিকা গ্রহণ করবে না,—এ হতে পারে না। সুতরাং পাকিস্তান যেমনই এক দিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাড়িয়ে চলবে, তেমনই তার ঐ দোস্তরা ভারতকে হুমকি দিয়ে চলবে—যতক্ষণ না কাশ্মীর বিষয়ের নিষ্পত্তি পাকিস্তানের অনুকূলে হয়। সুতরাং পাকিস্তান তার অনুকূলে মীমাংসার আশায় দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বসতে পারে। কিন্তু তাদের সেই আশায় বাদ সাধছে J K L F নামক সংগঠন সার্বভৌম কাশ্মীরের দাবি তুলে। অতএব ঐ অচ্ছুৎ সংগঠন (পাকিস্তানের কাছে অচ্ছুৎ, ভারতের কাছে বেআইনী ও সন্ত্রাসবাদী) যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্যই পাল্টা জংগী গোষ্ঠীগুলিকে সৃষ্টি করে কাশ্মীরে ও ভারতের অন্যত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান।

জামাত-ই-ইসলামীর ফ্রণ্টের জংগী শাখা 'হিজিবুল মুজাহিদিন'-কে সৃষ্টি ও পালন করেই পাকিস্তান বসে নেই, সে আরও অনুরূপ একাধিক গোষ্ঠী তৈরি করেছে। কি জানি, যদি J K L F-এর মতো এরাও সিন্নী খেয়ে ভরা ডোবায়! সেজন্য একাধিক গোষ্ঠীকে তারা সাহায্য (এখন তো প্রকাশ্যে) দিয়ে চলেছে। এদের সভ্যদের মধ্যে কাশ্মীরী, আফগানী এমনকি খোদ পাকিস্তানীও আছে। এদের পাকিস্তানে প্রায় শতাধিক স্থানে ক্যাম্প খুলে শর্ট কোর্সের মাধ্যমে জঙ্গী ট্রেনিং দিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের পোশাক পরিয়ে কাশ্মীরে ও পাঞ্জাব সীমান্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইরূপ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা দশ হাজারের কম নয়। তাদের বেশির ভাগ অংশ সারা কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে এবং বাকিরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নিখুঁত শৃংখলায় কাজ করে চলেছে। আফগান যুদ্ধের পর ইসলামিক মুজাহিদিনদেরও কাশ্মীরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের ক্যাম্পে এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের আধুনিক যুদ্ধ-বিদ্যা ও অন্তর্ঘাতে শিক্ষা দিয়ে আসছেন লিবিয়ার জংগী নেতা শায়েখ-নুর-উদ-দিন ১৯৯১ সাল থেকে। এবং তাকে সহযোগিতা দিয়ে চলেছে পাক গোয়েন্দা চক্রের অফিসার ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ সালিম। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে অত্যাধুনিক অস্ত্রাদি পরিচালনা, আর ডি এক্সের মতো মারাত্মক বিস্ফোরক-সহ বিভিন্ন বোমার

ব্যবহার, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপণ কৌশল, অন্তর্ঘাত করার কৌশল ইত্যাদিতে তালিম দেওয়া হয়। এ সমস্তই ভারত সরকারের জানা। এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ঘাত শাখা ১৯৯১ সালের পর থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত শত নিরীহ ও নিরপরাধ নাগরিকের প্রাণহরণ করেছে ও করে চলেছে। যতই বেড়েছে এদের মারণযজ্ঞ ততই বেড়েছে অতি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের 'তীব্র প্রতিবাদ' নামক অকার্যকর ও মেরুদণ্ডহীন কথাবার্তা।

এই মুজাহিদিন গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফিরদৌসী আহমদবাবা। এই গোষ্ঠী বর্তমানে দুভাগে বিভক্ত—হিজিবুল মুজাহিদিন এবং হিজিব-ই-ইসলামী। ১৯৮৯-তে প্রতিষ্ঠিত হিজিবুল মুজাহিদিন সংগঠনের সুপ্রিম কমান্ডার পরভেজ হায়দার, অন্যতম কমান্ডার কর্নেল হাসিম, ইনটেলিজেন্স অ্যাডভাইজার মুস্তাক আহমেদ এবং ট্রেনার পাক সেনা-প্রধান ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ সালিম। এবং ১৯৮২-তে প্রতিষ্ঠিত গুলবাদিন হেকমতিয়ার এবং সুপ্রিম কমান্ডার আবদুল মজিদ দর। অধুনা এই সমস্ত জংগী গোষ্ঠীগুলিকে উন্নত প্রযুক্তিগত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করার জন্যে আই এস আই কাশ্মীর উপত্যকায় প্রায় আড়াই হাজার ভাড়াটে জংগী সৈন্য পাঠিয়েছে যার মধ্যে ৭৩২ জনই নাকি পাকিস্তানের নাগরিক ও সেনা অফিসার। এ ছাড়াও জংগী এসেছে আফগানিস্তান, সুদান, ইরান, সৌদি আরব প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে।[৩] এইভাবে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কেমন করে ভিন্নদেশের ঘাতকরা ঢুকে পড়তে পারে, যদি সে বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদত না থাকে? এটা এখন জলের মতই পরিষ্কার যে, সরকারী অবহেলার সুযোগে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিলে তিলে বেড়ে ওঠা বিষবৃক্ষটি আজ জাতির অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে।

আমি কাশ্মীর বিষয়ে যতটুকু গভীরে যেতে পেরেছি, তা দিয়ে আমার এই সিদ্ধান্তে আসতে দ্বিধা নেই যে, পাকিস্তান যদি তার জন্মলগ্ন থেকে কাশ্মীর বিষয়ে এত আগ্রহ দেখিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ না করে বসত, তাহলে সে তো কাশ্মীর পেতই, পূর্ব-পাকিস্তান নামে অংগরাজ্যটিকেও হারাতে হত না। অহেতুক হিন্দু বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভ্রান্ত দ্বিজাতি তত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা পৃথক রাষ্ট্র তৈরি করে কোন্ সোনার থালায় মণি-মাণিক্য নিয়ে ধরতে পেরেছে তার জনগণের কাছে? আজ ভারতের উন্নতি, ঐশ্বর্য তাদের চক্ষুশূল হয়ে তাদের পীড়িত করছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না—এ উন্নতি, এ ঐশ্বর্য,—সর্ব-ধর্ম ও জাতির একাত্মবোধ ও অচ্ছেদ্য বন্ধন নামক সম্পদ নিয়ে গঠিত,—যেটা অসম্ভব বলে মনে করেই তারা পৃথক হয়েছিল। আজ তাই ঈর্ষার আগুনে তাদের অসহনীয় করে তুলেছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা দরকার যে, তারা পারমাণবিক বোমা তৈরি করে এবং মোড়লদের সাহায্য পেয়ে যত শক্তিমানই নিজেদের মনে করুক, ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের মিলিত নৈতিক শক্তির কাছে তা কিছুই নয়।

তাই তাদের আরও মনে রাখা উচিত—শক্তির দম্ভ কৌরবদের ছিল, ছিল লঙ্কেশ্বরের, ছিল রোম-গ্রীস-স্পার্টার, ছিল হিটলারের, আজ তারা সবাই ইতিহাস।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. আনন্দবাজার পত্রিকা ১ .৭.৯২ / পৃ ৪
২. ঐ ৭.১১.৯১ / পৃ ৫
৩. ঐ ২৬.১১.৯১ / পৃ ৫
৪. ঐ '.১১.৯৩ ।
৫. ঐ ১২.১১.৯৩ ।
৬. ঐ ১৮.৫.৯৪ পৃ ৫

ষড়বিংশ অধ্যায়

কাশ্মীরে উগ্রপন্থী আন্দোলনের চরিত্র

আনন্দবাজার পত্রিকার ১২।১১।৯৩ তারিখের সংবাদে নিজস্ব প্রতিনিধি দেবব্রত ঠাকুর কাশ্মীরের আপেল ও বিদ্রোহের নগরী—সোপোর গিয়েছিলেন উগ্রপন্থীদের হালহকিকত বুঝতে। সেখানে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে জঙ্গী নেতৃত্ব [হিজবুল মুজাহিদিন গোষ্ঠী] বলেছেন যে, তাঁরা স্বাধীন কাশ্মীর গড়বেন, নাকি পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাবেন, সেটা তাদের ভাবার বিষয়, ভারতের ভাবার বিষয় নয়; এবং নেতাজি-ক্ষুদিরাম এঁরাই তাদের আদর্শ। নেতাজি-ক্ষুদিরামদের লড়াই যদি স্বাধীনতা আন্দোলন হয়ে থাকে তাহলে তাদের [কাশ্মীরিদের] আন্দোলনকে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে কেন ইত্যাদি। এই যুক্তির বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই প্রাণের মায়া যাঁর থাকবে, সেই জঙ্গীস্তানে বসে তিনি উত্তর দিতে পারবেন না। এই যুক্তির মধ্যে এমনকি কাশ্মীরী-দৃষ্টিভঙ্গীতেই কতখানি সারবত্তা আছে, তা বিশ্লেষণ করে অবশ্যই দেখা দরকার। এই প্রসঙ্গে উক্ত সংগঠনের ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজার মুস্তাক আহমেদ সাহেবের বক্তব্যের একটা প্রাথমিক বিশ্লেষণ করে নেওয়া দরকার। তাঁরই ভাষায়, "আমরা স্বাধীন কাশ্মীর গড়ব, নাকি পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাব, সেটা আমরাই ঠিক করব" বক্তব্যের বদলে কেবল যদি বলতেন 'আমরা স্বাধীন কাশ্মীর গড়ব', তাহলে আমরা একটা অর্থ খুঁজে পেতাম। কিন্তু যখন বিকল্প হিসাবে 'পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাব' সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, তা হলে ভারতের সঙ্গে কেন নয়? ভারত কি অর্থে অচ্ছুৎ? সেটাও তাহলে তাঁর পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত ছিল বা ঠাকুর সাহেবেরও তা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। কারণ ঐ বিকল্প চিন্তাধারার মধ্যে অর্থাৎ সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে। এটাই কি প্রকৃত কাশ্মীরী জনগণের কথা? এবার আসছি তাদের দাবিকৃত সশস্ত্র বিদ্রোহের সঙ্গে ভারতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহের তুলনামূলক আলোচনায়,—

ইংলণ্ড শাসিত ভারতীয়দের আন্দোলন :	ভারত শাসিত কাশ্মীরীদের আন্দোলন
১। বৃটিশ জাতি ছিল ভারতবাসীর কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী।	১। ভারতবাসী কাশ্মীরীদের কাছে বিদেশী ছিল না। কারণ কাশ্মীর ছিল সহস্র সহস্র বৎসর ভারতের অঙ্গরাজ্য।
২। ভারত ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বৃটেনের রাজ্য ছিল না।	২। কাশ্মীর খ্রীস্টপূর্ব দু' হাজার বৎসরেরও পূর্ব থেকে ভারতের অঙ্গরাজ্য ছিল।
৩। ভারত কোনদিন ইংরেজ জাতির দেশ ছিল না।	৩। কাশ্মীর খ্রীস্টপূর্ব দু হাজারেরও পূর্ব থেকে হিন্দুর এবং ষোড়শ

ইংলণ্ড শাসিত ভারতীয়দের আন্দোলন	ভারত শাসিত কাশ্মীরীদের আন্দোলন
	শতাব্দী থেকে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজ্য ছিল।
৪। ইংরেজ ভারত অধিকার করেছিল সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রসুলভ শাসন ও শোষণের অভিপ্রায়ে।	৪। কাশ্মীরের গণপ্রতিনিধিরা এবং রাজা স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষে যোগদান করেছিলেন। এবং ভারতও তাকে গ্রহণ করেছে শাসন ও শোষণের অভিপ্রায়ে নয়; গণতান্ত্রিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।
৫। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের কোনরূপ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিল না।	৫। খ্রীস্টপূর্ব সময় থেকে কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল [কিছু সময় ছাড়া]। সেজন্য কাশ্মীর উপত্যকার প্রতিটি ইঞ্চি স্থানে হিন্দু ও ইসলাম তথা ভারতীয় সভ্যতা, স্থাপত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে যাকে কোনদিন মুছে দেওয়া যাবে না বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দিয়ে।
৬। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। কারণ সে আন্দোলন ছিল নিঃসম্পর্কীয় বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন।	৬। কাশ্মীরের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত কাশ্মীরী এই আন্দোলনে সামিল নন। ভ্রান্ত নীতিতে বিশ্বাসী বিদেশী মদতপুষ্ট কতিপয় মানুষ এই আন্দোলন পরিচালনা করছেন। যেহেতু ভারতবর্ষ কাশ্মীরের কাছে বিদেশ ছিল না এবং যেহেতু ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সেহেতু এই আন্দোলন আন্দোলনকারীদের নিজেদের বিরুদ্ধেই।
৭। ভারতের আন্দোলন ছিল দুভাগে বিভক্ত—প্রকাশ্যে আইন-	৭। কাশ্মীরে বর্তমানে আন্দোলনের একটিমাত্র দিক,—গুপ্ত

ইংলণ্ড শাসিত ভারতীয়দের আন্দোলন	ভারত শাসিত কাশ্মীরীদের আন্দোলন
সিদ্ধ পথে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, এবং গুপ্তভাবে গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে। উভয় প্রকার আন্দোলনকেই ভারতের প্রতিটি নাগরিক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছেন।	আন্দোলন। যে আন্দোলন কাশ্মীরের সর্বস্তরের নাগরিক দ্বারা সমর্থিত নয়।
৮। ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করে ভারতের ধনসম্পদ নিজেদের দেশে স্থানান্তরিত করেছে দুশো বছর ধরে।	৮। কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য বিধায় কাশ্মীর রাজ্যের আয়-উপস্বত্ব ভারতে আনার তো প্রশ্নই নাই, বরং বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ কাশ্মীরকে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আনুপাতিক হারে অনেক বেশি সাহায্য ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসা হচ্ছে।
৯। ভারতের বিপ্লবীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি মুসলমানকেও ভারত ছাড়া করেনি।	৯। কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু ও আদি বাসিন্দা ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করে কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়া করেছে। যেজন্য তারা আজ জম্মুতে এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছে। একারণে এবং কাশ্মীরীদের জন্য বৈমাত্রেয়-সুলভ আইন রচনার জন্য বরং ভারতেরই মানুষের বিদ্রোহ ও আন্দোলনে ফেটে পড়া উচিত। কাশ্মীরবাসী মুসলমানদের কাছে এটা কত বড় লজ্জার যে, কাশ্মীরী পণ্ডিতরা কাশ্মীরে নিজেদের 'হোমল্যান্ড'-এর দাবি করছেন। ছিন্নমূল কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরা ও হিন্দুরা তাই দাবি

ইংলণ্ড শাসিত ভারতীয়দের আন্দোলন	ভারত শাসিত কাশ্মীরীদের আন্দোলন
	তুলেছেন অনন্তনাগ ও শ্রীনগর জেলায় ঝিলম নদীর উত্তর ও পূর্ব দিকের এলাকা নিয়ে তাদের 'হোমল্যান্ড' করে দিতে হবে। এবং এই এলাকার মর্যাদা হবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের।[১]
১০। ইংরেজ শাসনে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই অর্থনৈতিক-ভাবে শোষিত হওয়ায় এক-সঙ্গে বিদেশীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।	১০। ভারতের শাসনে কাশ্মীরের কোনও সম্প্রদায়ের উপরই কোন-প্রকার অত্যাচার দূরে থাকুক, ভারত সরকার তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের চেষ্টা করে চলেছে।

সুতরাং উপরি-উক্ত বিশ্লেষণমতে পাকিস্তানে ট্রেনিং প্রাপ্ত কতিপয় উগ্রবাদীর সশস্ত্র কার্যকলাপকে কখনই মুক্তি আন্দোলন বলা যায় না। কারণ, তাদের উপর কোনরূপে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বন্ধন নেই যে, তার থেকে মুক্ত হতে হবে 'মুক্তি আন্দোলন' গড়ে তুলে; যা আছে সে কেবল রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন। যে-কোন অজুহাতে যদি এই রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন তথা সার্বভৌমত্বের বন্ধন থেকে কাশ্মীর মুক্তি পেতে চায়, সেক্ষেত্রে একই যুক্তিতে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলি বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্তিক ও পার্বত্য রাজ্যগুলি চাইবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, যেখানের সংবিধানে নাগরিকদের সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেখানে এভাবে অঙ্গরাজ্যগুলিকে তাদের খুশিমতো বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া যায় না। বরং একটি বিশাল ও বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য যে অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে, তা স্বাধীন কাশ্মীরের পক্ষে পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। বরং কাশ্মীর স্বাধীন হলে, তাকে একা পেয়ে পাশ্চাত্যের ধনশালী মোড়লরা জোঁকের মতো শোষণ করবে ও খুশিমতো ব্যবহার করবে।

একটা অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব বলার বা দাবি করার থাকতেই পারে। সেজন্য রাজ্যে রাজ্য প্রশাসন আছে, মন্ত্রীসভা আছে; কেন্দ্রে আইন সভায় প্রতিনিধি আছেন,—এই সমস্ত গণতান্ত্রিক পথে দাবি আদায়ের আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত পথ আছে। সুতরাং সে পথ পরিহার করে নিজের দেশের বিরুদ্ধেই আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাকে আর যাই হোক, গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলা যায় না।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৮-১১-৯৩ / পৃ ৫।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি ও ফলাফল

আজকের কাশ্মীর সমস্যা নামক বিস্ফোটকটি ভারত ভাগ ও তৎপরবর্তীকালে গৃহীত কাশ্মীর নীতির থেকে সৃষ্টি। এটি সৃষ্টির মূল দায়িত্ব বা কৃতিত্ব কংগ্রেস দল এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকারের। যেহেতু দিল্লীর মসনদে অতি অল্প সময়ের জন্য ছাড়া ১৯৪৭ সাল থেকে কংগ্রেসই তাতে গদিয়ান, অতএব এই বিস্ফোটকটি সৃষ্টির সকল দায়-দায়িত্ব কংগ্রেস সরকারের উপরই বর্তায়,—অন্তত এই লেখকের তাই ধারণা। সেজন্য আমি বলতে বাধ্য,—অদূরদর্শিতা ও অপরিণামদর্শিতার অপর নাম কংগ্রেস সরকার। যে দূরদৃষ্টি সুদূর ইংলন্ডের কেম্ব্রিজে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে গুটিকয় মুসলিম ছাত্র দেখাতে পেরেছিলেন 'Now or Never' পত্রিকা বের করে, যে দূরদৃষ্টি নেতাজী সুভাষ দেখিয়েছিলেন ইংরেজদের বিশ্বাস না করে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার সংকল্প নিয়ে [ভাগ্যের পরিহাসে যে পরিকল্পনা সফল হয়নি], যে দূরদৃষ্টিবলে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে কংগ্রেস সভাপতি মহামতি মৌলানা আজাদ জহরলালকে সতর্ক করে বলেছিলেন—কংগ্রেসকে ইতিহাস ভুলে যাবে না ভারত ভাগ করবার জন্য[১] ; সে দূরদৃষ্টির কণামাত্রও ভারতভাগকারী কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং খণ্ডিত ভারতের শাসন-যন্ত্র পরিচালনাকারী কংগ্রেস সরকারের ছিল না ; থাকলে আজ কাশ্মীর সমস্যা নামক এই বিস্ফোটকটি সৃষ্টি হতে কিছুতেই পারত না ; —যার ধারাবাহিক বিশ্লেষণ আমি করছি।

বর্তমান আকারে কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ ভারতভাগ। ভারত-ভাগে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, পরাধীন ভারতে তাদের পরিচিতি ছিল ব্যক্তি হিসাবে এবং/অথবা সংগঠনের কর্মকর্তা হিসাবে। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টির পিছনে ব্যক্তি ও সংগঠন তো ছিলই, সেখানে তখন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন স্বাধীন ভারতের সরকার। সুতরাং আজকের কাশ্মীর সমস্যার মূল দায়ভার অবিসম্বাদিতভাবে এসে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস সরকারের উপরই।

কংগ্রেসের প্রথম ভ্রান্তি—'Now or Never' পত্রিকায় যখন মুসলিম রাষ্ট্রের 'PAKISTAN' নামকরণ করে ভারত ভাগ করার জন্য ইসলামধর্মীয় সম্প্রদায়ের কিছু মৌলবাদী মানুষ দাবি করতে থাকে এবং সেই দাবিকে মুসলিম লীগ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে কংগ্রেসকে একের পর এক কূটনৈতিক প্যাঁচে ধরাশায়ী করতে থাকে, তখন কেন কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন না যে PAKISTAN শব্দের 'K' অক্ষরের মধ্যে বারুদের গন্ধ আছে ? 'K' শব্দের অর্থ যে কাশ্মীর—এ তো কংগ্রেসী নেতাদের অজানা ছিল না ! সুতরাং কাশ্মীর যদি পাকিস্তানে না যোগ দেয়, তাহলে তাদের রাষ্ট্রের নামের অর্থ থাকে কি ? সেজন্যই

শাহেনশা জিন্না একটু এগিয়ে অ্যাবেটাবাদে বসে কাশ্মীর সিংহাসনের স্বপ্ন যদি দেখেই থাকেন, তাতে কিছুমাত্র ভুল বা দোষ ছিল না। তারা যে রাজ্যের ফুল-গুলি নিয়ে রাষ্ট্রের মালা গেঁথেছে, তার থেকে যদি একটি ফুল খসে যায়, তাহলে মালার সৌন্দর্য থাকে কি? সুতরাং কাশ্মীর আক্রমণ করায়, পাকিস্তানের ততখানি দোষ দেখি না; —দোষ আমাদের তৎকালীন নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার। আর বর্তমানে ভারত-পাক ডামাডোলের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের রাজ্য কাশ্মীর যদি ভ্রান্ত চিন্তার দ্বারা এবং / অথবা বৃহৎশক্তির কূটকৌশলে পরিচালিত হয়ে সার্বভৌম কাশ্মীর রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে থাকে, তাতেও আমি তাদের দোষ দেখি না। তবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং কাশ্মীরীদের মুক্তির সংগ্রামের প্রকৃতি ও চরিত্র আদৌ সমজাতীয় নয়। (তাদের চিন্তার মধ্যে কোথায় ভুল আছে, তা আমি "কাশ্মীরে উগ্রপন্থী আন্দোলনের চরিত্র" অধ্যায়ে লিখেছি)।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় ভ্রান্তি—যে ব্যক্তির উস্কানীতে ও প্রত্যক্ষ মদতে ভারত ভাগ হল, সেই মাউন্টব্যাটেনকেই স্বাধীন ভারতের বড়লাট করা। জিন্না অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই তিনি সব সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। ৪০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে কি সে যোগ্যতা আর কারও ছিল না! ফলে ঐ মাউন্টব্যাটেন প্রতি পদক্ষেপে কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি করে গিয়েছেন,—যতদিন তিনি খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান কি করে একজন অনাগরিক ও অভারতীয় হন,—এ বিষয়টিও আমার মাথায় ঢোকে না। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত "The Indian Independence Act. 1947" অনুযায়ী বিদেশী নাগরিক মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কেন নেতারা গর্জে উঠলেন না? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতের বীর সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে হানাদারেরা যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পশ্চিম সীমানার দিকে ছুটছিল, আমাদের কোন ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান থাকলে তিনি হানাদারদের ভারত সীমান্ত পার না করে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দেবার পরামর্শ মন্ত্রী পরিষদকে দিতেন না; কিংবা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে অন্য কোন মোড়লদের ডেকে আনবার মতো আত্মঘাতী পরামর্শও দিতেন না,—যে সুপরামর্শ মাউন্টব্যাটেন দিয়েছিলেন প্রাণের বন্ধু নেহেরুকে,—যার যন্ত্রণায় আজ নব্বই কোটি ভারত-বাসী তিল তিল দগ্ধ হয়ে মরছে।

তৃতীয় ভ্রান্তি—কাশ্মীর রাজ্যকে তাদের অনুকূল শর্তে ভারতভুক্ত করা। কাশ্মীর রাজ্য আক্রান্ত। সে রাজ্য ভারতের অংগরাজ্য হতে চায়। অথচ আশ্রিত রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির সময় যে রাজ্যকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত না নিয়ে সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছিল, সে রাজ্যকে ঐ

পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে অনুকূল শর্তে যোগদান করতে বাধ্য করলে কোনরূপ দোষারোপ পেতে হত না। এই কূটনৈতিক তৎপরতা কেন দেখানো হল না? কেন তৎপরিবর্তে ঐ রাজ্যের পৃথক কতিপয় বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদা মেনে নিয়ে ভারতভুক্তিতে অনুমোদন দেওয়া হল? এ ভুলের খেসারৎ আছে কি? কূটনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়করা কখনই এভাবে দুর্বলতা প্রকাশ করতেন না। প্রতিকূল শর্তাধীনে ভারতভুক্তি কাশ্মীরের সমস্যাকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। ভদ্রতা আর কূটনীতির প্রয়োগ কোন্ পরিস্থিতিতে করতে হয় এ বোধ যাঁর আছে, তিনিই প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক হবার অধিকারী। জিন্না সাহেব কূটনীতির দিক থেকে অনেক বেশি কৃতিত্বের দাবিদার। বরং চুক্তি না করে গায়ের জোরে যদি কাশ্মীর জয় করে নেওয়া হত, তাহলে বিজেতা দেশ হিসাবে কাশ্মীর প্রসঙ্গে চুক্তি মেনে চলার দায়বদ্ধতা ভারতের থাকত না। যেমন পাকিস্তান গায়ের জোরে প্রায় অর্ধাংশ দখল করে মালিক-স্বত্বাধিকারী হতে চলেছে।

চতুর্থ ভ্রান্তি—পাকিস্তানের ভারতভাগজনিত প্রাপ্য টাকা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেওয়া। যে সময় হানাদারদের বকলমে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে, এবং যে সময় তাদের অর্থের টানাটানি,—যেজন্য তারা হানাদার সৈন্যদের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাতে অসুবিধা বোধ করছে; ঠিক সে সময় তাদের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে অতি দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতার তুলনা আছে? সর্দার প্যাটেল অবশ্য প্রবল আপত্তি করেছিলেন।[২] তা সত্ত্বেও উক্ত অর্থ অতি দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হল, যা কিনা বুলেটের আকৃতি নিয়ে আমাদেরই দেশবাসী ও বীর সেনানীদের বুকে ফিরে এসেছিল।

পঞ্চম ভ্রান্তি—ভারতভুক্তি হওয়ামাত্র কাশ্মীরে গণভোটের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কতখানি অদূরদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী হলে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়, ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। কাশ্মীরের জনগণের কিংবা অন্য কোন পক্ষের বিনা দাবিতে ভারতভুক্তির পরদিনই মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী বেতারভাষণে কাশ্মীরে গণভোটের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারিখ ২৭।১০।১৯৪৭। অথচ ২৬।১০।৪৭ তারিখে রাষ্ট্রভুক্তির যে দলিলে মহারাজা হরি সিং স্বাক্ষর করেছিলেন, তাতে অনুরূপ কোন শর্ত ছিল না। অথচ তিনি বিষয়টি নেতাদের মগজে ঢুকিয়ে দিলেন। এটা কি কাশ্মীরে ভবিষ্যতে এ নিয়ে গণবিক্ষোভ সৃষ্টির একটা কূট চাল ছিল মাউন্টব্যাটেনের? পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমার সিদ্ধান্ত সেদিকেই যেতে চায়। নতুবা যে দাবি না ছিল Instrument of Accession-এতে, না ছিল কাশ্মীরী জনগণের ভারতভুক্তির আবেদনে (মহারাজার সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীপরিষদও শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ভারতভুক্তির আবেদন জানিয়েছিল; তখন তাঁরা এ দাবি রাখেননি। নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ যদি জনগণের প্রতিনিধি হয়, তাহলে তাদের আবেদনকে জনগণের আবেদন বলে স্বীকার করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি-

শ্রুতির ফলে পরবর্তীকালে পাক উস্কানিতে গণভোট প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে), তা গভর্নর জেনারেলের সামরিক সাহায্যের স্বীকৃতিপত্রে উল্লেখ করা হল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন গণতন্ত্রের দেশের পূজারী। অথচ প্রয়োজনে তাদের দেশ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে কণামাত্র পেছপা হয়নি। তিনি অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী লেডী মাউন্টব্যাটেন আরও মিষ্টি করে বলতে পারতেন—যেগুলো মুখোশধারীদের করতেই হয়; কিন্তু আমরা নেতৃবৃন্দ সেগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখব না—তাতে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে কিনা ? বস্তুত মাউন্টব্যাটেনই ভারতভাগ করিয়েছেন, এবং খণ্ডিত ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপ্রধান থাকা-কালীন তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলি গ্রহণ করবার জন্য নেতৃবৃন্দের উপর তাঁর স্ত্রী লেডি মাউন্টব্যাটেন যে মায়াজাল বিস্তার করেছিলেন,—আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে মূল্যায়ন করে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি পরামর্শই ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে,—যার বিশ্লেষণ আমি ক্রমশ করছি।

ষষ্ঠ ভ্রান্তি—মাউন্টব্যাটেনেরই পরামর্শে কাশ্মীরে ইংরেজের আনন্দের দিন নববর্ষে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা ; যখন যুদ্ধে পাকিস্তানের নাভিশ্বাস উঠেছিল। যুদ্ধে জয় যখন করায়ত্ত, ঠিক তখন তিনি মোহগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে ; ঠিক যে পরামর্শ মীরজাফর দিয়েছিলেন অদূরদর্শী সিরাজকে। যার ফলে সেদিন হারিয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা ; আর আজ আমরা হারাতে চলেছি অর্ধেক কাশ্মীর। মাউন্টব্যাটেন নাকি মস্তবড় সেনাপতি—মস্তবড় সমর বিশারদ এবং পার্বত্য যুদ্ধে তাঁর ছিল নাকি অগাধ জ্ঞান। সেজন্য নেহেরু সাহেব মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শকে ঈশ্বর-প্রেরিত বাণী বলে মনে করেছিলেন। অথচ কাশ্মীরের পর্বতে পর্বতে যে সমস্ত ভারতীয় বীর সেনাপতিরা যুদ্ধ করছেন, তাঁদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেওয়া তিনি প্রয়োজনবোধ করেননি। যেহেতু মাউন্টব্যাটেন বিলাতী সেনাপতি, সেক্ষেত্রে দেশী সেনাপতিদের মতামত নেওয়া তিনি বাহুল্য মনে করেছিলেন। সে সময় যুদ্ধের পরিস্থিতি কিরূপ ছিল আমি কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ শ্রীরাজেশ কাদিয়ান মহাশয়কে অনুসরণ করে তুলে দিচ্ছি। তিনি এ তথ্য সমর দপ্তর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। "...With the approach of winter, the Indians did the impossible ; they managed to get seven Stewart tanks to cover 260 miles and get to the unprecedented height of almost 12,000 feet above sea-level. With this armour in support, a break through was finally achieved by Cariappa's own regiment, the Rajputs, and Leh was reached. Around the same time Rajouri was also captured and Poonch relieved...A legend soon developed, if the army had more time and less political interference, then the three choke points—Mirpur for the Poonch

region, Muzaffarabad for the Kashmir Valley and Bunji for the Gilgit Agency would have fallen into Indian hands. Victory, then, would have been complete and Pakistan's flank and rear forever threatened by India."[৪] এখন এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, ভারতীয় বাহিনীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পেরেছিলেন (তিনি পার্বত্য যুদ্ধে অভিজ্ঞ সেনাপতি হিসাবে ঠিকই বুঝেছিলেন যে, যুদ্ধ না থামালে পাকিস্তানের বিপদ অবশ্যম্ভাবী) যে ভারতীয় বাহিনী যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে হানাদার সৈন্যদের সীমান্ত পার করে দিলে যে কাশ্মীর জট অনেক কৌশলে সৃষ্টি করা হয়েছে—তা খুলে যাবে। অথবা পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তার নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে এবং এত সাধের যে সাম্প্রদায়িক সন্তানটিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইঙ্গিতে ভূমিষ্ঠ করিয়েছেন, তার আঁতুড়ঘরেই মৃত্যু হবে। সে দৃশ্য লর্ড পরিবারের ছেলে হয়ে মাউন্টব্যাটেন দেখবেন কেমন করে; আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইজ্জতই বা রক্ষা হয় কি করে? সুতরাং তাঁর খেলার পুতুল নেহেরু সাহেবকে দিয়ে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শুভ নববর্ষে যুদ্ধবিরতির মহড়া অনুষ্ঠিত হল,—লেখা হয়ে গেল কাশ্মীরের ভাগ্যলিপি।

তবে আঁতুড়ঘরে ঐ সন্তানের মৃত্যু হলে সবচেয়ে খুশী হতেন ভারতীয় মুসলমানেরাই, যাঁরা ভারতকে নিজের দেশ বলতে গর্ব অনুভব করেন। ভারতীয় মুসলমানদের সে মানসিকতা একমাত্র বুঝেছিলেন সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা আবুল কালাম আজাদ। তাঁর ভাষায়, "...It is strange but the fact is that these Muslim Leaguers had been foolishly persuaded that once Pakistan was formed, Muslims, whether they came from a majority or a minority province would be regarded as a separate nation and would enjoy the right of determining their own future...It was now clear to them that the only result of partition was that their position as a minority was much weaker than before. In addition, they had through their foolish action created anger and resentiment in the minds of the Hindus."[৫]

সপ্তম ভ্রান্তি—সেই নাটের গুরু মাউন্টব্যাটেনেরই পরামর্শে হানাদারী আক্রমণের মতো একটা আঞ্চলিক সমস্যাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া। তাঁরই প্রেস সচিব মিঃ ক্যাম্বেলের জবানীতে, "...মাউন্টব্যাটেন বুঝলেন, এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বশক্তি আছে এমন কোন একটি তৃতীয় পক্ষ যদি দুই পক্ষের সম্মতি ও সমর্থনে নিযুক্ত হয়ে কিছু করবার চেষ্টা না করে, তবে এই নিরেট অচল অবস্থা কখনো সচল হতে পারবে না। এই অবস্থা দেখে এবং প্রয়োজন

হয়েছে বুঝে মাউণ্টব্যাটেন এইবার তাঁর একটি প্রস্তাব আলোচনার মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। প্রস্তাবটি হল, দুই পক্ষের এই বিরোধের মীমাংসায় এখন রাষ্ট্রপুঞ্জকেই এসে তৃতীয়পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করতে বলা উচিত। লিয়াকৎ এই প্রস্তাবে তখনই সম্মত হলেন।…"[৬]

মাউন্টব্যাটেন কেমন করে বুঝলেন যে, আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বশক্তি আছে এমন প্রতিষ্ঠানকে মধ্যস্থগিরি করতে দিলেই সব সমাধান হয়ে যাবে ? হয়েছে আজ পর্যন্ত ? বরঞ্চ সমস্যার যাতে সমাধান না হয় রাষ্ট্রসংঘ সে চেষ্টাই করে গেছে (রাষ্ট্রসংঘ নাটক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সেই প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিয়াকত আলি কেন সম্মত হয়েছিলেন—যদি কাশ্মীর যুদ্ধে পাকিস্তানের অবস্থা ভালো এবং ভারতের অবস্থা খারাপ থাকত ? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি বুঝেছিলেন—এ যুদ্ধে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—তাই ভারতের ক্ষমতাশীল অদূরদর্শী নেতারা যদি যুদ্ধ থামিয়ে দেয় এবং বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক দরবারে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেই কেল্লা ফতে। সে ইঙ্গিতও নিশ্চয়ই পাকিস্তান পেয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন জাতিসংঘে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রতিনিধিগণ পাকিস্তানকে নির্লজ্জ সমর্থন জানিয়েছিলেন (আজও সে ধারা অব্যাহত আছে)। সুতরাং ভারত কাশ্মীর যুদ্ধে পরাজিত হবে বলে সেদিন মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় বাহিনীকে থামাননি, থামিয়েছিলেন পাকিস্তানের মঙ্গল চিন্তা করে। তাই তিনি যুদ্ধ থামিয়ে এবং বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথা ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ভরাডুবি করে ভারত থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত কাদিয়ানের ভাষায় : "Meanwhile Mountbatten continued to influence Nehru's Judgement. On his advice on 1 January 1948, the Indians lodged a complaint with the United Nations Organisation ; a regional problem thereby became truly international…."[৭]

পাকিস্তান কোথাও সরকারীভাবে স্বীকার করেনি যে, সে কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল। তারা সকল সময়েই বলে এসেছে ওটা নাকি হানাদারদের কাজ। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় আইনগত প্রশ্নে ? কতিপয় হানাদার বা দস্যু একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিঘ্ন করতে এসেছিল, ভারতের সঙ্গে মোকাবিলা হবে সেই কিছু সংখ্যক দস্যুর। সেখানে তাদের অবাধ্যতার শাস্তি দেবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের দরবারে ধর্ণা দেবার প্রয়োজন কেন হয়েছিল ? রাষ্ট্রসংঘ দেখবে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ বিসম্বাদের বিষয়। হানাদাররা কি একটা রাষ্ট্র ছিল ? সুতরাং হানাদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে পাকিস্তানকে পক্ষ করে কাশ্মীর বিষয়ে নাক গলাবার পাকা লাইসেন্স করে দেওয়া হল তাদের। এই নির্বুদ্ধিতার কি ক্ষমা আছে ?

অষ্টম ভ্রান্তি—যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পাকিস্তানকে পক্ষ হিসাবে মেনে

নেওয়া। পাকিস্তান যেখানে কাশ্মীরে যুদ্ধই করেনি বলে সর্বত্র প্রচার করে চলেছে যে, ওটা কিছু হানাদার দস্যুর কাজ, সেই যুক্তিতেই তাদের ঘায়েল করা যেত,—এক, যুদ্ধ না থামিয়ে; দুই, কোন কিছু আলাপ-আলোচনায় তাকে পক্ষভুক্ত না করে। পাকিস্তান যদি যুদ্ধই করেনি কাশ্মীরে, সেখানে যুদ্ধবিরতিতে পক্ষ হয় কেমন করে,—এ হিসাব আমি আজও মেলাতে পারিনি। রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে পক্ষ করে অভিযোগ করে যে নির্বুদ্ধিতা দেখানো হল, তার চেয়েও বেশি নির্বুদ্ধিতা দেখানো হল তাকে যুদ্ধবিরতিতে পক্ষভুক্ত করে; অথবা জাতিসংঘে এই প্রশ্নে আপত্তি না তুলে। ফলে যুদ্ধে জড়িত নয়—এমন একটি দেশকে যুদ্ধবিরতিতে যুক্ত করে নিজের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীর সম্বন্ধে একটি পররাষ্ট্রের কিছু বলার অধিকারকে স্বীকৃতি জানানো হল। অর্থাৎ যুদ্ধ করে ব্যর্থ হল ভারত, আর যুদ্ধ না করেও ফললাভ করল পাকিস্তান। কূটনৈতিক ব্যর্থতার এমন নজির যুদ্ধের ইতিহাসে কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। আজও পাকিস্তান তার সৈন্যবাহিনীকে প্রকাশ্যে যুদ্ধে নিযুক্ত না করে কেবল সন্ত্রাসবাদী তৈরি করে ভারতের বিপুল পরিমাণ সৈন্যকে তথা সামরিক শক্তিকে বিব্রত করে রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

নবম ভ্রান্তি—এমনিতেই একটি আঞ্চলিক বিবাদকে চরম নির্বুদ্ধিতা দেখিয়ে রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে তার আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া হল, তাও অভিযোগ দায়ের করা হল Chapter VII-এর পরিবর্তে Chapter VI অনুযায়ী, যেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করা হবে—"negotiations, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their own choice" অনুসারে। কিন্তু উক্ত অভিযোগ যদি Chapter VII অনুসারে দাখিল করা হত, তাহলে রাষ্ট্রসংঘ শক্তি প্রয়োগ করে জবরদখলকারীকে উৎখাত করতে পারত।[৮] কিন্তু Chapter VI অনুসারে আবেদন করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ আপোস মীমাংসার আশায় যুদ্ধবিরতি সীমারেখা আগলে আজ ৪৬ বৎসর বসে আছে এবং রাষ্ট্রসংঘের বড় মোড়লরা সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরও জল ঘোলা করে নিজ নিজ অস্ত্রকারখানার মুনাফাকে বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। আর সিমলা চুক্তির পর বলতে পারছে——'ওটা দুদেশের ব্যাপার, দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় ওরা মীমাংসা করে নেবে।' অর্থাৎ পাকিস্তানকে দোষী করার হাত থেকে রাষ্ট্রসংঘ গা বাঁচিয়ে নিল।

১।১।৪৮ তারিখে যখন ঐ আবেদন ভারত দাখিল করেছিল, তখন হয়ত সে ভেবেছিল ইতিমধ্যে হানাদারদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দখলমুক্ত করে নিতে পারবে (বীর ভারতীয় সেনানীরা পারতও, যদি ভারতের দুষ্টগ্রহ মাউন্টব্যাটেন নেতাদের গ্রাস করে না রাখতেন। ঐ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলেই যে আজ কাশ্মীরের অর্ধেক যেতে বসেছে, তা সূর্যালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে)। সুতরাং আপোস মীমাংসা, শান্তি স্থাপন ইত্যাদির প্রার্থনা করে রাখলেই যথেষ্ট

হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন দেখা গেল যুদ্ধবিরতির সময় হানাদারদের বকলমে পাকিস্তান প্রায় অর্ধেক কাশ্মীর দখল করে থাকছে, তখন সে মর্মে আবেদনপত্র সংশোধন করে দাখিল হল না কেন? সুতরাং যদি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বেদখল থাকা অবস্থায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অপরিহার্যই হয়েছিল সেক্ষেত্রে যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করে (তাং ২৯।৭।৪৯) জানিয়ে দিয়ে ১।১।৪৮ তারিখের আবেদনের সংশোধনীমূলে Chapter VII মোতাবেক দরখাস্ত করে জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে আবেদন না করার ভ্রান্তি ঘটল কেন? মাউন্টব্যাটেন যুদ্ধবিরতির পরামর্শ দিতে পেরেছিলেন, রাষ্ট্রসংঘে আবেদনের পরামর্শ দিতে পেরেছিলেন, আর যুদ্ধবিরতির সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দখলকারীদের হটিয়ে দেবার জন্য যে সংশোধিত আবেদন করতে হবে—এ পরামর্শ তিনি দিলেন না কেন? এই ধরনের ভ্রান্তি দেওয়ানী আদালতের একজন নবিশ আইনজ্ঞও করতেন না। মাউন্টব্যাটেন সজ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করতে দেননি।

দশম ভ্রান্তি—২৪।৭।৫২ তারিখে দিল্লীতে 'নেহেরু আবদুল্লা চুক্তি' করা, যার দ্বারা সংবিধানের স্বল্পমেয়াদী ৩৭০ ধারাকে স্থায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে কাশ্মীরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের বসবাস করা বা সম্পত্তি আদি খরিদ করার অধিকার হরণ করা হল। শ্রীযুক্ত কাদিয়ানের ভাষায়, "...Under the agreement the provisions of Section 370 were being given the character of permanence in contrast to the wishes of the Indian Constituent Assembly which had specified them as being merely temporary. Under the Delhi Agreement, only citizens of the state had the right to ownership of land within Kashmir. So the new arrivals in the state, the dispossessed Hindu refugees from Pakistan clustered around Jammu, would never get this privilege of domicile...." শুধু এই নয়, ঐ চুক্তিমূলে কাশ্মীরের বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করা, কাশ্মীর রাজ্যকে পৃথক পতাকা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া সহ আর যেসব সুবিধা দেওয়া হল, তাতে কাশ্মীর যে ভারতের অঙ্গরাজ্য—এ কথা অতি বড় মিত্রেরও বলার সুযোগ রইল না। আমি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নেহেরু-আবদুল্লা 'কালাচুক্তির' সারাংশ তুলে দিচ্ছি :

(1) The limited jurisdiction of the Indian Supreme Court in Kashmir.

(2) A limitation of Article 352 of the Indian Constitution (Under this Article the President had the right to declare a State of Emergency in the case of invasion, external danger or internal threats. In Kashmir this power could only be used 'At the request or with the concurrence of the Government of the

state'...).

(3) The use of a distinct state flag while no other state in India was allowed the use of separate state flag.

(4) The Indian Government agreed that the Kashmir Legislature "Shall have the power to define and regulate the rights and privilages of the permanent residents of the State, more especially in regard to the acquisition of immovable property." (In other words though the Kashmiris would enjoy unabridged rights in the rest of India, the citizens of India would have very limited rights in the entire state of Jammu and Kashmir).[১০]

এই কালাচুক্তির ভবিষ্যৎ ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রতিবাদে যিনি গর্জে উঠেছিলেন, তিনিও সুভাষচন্দ্রের মতোই একজন বাঙালী। বাঘের বাচ্চা, 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখার্জী'র পুত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী'। যেজন্য তাঁকে নেহেরুর ইঙ্গিতে কাশ্মীরে কারাবরণ করতে হয়েছিল এবং তাঁকে মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছিল কারান্তরালেই—যে মৃত্যু আজও রহস্যে ঢাকা আছে।* আগেই সুভাষ বসুকে তাড়ানো হয়েছে, এবার শ্যামাপ্রসাদ গেলেন। বাঙালী নেতাদের যত দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়, ততই নেহেরুজীর পক্ষে মঙ্গল। কারণ, বাঙালীরা বড্ড বেশি প্রশ্ন তোলে, অনুসন্ধান করে এবং অগ্রিম চিন্তা করে! আজকে তো আবার এই দুই বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত দুটি দল কংগ্রেসের দুই চোখের বালি!

একাদশ ভ্রান্তি—সংবিধানে ৩৭০ ধারার (সাময়িক) প্রবর্তন। এই 'সাময়িক' ধারাটি কি শতাব্দী ধরে চলবে? ঐ ধারা যে কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে স্বাভাবিক ও নিবিড় করতে দেবে না,—এই সহজ সরল সত্য তো সকলেরই জানা আছে। ঐ ৩৭০ ধারা এবং তার সমর্থনে/স্থায়িত্বকরণে নেহেরু-আবদুল্লা চুক্তিকে যাঁরা স্বাগত জানাবেন এবং/অথবা প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন না, তাঁদেরকে দেশের শত্রু হিসাবেই চিহ্নিত করা উচিত। আর ঠিক এই বিষয়ে আপত্তি দিতে গিয়েই শ্যামাপ্রসাদকে প্রথমে কারাবরণ, পরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।[১১]

দ্বাদশ ভ্রান্তি—১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে Kashmir Constituent Assembly যখন ভারতভুক্তির বৈধতা সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ বলে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দিয়েছিল, সেই মুহূর্তে গণভোটের তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে সরাসরি খারিজ না করা। Kashmir Constituent Assembly-তে ওই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর 'ভারতভুক্তির বৈধতা', 'গণভোট'; 'আত্মনিয়ন্ত্রণের

---

* এ বিষয়ে বিশদ জানতে হলে সুধী পাঠকমণ্ডলীকে "শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ" / সম্পাদনা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় / প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-এর বইখানি পড়তে অনুরোধ করি।

অধিকার' ইত্যাদি শব্দগুলি নিরর্থক, অকার্যকর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে ঐ সম্পর্কিত দাবি তাৎক্ষণিক বাতিল করে দিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া উচিত ছিল। কাশ্মীর বিষয়ে ঐ প্রশ্নগুলি আর কোনদিনও issue আকারে কেউ কোথাও নিতে পারবে না মর্মে ভারত সরকারের ঘোষণা করা উচিত ছিল। কিন্তু করবে কে? মানুষ যেমন সম্মোহন দ্বারা বশীভূত হলে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করতে অক্ষম হয়, তৎকালে ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের একই অবস্থা হয়েছিল ; ফলে আজ সোনার তরী তীরে এসে ডুবতে বসেছে।

ত্রয়োদশ ভ্রান্তি—শেখ আবদুল্লাকে 'কাশ্মীরী মুসলমান' হিসাবে আন্তর্জাতিক পাশপোর্ট মঞ্জুর করা। অথাৎ কিনা সেখ আবদুল্লা তথা কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীরা 'ভারতীয় নাগরিক' নন, যে পরিচয়ে তাবৎ ভারতবাসী পাশপোর্ট পেতে হকদার। তাহলে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য হয় কি করে? ভারত সরকার তো আন্তর্জাতিকভাবেই স্বীকার করে নিচ্ছেন কাশ্মীরের অধিবাসীরা 'ভারতীয় নাগরিক' নন. তারা 'কাশ্মীরী মুসলমান' বা 'কাশ্মীরী হিন্দু' ইত্যাদি। অর্থাৎ বিগত ৪৭ বৎসর ধরে কাশ্মীর সংক্রান্ত কোন নীতিতেই স্বচ্ছতার কণামাত্র স্বাক্ষর ভারত সরকার রাখতে পারেনি।

চতুর্দ্দশ ভ্রান্তি—কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে পাকিস্তানকে বাধ্য না করে লাহোর ও শিয়ালকোট অবরোধ তুলে নেওয়া। ঐ ভারত-পাক যুদ্ধেও ভারত আক্রমণকারী ছিল না। পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে এই দুরাশায় ভারত আক্রমণ করেছিল যে, ভারতের পশ্চিম সীমান্তে একটা কি দুটো রাজ্য দখল করে নিয়ে ভারতকে কাশ্মীর ছেড়ে দিতে বাধ্য করবে ; যে বিপরীত সুযোগ দিল্লীর সরকার ঐ যুদ্ধে এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পেয়েও হাতছাড়া করে চরম নিবুর্দ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার নিদর্শন রেখেছে। অধিকৃত কাশ্মীরের বিষয়ে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্য লাহোর ও শিয়ালকোট অবরোধ করে থাকলে কারও কিছু করার ছিল না। পাকিস্তান যথাপূর্ব রাষ্ট্রসংঘে তার সমর্থক মোড়লদের কাছে গিয়ে চেঁচামেচি করত তাতে তাদের কিছু লাভ হত না,—লাভ হত ভারতের। ভূখণ্ডের উপর দখল মস্তবড় ব্যাপার ;—আজ যেটা অধিকৃত কাশ্মীর হিসাবে ভারতের অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘদিন লাহোর ও শিয়ালকোট অবরোধ হয়ে থাকলে অভ্যন্তরীণ গণবিক্ষোভের মুখে বাধ্য হত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর বিষয়ে ভারতের দাবি মেনে নিতে। সুযোগ একবার হারালে চিরদিনের মতোই হারিয়ে যায়।

পঞ্চদশ ভ্রান্তি—পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পর সেই দেশকে পৃথক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে বিজয়ী সৈন্যদের রিক্তহস্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এ মোড়লী ভারতের করার দরকার হল কেন? পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে হতবল করা, পৃথক ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা এবং একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করা—এই উদ্দেশ্যে তো? ভারতের সে উদ্দেশ্য একটাও সফল হয়েছে? বাংলা-

দেশ কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়েছে? বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কি ভারতের সংখ্যালঘুদের মতো নাগরিক মর্যাদাসহ নির্ভয়ে নিজের দেশ মনে করে জীবনযাপন করতে পারছে? বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সাহায্য করার জন্য তারা কণামাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে কোথাও—কোন পত্র-পত্রিকায়, প্রচারমাধ্যমে কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে অন্যত্র? বলেছে কোথাও সরকারীভাবে যে, প্রতিবেশী বন্ধু ভারত না সহযোগিতা করলে আমরা স্বাধীন হতে পারতাম না? সুতরাং বাংলাদেশ থেকে কোনরূপ সুবিধা তো দূরস্থান, সামান্য বায়বীয় কৃতজ্ঞতাটুকুও পাওয়া গেল না। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের একটি অঙ্গরাজ্যের পতন ঘটানোয় সহযোগিতা দেওয়ার জন্য তারা ভারতকে কোনদিন সুনজরে দেখতে পারবে? পারবে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে? ভারতের কোন অংশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য পাকিস্তান যদি সাহায্য পাঠায়,—মেনে নিতে পারবে ভারত তাদের সেই কাজকে? আজ পাকিস্তান সেজন্যই পাঞ্জাব ও কাশ্মীরকে (কাশ্মীরের বিষয়টা কিছুটা স্বতন্ত্র, বাংলাদেশ হবার পর পাকিস্তান আরও জোর দিয়েছে সমরসজ্জায়) ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিশোধ তুলতে চাইছে—এই শিশুশ্রেণীর অঙ্ক কেন তাবড় নেতাদের মগজে ঢোকে না?

অবশ্য কেউ কেউ বলবেন যে, পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছিল বলেই ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং সেই যুদ্ধের ফলস্বরূপ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছিল এবং ভারত সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিযে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং ভারত যুদ্ধে জয়ী হয়েছে,—এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু বিজিতের সেই অঙ্গরাজ্যটিকে তাড়াতাড়ি স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেবার কি দরকার ছিল? জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পর অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তানকে ঠিক কাশ্মীরের মতোই ভারতীয় সৈন্যদের হাতে রেখে দিয়ে দর কষাকষি করলেই তো সবচেয়ে কূটনীতির পরিচয় দেওয়া হত। আরও বেশি কূটনীতির পরিচয় দেওয়া হত, যদি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তানের বিনিময়ে অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হত। চাইকি ঠিকমত দর কষাকষি করতে পারলে কাশ্মীর তো আসতোই, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের দু-একটা জেলাও পাওয়া যেত। অর্থাৎ ঐ যুদ্ধের ফলে বিজয়ী ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক মানচিত্রে একটা অনুকূল পরিবর্তনের সুনিশ্চিত সুযোগ ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রনেতাদের নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতা তা হতে দেয়নি। মাঝখান থেকে ক্ষতি হল ভারতেরই—অর্থনীতি, কূটনীতি ও প্রতিবেশী সম্পর্ক,—সবদিক থেকেই। সুতরাং বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেল কি পেল না,—এ নিয়ে ভারতের মাথাব্যথার কি ছিল? বাংলাদেশ হলেও সে পররাষ্ট্র, আর পাকিস্তান হলেও সে পররাষ্ট্র। বাংলাদেশ হয়ে কি রাজছত্রটি ধরে আছে ভারতের মাথায়? বরং উদাহরণশূন্য কৃতঘ্নতা দেখিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা

রটনা করে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে, গঙ্গার জল নিয়ে অযৌক্তিক দাবি সৃষ্টি করে, ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সাহায্যস্বরূপ উগ্রপন্থীদের শিক্ষণ শিবির খুলে, এবং তাজ্জবকি বাত, পাকিস্তান গোয়েন্দাচক্রকে ভারতের বিরুদ্ধে সহায়তা দিয়ে উপকারীর ঋণ শোধ করে চলেছে তারা! পূর্ব পাকিস্তানের গণবিদ্রোহ ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সুতরাং বাংলাদেশ দখল করার পর তার স্বাধীনতা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ভারতের দাবি করা উচিত ছিল—'তুমি আমার কাশ্মীর থেকে দূর হও, আমিও তোমার পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরে যাচ্ছি—তার আগে নয়'। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'—চাণক্যের কূটনীতির এই সাধারণ পাঠটুকুও নেতাদের মগজে ছিল না। এ ভ্রান্তি ক্ষমার অযোগ্য।

ষোড়শ ভ্রান্তি—সিমলা চুক্তিতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা। সিমলা চুক্তি ছিল ভারত-পাক যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত চুক্তি। তার সঙ্গে কাশ্মীর প্রসঙ্গ ঢুকিয়ে দেওয়া হল কেন? ওই চুক্তির পঞ্চম দফায় বলা হয়েছে—"(v) that they shall always respect each other's national unity, territorial integrity, political independence and sovereign equality." কি অদ্ভুত যুক্তিহীন চুক্তি! পাকিস্তান যে কিভাবে ভারতের কর্ণমর্দন করল এই চুক্তির দ্বারা, তা বোঝার মতো কণামাত্র বোধশক্তিও কি কোন নেতার ছিল না? ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তানী নিয়ন্ত্রণে থাকা কি ভারতের Territorial integrity এবং Sovereignty-কে শ্রদ্ধা দেখানো হল? এ ছিল ভারতের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা, আর যাতে সে কোনদিন পাক এলাকা না দখল করে; কিংবা দখল করে রেখে যেন না দেয়। ভারতের ভূখণ্ডের ভেতর শত্রুসৈন্য আরাম করে বসে থাকবে, আর চুক্তিতে লেখা হবে তারা আমাদের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করবে! কি মনোমুগ্ধকর নির্বুদ্ধিতা নেতাদের!

সিমলাচুক্তির অন্যতম বক্তব্য হচ্ছে—কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি হবে কেবলমাত্র দুপক্ষের আলোচনার দ্বারা। কেন? যখন কোন একটি বিষয়ে অন্যের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তখনই প্রমাণ হয় যে, বিষয়টির মধ্যে অস্বচ্ছতা কিছু আছে, যার জন্য অন্য পক্ষের সঙ্গে বসে আলোচনা ও আপোস মীমাংসার প্রয়োজন আছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও সার্বভৌম ভারতের অংশ। সেখানে জবরদখলকারীর সঙ্গে আলোচনার কিছু নেই। হয় তুমি মানে মানে সরে যাও, নতুবা অস্ত্রমুখে আমি সরাতে বাধ্য হব—সে পরিণামের জন্য তুমি জবরদখলকারীই দায়ী থাকবে। সুতরাং এজন্য কোন মোড়লেরও প্রয়োজন ছিল না, জবরদখলকারীর তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু সিমলাচুক্তিতে (এর পূর্বে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছে পাকিস্তানকে পক্ষ হিসাবে মেনে নিয়ে) কাশ্মীর বিষয়ে আলোচনা করার চূড়ান্ত লাইসেন্স দেওয়ায় পাকিস্তানকে এড়িয়ে কাশ্মীর বিষয়ে স্বয়ং সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ ভারত

চিরকালের জন্য হারিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক যুদ্ধের ফলে ভারত নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করেছে মাত্র,—নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ দিতে আমরা যে প্রবচন বলে থাকি।

স্বাধীনতাপূর্বকালীন নেতাদের এবম্বিধ ভ্রান্তিবিলাসের খেলার পর স্বাধীনোত্তরকালীন নেতারা শুরু করেছেন কাশ্মীরকে নিয়ে রাজনৈতিক বিলাসের খেলা। এই খেলায় উভয় রাষ্ট্রই বিশেষ করে প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের পটুতা সম্ভবত ভারতের চেয়ে বেশি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের গদী তো মূলতঃ নির্ভর করছে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের প্রতি কতোখানি বিদ্বেষমূলক আচরণ করা যায় তার উপর। কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাটে নীলামে তুলেছে মোড়লদের বৈঠকখানা—তার ভারতভুক্তির বৈধতা ও তার জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কণামাত্র মূল্য না দিয়ে। বেনজিরজী নাকি স্থির নিশ্চিত যে, কাশ্মীরে 'গণভোট' নিয়ে নিলেই সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে। কি জন্য গণভোট? কাশ্মীর ভারতেই থাকবে অথবা পাকিস্তানে যোগ দেবে? বেনজিরজী বোধ করি জিন্না সাহেবের মতোই খোয়াবে বিভোর হয়ে রয়েছেন, নতুবা দেখতে পেতেন যে, কাশ্মীর বরং স্বায়ত্তশাসন চাইবে ভারতের মধ্যে থেকে, এমনকি সার্বভৌম স্বাধীনতার জন্যে তারা ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসবে; তবুও কোনদিন পাকিস্তানে যোগ দেবে না। আর যদি গণভোটের অর্থ সার্বভৌম স্বাধীন কাশ্মীর হয়, তাহলে তিনি তাঁর জবরদখলকৃত কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম কাশ্মীর হিসাবে গড়ে দিয়ে ভারতভুক্ত কাশ্মীরের জন্যে গণভোটের দাবি করলে সেটা যুক্তিগ্রাহ্য হত। সেখানে আপনি ধর্ম আচরণ করে অন্যকে শিক্ষা দিতে পারতেন। কিন্তু পাকিস্তানি নেতাদের মুখোশটা বড় উলঙ্গভাবে খুলে যাচ্ছে—যেটা ঢাকা দেওয়া আর কোন প্রকার ছলনাতেই সম্ভব নয়। নতুবা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সম্বন্ধে তিনি বলতে পারতেন না—'কাশ্মীরীরা সকলেই পাকিস্তানী নাগরিক'! যে কাশ্মীরীদের দরুণ বেনজিরজী কেঁদে কেঁদে অন্ধ হতে চলেছেন (তাঁর আব্বাজান তো ভারতের সঙ্গে হাজার বৎসরের যুদ্ধ করার সাধ তথা পবিত্র কাজ অসমাপ্ত রেখে বেহেস্তে অথবা দোজকে চলে গেছেন; তিনিও কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেলে 'কাশ্মীরে অসমাপ্ত কাজ' তথা কাশ্মীর উদ্ধার করবে কে? সেই কাশ্মীরের মুখপত্র তথা সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'Greater Kashmir'-এর ইং ২০।৮।৯৪ তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'An unfinished task' এতে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী লেখা ছাপা হয়েছে, তার কিছু অংশ একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় তুলে দিচ্ছি—

......"The two Prime Ministers of two hostile nations—Pakistan and India—on the eve of their 48th anniversary of Independence Days, 14th and 15th of August, yet again reminded forcefully the post partition generation of the "unfinished

task" during the course of their addresses to their respective nations. Prime Minister of Pakistan Ms. Benazir Bhutto, who is most probably 38 years of age, in her independence day address to the Pakistani nation said categorically that she was destined to complete the "unfinished task" of 1947 partition of British India which meant resolution of Kashmir question in tune with the philosophy central to the rationale of two—nation theory the raison d'eter of Pakistan's statehood. In its common usage in the Pakistani political vocabulary "Unfinished task" refers to the annexation of Kashmir—Pakistan believes this land as its wind pipe—to the territory of this dreamland of Iqbal, Chaudry Rehmat Ali who coined the word Pakistan to denote various geographical units including Kashmir, K stands for Kashmir. Gulam Ishaq Khan, the highly controversial ex-president of Pakistan too emphatically stressed the need of finishing up the "task" whenever he referred to Kashmir question in his official capacity. In her message of felicitations to Indian Prime Minister on the occassion of 15th August, India's Independence Day, Benazir, however, dreamt of establishing a "tension—free and good neighbourly relations" even though the embettered relations between the two countries is felt by some saner elements in both the countries a harrowing signal of an inevitable fourth disastrous Indo-Pak war given the intensity of conflicts and clashes going on intermittently between the two countries on various fronts. Benazir also expressed her willingness to "renew talks on Kashmir with New Delhi provided they were based on holding a PLEBIS CITE in Kashmir". On 15th of August on the remparts of the Mughal monument—Red Fort (Lal Qila)—the elderly P V Narasimha Rao in such a firm tone and tenor replied his Pakistani counterpart which has been otherwise absent in his usual public addresses. He said that the LIBERATION of Azad Kashmir (Pak administrated Kashmir) is lhe "unfinished task". "With you, (Pakistan) without you, inspite of you Kashmir will remain with us" he predicted without being

called by anyone to foretell the future history and geography.

"......Now of late the blood and dignity of the defenseless Kashmiris has become a salable commodity world over. For example Americans Britishers or other champions of human rights without shedding a drop of blood or spending a single penny can build up pressures in the diplomatic spheres in such a cunning way that sometimes Rao feels forced to bow before Clintons and Majors and Benazir thinks it proper to toe the American line even in her likes and dislikes so much so that Clintons and Majors look like master of Pakistan, "the pious land." Some Robin Raphel issues merely a statement snubbing this or that county and advises them about do's and don'ts in Kashmir, nuclear capability etc. that none dares to question her extra-jurisdictional standing. Likewise when faced with grave domestic problems threatening the very chair of Indian or Pakistani rulers, they set into motion the cycle of fiery verbal duels and the "salable commodity", Kashmir, gives them a sure licenses to perpetuate their ugly persons on the seats of governance. To grind their own axes one lays siege around the shrine, the other raise and hue and cry over this "issue" ; one desecrates Babri Masjid the other derives political mileage out of this game least caring to honour religion truly ; one threatns with the nuclear war the other installs the surfaee to surface missiles like Agni, Prathvi and Trishul ; one raises his or her voice against the violation of human rights, the other constitutes powerless Human Rights Commission ; one suggests plebiseite surely the only mechanism of peaceful settlement of Kashmir Issue the other demands "liberation of Azad Kashmir ; one talks of internationnalising the issue the other vows not pay anymore heed to what is said about the issue internationally. This way the gameplan of dirty politics put to use the blood of the Kashmiris for serving his or her own motives and ends. Nobody looks behind as to what the "commodity" itself wants of them.

"......The poor Kashmiris continue to be the worst sufferers

whose history of sufferings is now over burdened with the reports, charges and counter charges. How long the miserable lot shall be commercialised in the international diplomatic arena? How long their blood shall retain sale and resale value? ...”[১৩]

তবে সম্পাদকীয় উক্ত প্রবন্ধটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হলেও প্রবন্ধের অন্যান্য অংশ এবং ঐ পৃষ্ঠাতে লেখা অন্যান্য প্রবন্ধ ভারতের সার্বভৌমত্ব বিরোধী। এ কথা আমি বলতে বাধ্য যে, প্রবন্ধগুলি যে স্থানে বসে লেখা হয়েছে, সেটা যে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য—এ সত্যটা প্রচ্ছন্নভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। ভারতের বিশেষতঃ স্থানীয় প্রশাসন ও মিলিটারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রবন্ধগুলিতে যে প্রকাশ্য অভিযোগ করা হয়েছে, সেই অভিযোগ সম্বলিত সার্বভৌমত্ব-বিঘ্নকারী প্রবন্ধগুলি মুদ্রণ ও প্রকাশের অধিকারই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, অভিযোগগুলি কতোখানি ভিত্তিহীন। আমি স্বয়ং ঐ সময়ে প্রায় দেড়মাস সমগ্র কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের মধ্যে (লাডাক, কাশ্মীর ও জম্মু) ঘুরে বেড়িয়েছি, ঐ কাগজে বর্ণিত কেন্দ্রীয় শাসনের ও মিলিটারীর তথাকথিত অত্যাচার দেখতে পাইনি। কেন আজ সৈন্যবাহিনীকে বেশি পরিমাণে কাশ্মীরে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে এবং কেনই বা গণতান্ত্রিক ভারতকে ওখানে নির্বাচন স্থগিত রাখতে হচ্ছে এর একটু প্রসঙ্গ উক্ত সম্পাদকীয় লেখায় থাকলে বুঝতাম সাংবাদিক মহোদয় ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লিখেছেন। ঐ প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই ধরনের একটা সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে যেন ভারতের সৈন্যবাহিনী একটা ভিন্ন রাজ্যে জোরপূর্বক জেঁকে বসে আছে।

কিন্তু আমি সাধারণ কাশ্মীরীদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি—তারা নির্বাচন চায়, কাজ চায়, শিল্পায়ন চায়, আর চায় শান্তি। সার্বভৌম স্বাধীন কাশ্মীর চাওয়ার বিষয়ে কোন ধনাত্মক মতবাদ দেখলাম না। এটা কেবল চাইছে J K L F এবং কাশ্মীরের কিছু বুদ্ধিজীবী মহল—ভারত ও পাকিস্তানের বিবাদের ফসল যারা ঘরে তুলতে চায়। স্বাধীন কাশ্মীরের দাবি যদি তাদের যথার্থই হত, তাহলে ভারতের দিকে নয়, ভারত ও পাকিস্তানের সীমানায় বসে রাইফেলের নলগুলি পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে তারা সন্ত্রাসবাদীদের পরামর্শ দিতেন। কারণ ভারত তো গায়ের জোরে কাশ্মীর অধিকার করেনি পাকিস্তানের মতো। যে দেশ জোর করে কাশ্মীরের ভূমি দখল করেছে—স্বাধীনতার জন্যে লড়াইটা তার সঙ্গেই প্রথমে হওয়া উচিত। আর এই রাজনৈতিক দাবার খেলায় উভয় রাষ্ট্রই ভাবছে কিস্তিমাতের চালটা সেই দেবে; কিন্তু পথ, রথ ও মূর্তি যাই ভাবুক, অন্তর্যামী বাবুরা মুচকি মুচকি হেসে চলেছেন পুতুলদের সুতোর টানে নাচাতে নাচাতে। পরিশেষে এই অধ্যায়ের উপসংহারে এই কথাই বলব যে, কংগ্রেসের নীতিতে অজস্র ভ্রান্তি থাকলেও তাঁদের আন্তরিকতার কোন

অভাব ছিল না। তাঁরা ছিলেন দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত প্রাণ, এবং আজও তাঁরাই মূলত বর্তমান ভারতের রূপকার।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. India Wins Freedom / Maulana Abul Kalam Azad / Orient Longman, 1989 / p. 202.

২. ভারতে মাউন্টব্যাটেন / অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন / আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী—১৩৫৯ বঙ্গাব্দ / পৃ ২৪২-২৪৩।

৩. The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books / New Delhi 1992/ p. 173.

৪. ভারতে মাউন্টব্যাটেন / অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন / আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী—১৩৫৯ বঙ্গাব্দ / পৃ. ২৪৬।

৫. The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books / New Delhi 1992/ p. 98, 111.

৬. India Wins Freedom / Maulana Abul Kalam Azad / Orient Longman—1989 / 227.

৭. ভারতে মাউন্টব্যাটেন / অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন / আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী—১৩৫৯ বঙ্গাব্দ / পৃ. ২৪১।

৮. The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books / New Delhi 1992/ p.96.

৯. Kashmir Towards Insurgency / Balraj Puri / Orient Longman—1993 / p. 18.

১০. The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian /Vision Books / New Delhi 1992/ p. 119-120.

১১. ibid / pp. 107-108.

১২. আনন্দবাজার পত্রিকা / ১০-৭-৯৩ / পৃ. ৪।

১৩. Greater Kashmir / 20.8.94 / p. 4.

অষ্টবিংশ অধ্যায়

প্রায়শ্চিত্ত

ভারত ভাগ করে এবং ভাগের পর কাশ্মীর সংক্রান্ত নীতিতে একের পর এক ভুল করে ['ভারত ভাগে কংগ্রেসের ভূমিকা' এবং 'ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতি' দ্রষ্টব্য] আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্ণধারেরা যে পাপ করেছেন, এখন দেশবাসীকে [যেহেতু দেশবাসী তাঁদের নেতা বানিয়েছিলেন] নেতাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং করাই উচিত। তাঁরা আজ দেশকে যে সর্বনাশের মুখে এনে ফেলেছেন, তাতে কাশ্মীর রক্ষার জন্য বর্তমানের একটা আণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া যায় না বা তাকে রক্ষা করার জন্য প্রতি বৎসর ৫০০ কোটি টাকার ক্রমবর্ধমান খরচ দীর্ঘকাল ধরে বহন করাও সম্ভব নয়। উভয় দেশই এই বাবদ যে ভাবে লাগামহীন খরচ করে চলেছে, তাতে ফলভোগ করছে উভয় দেশেরই জনগণ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে চিরসাথী করে। কিছু বুদ্ধিজীবী ক্ষমতালোভী সাম্প্রদায়িক মুসলমান কাশ্মীরসহ রাষ্ট্রগঠনের কল্পনায় যখন PAKISTAN গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তা প্রকাশ্যে ; তখন কেন নেতারা তাদের এই পরিকল্পনায় বাধা দেননি ? তাঁরা তো লুকিয়ে লুকিয়ে ভারতভাগ করে নিয়ে যাননি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা প্রকাশ্য ঘোষণা করেই ঐ নাম তাঁদের রাষ্ট্রের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। PAKISTAN নামসহ ঐ রাষ্ট্রকে জন্ম নিতে দেওয়ার অর্থ 'K' তথা Kashmir তাদের রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকবে এটা তখন প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের রাষ্ট্রকে তারা সম্পূর্ণ করার জন্য কাশ্মীরকে পাবার আশা অবশ্যই করতে পারেন ; কেবল এই বিবেচনায়, গণচরিত্রের বিবেচনায় নয়, আমি পাকিস্তানের খুব বেশি ত্রুটি দেখি না। তার সংগে যুক্ত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান খোয়ানোর আক্রোশ। কাশ্মীরে আক্রমণ এবং কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবে পশ্চাত জংগী আন্দোলন পাকিস্তান সেজন্যই গড়ে তুলেছে। কাশ্মীর সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে আশা করা ভুল হবে না যে, উগ্রপন্থী আন্দোলনও বন্ধ হয়ে যাবে। উগ্রপন্থী আন্দোলনকে কাশ্মীরের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ কণামাত্র সমর্থন করে না মনে প্রাণে ; যেটুকু তাদের তারা সহযোগিতা দেয়, সে কেবল রাইফেলের মুখে। কাশ্মীরের জনগণ কখনই পাকিস্তানের সংগে যুক্ত হবে না। কারণ, প্রথমত কাশ্মীরী হিন্দুরা হিন্দু নিপীড়নের ভয়ে রাজি হবেন না ; দ্বিতীয়ত কাশ্মীরী মুসলমানেরাও পাকিস্তানে যোগ দেবেন না এই কারণে, তারা যে-কোন বিধর্মীর চেয়ে আফগান বংশজদের এবং বালুচদের বেশি ভয় ও ঘৃণা করেন। কাশ্মীরী মুসলমানদের প্রায় ৯০ শতাংশ হিন্দু বংশোদ্ভূত। তারা নামেই কেবল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাদের সভ্যতা ও সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতিনীতি এখনও হিন্দু বিধিনিয়ম ধরে চলে। এমনকি মুসলমানদের যে প্রিয় খাদ্য গরু, কাশ্মীরী মুসলমান-

দের কাছে তা হারাম। কেউ যদি গরু খেয়ে ফেলে, তবে তাকে কারাবাসসহ প্রচুর অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রায় ৭১ বৎসর পূর্বে পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ করে যে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন তাঁর সেই বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি: "কাশ্মীরীরা বাঙ্গালীর ন্যায় দুইবেলা ভাত খায়, এবং হিন্দু ও মুসলমান সকলেই মাছ-মাংসভোজী। কিন্তু মুসলমানেরা গো-বধ করিতে অথবা গো-মাংস খাইতে পারে না। যদি কোন মুসলমান গো-বধ করে অথবা গো-মাংস খায়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হয়, তাহার কারাবাস ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়"[১] [৭০ বৎসর আগের ৫০ টাকা আজকের মূল্যে তা কমপক্ষে চার হাজার টাকা]। বর্তমানে অবশ্য এই প্রথা শিথিল হয়ে গেছে।

মহারাজা রণবীর সিংহের আমলে কাশ্মীরী মুসলমানেরা একবার বারাণসীর হিন্দু কর্তাব্যক্তিদের কাছে এসেছিলেন, তাঁদের হিন্দু করে নেবার জন্য আবেদন নিয়ে।[২] কিন্তু তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু নেতারাই ভারত ভাগ করে এবং কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টি হতে দিয়ে পাপ করেননি, ঐ সমস্ত হিন্দু ধ্বজাধারী হিন্দুধর্মের কিছু কলঙ্কিত ব্যক্তি কাশ্মীরীদের ফিরিয়ে দিয়ে যে পাপ করেছিলেন, তা নেতাদের পাপের চেয়ে কম ছিল না। সুতরাং ক্ষমতাসীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং হিন্দুসমাজ উভয়েই সমান পাপী। যুগ যুগ ধরে মানুষ জাতির প্রতি হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা অনেক পাপ করে এসেছেন, এখন তাঁদেরও সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে। সেজন্য আমি কয়েকটি মূল প্রস্তাব তাঁদের উত্তরসূরীদের কাছে রাখতে পারি,—

এক, যেহেতু তাঁরা জেনেশুনে কাশ্মীরসহ পাকিস্তান গঠনের ঐ নাম গ্রহণে আপত্তি না দিয়ে ভারতভাগ করেছিলেন, সেহেতু তাদের রাষ্ট্রের নামের মর্যাদা ও অর্থ রক্ষা করার জন্য কাশ্মীরের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া একান্ত উচিত। সর্বনাশের মুখে অর্ধেক না হলেও কিছু অংশ দিয়ে শান্তি স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। এবং পাকিস্তানেরও সেটা মেনে নেওয়া উচিত। কারণ তাদেরও সেটা মনে রাখা উচিত যে, তারা PAKISTAN হিসাবে রাষ্ট্রের নামকরণ বড় অংশীদার কংগ্রেসের প্রকাশ্য অনুমোদন নিয়ে করেননি। সুতরাং ভুল উভয় পক্ষেরই। কংগ্রেস শেষ মুহূর্তে ২৯—১৫ ভোটে ভারতভাগে সম্মত হয়েই দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন, যে ভবিষ্যদ্বাণী সত্যদ্রষ্টা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ করেছিলেন। সুতরাং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখন দেশবাসীকে করতে হবে।

দুই, যেহেতু বারাণসীর হিন্দুসমাজ কাশ্মীরী ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন, এখন তাঁদের কাছে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করার জন্য পাল্টা বিনীত প্রস্তাব প্রেরণ করা উচিত, এবং তা অনতিবিলম্বে। হিন্দু থেকে যদি মুসলমান হওয়া যায়, মুসলমান থেকে হিন্দু হওয়া যাবে না কেন? যে-কোন ধর্ম থেকে যেখানে মুসলমান বা খৃষ্টান ইত্যাদি হওয়া যায়,

সেখানে অন্যান্য ধর্মবিলম্বী থেকে হিন্দু হওয়া যাবে না কেন? পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মেই প্রবেশ ও প্রস্থান দুই আছে; একমাত্র হিন্দুধর্মেই প্রস্থান আছে; কিন্তু প্রবেশ নেই। হিন্দুধর্মের কিছু সংকীর্ণতাবাদই একদিন হিন্দু-ধর্মের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল, যার থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিলেন অবতার শঙ্করাচার্য ও শ্রীচৈতন্য। আমি যে-কোন হিন্দুকে আহ্বান করছি, আমার মতো অন্ধজনকে একটু দেখিয়ে দিতে, হিন্দু শাস্ত্র-পুরাণাদিতে কোথায় নির্দেশ আছে যে, অন্যান্য ধর্মবিলম্বীদেরকে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করা যাবে না; বিশেষত হিন্দুধর্ম যেখানে অন্যান্য ধর্মের মতো সুসংজ্ঞায়িত ও সুনির্দিষ্ট নয়? অবশ্য এ নিয়ে আমার সঙ্গে মতভেদ আছে। হিন্দুদের ধর্ম সুসংজ্ঞায়িত না হলেও এখন যে অবস্থাকে হিন্দুধর্ম বলা হচ্ছে, তার ভিত্তিতে তাকে হিন্দুধর্ম হিসাবে মেনে চলার বাধা নেই। সুসংজ্ঞায়িত বিধিনিয়মসহ কোন ধর্মই আকাশ থেকে পড়ে সৃষ্টি হয়নি,—সমস্ত কিছুই ক্রমবিবর্তিত রূপ। সুতরাং হিন্দুধর্ম—হিন্দু-ধর্মই। শুধু কাশ্মীরের মুসলমানদের কেন, ভারতের যে-কোন রাজ্যের মুসলমান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে চাইবেন, তাঁর জন্য সকল সময়েই হিন্দুদের হৃদয়ের দরজা খোলা রাখা উচিত।

তিন, যেহেতু ভারতভাগের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভারত-পাক যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে বাধ্য না করে বিজয়ী সৈন্যদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, নেতাদের ও ভারত সরকারের সে পাপের প্রায়শ্চিত্তও আমাদের করতে হবে।

সুতরাং ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ এবং হিন্দুসমাজ যে পাপ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে দুটি পর্যায়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত—

প্রথম পর্যায়:

(ক) সমস্ত রকম মতামতকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার এপার থেকে অতি দ্রুততার সঙ্গে জঙ্গীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

(খ) জঙ্গী দমন হওয়ামাত্র কাশ্মীরীদের নির্বাচন করে তাদের গণতান্ত্রিক অধি-কারকে ফিরিয়ে দেওয়া।

(গ) ৩৭০ ধারা-সহ নেহেরু-আবদুল্লাচুক্তি বাতিল করে কাশ্মীরকে অন্যান্য রাজ্যের সমপর্যায়ে আনা।

(ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।

(ঙ) গণচরিত্র পরিবর্তনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

(চ) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বরাবর ভারত সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায় :

পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে স্থায়ী সমাধানকল্পে আলোচনায় বসার জন্য সময়-সীমা নির্দিষ্ট করে পাকিস্তানকে চরমপত্র দেওয়া। যদি পাকিস্তান আলোচনায় বসে, তাহলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কিছু ছাড় রফা করে মীমাংসা করে নেওয়া। আর যদি মীমাংসায় বসতে না রাজি হয়, বা টালবাহানা করে, সেক্ষেত্রে অস্ত্রমুখে মীমাংসা করা। রাষ্ট্রনেতাদের মনে রাখা উচিত আপোস-মীমাংসায় কদাচিৎ কোন দেশের মানচিত্রে পরিবর্তন হয়। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগেই মীমাংসা হয়েছে যা দেশের মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। ভারতের ও পাকিস্তানের মানচিত্র, পূর্ব-পাকিস্তানের মানচিত্র, তিব্বত, রাশিয়া, প্রভৃতি দেশের মানচিত্রে পরিবর্তন এসেছে একমাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। অবশ্য শক্তি থাকলেই তা প্রয়োগ করা চলে না— যেটা করেছে চিন—আমি সে আলোচনায় পরে আসছি। শক্তির প্রয়োগ কেবলমাত্র অশুভ শক্তিকে বিনষ্ট করতে ও পররাজ্য লোভীকে দমন করতে হওয়া উচিত।

এবারে আসা যাক কিভাবে চিরস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভূখণ্ডের ভাগ-বাটোয়ারা করা যাবে—এই প্রশ্নে। প্রাজ্ঞজনে বলেন—রোগ, ঋণ, শত্রু ও সমস্যার শেষ রাখতে নেই। তাই কাশ্মীর সমস্যার নিঃশেষে সমাধানকল্পে কাশ্মীর ভূখণ্ড থেকে কিছু ছেড়ে মীমাংসা করার এই সূত্রে প্রসঙ্গে আমার মতের সঙ্গে যাঁরা সহমত হবেন, তাঁদের হয়ত কেউ কেউ বলবেন যুদ্ধবিরতি রেখাকে আন্তর্জাতিক রেখা করে দখলীকৃত কাশ্মীরকে বরাবরের জন্য পাকিস্তানকে দিয়ে শান্তিচুক্তি করে নিতে। যেমন প্রস্তাব দিয়েছেন খোদ রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতি-নিধি ফারুক আবদুল্লা সাহেব।[১] এ প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপস্থিতিতে। দেশের ও সরকারের অভিমত না যাচাই করে এই অবিমৃষ্যকারী প্রস্তাব তিনি কেন দিয়েছেন সেটা অবশ্য ভারত সরকার ভেবে দেখবেন। তবে ভারত যে কিছু অংশ ছেড়ে মীমাংসা করতে নীতি-গতভাবে রাজি আছে, সিমলা চুক্তিতে কাশ্মীর বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি তা প্রমাণ করে। আর এখন সে আভাস পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় প্রতিনিধির প্রেস কনফারেন্সে। কিন্তু আমি মনে করি যুদ্ধবিরতি রেখাকে উভয় দেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা করলে ভারতকে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। কিন্তু পাকিস্তান যে-কোন অংশ প্রাপ্তিতেই লাভবান।

এখানে মনে রাখতে হবে পাকিস্তানকে কিছু ভূখণ্ড ছাড়ার প্রস্তাব হচ্ছে কেবল নৈতিক কারণে তাদের রাষ্ট্রের নামের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য এবং ভারতীয় নেতাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। নচেৎ আইনগত প্রশ্নে তারা কাশ্মীরের এক ইঞ্চি জমিও পেতে হকদার নয়। যদি পাকিস্তান ভুলেও মনে করে থাকে, ভারত পাকিস্তানের সামরিক শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে এই প্রস্তাব করছে, তাহলে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করবে। কারণ, চতুর্থ ভারত-পাক যুদ্ধে (যদি তার মোড়ল আমেরিকা ও চিন সাহায্য না করে) পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বই মুছে যেতে পারে,—সেটা

পাকিস্তানকে মনে রেখেই ভারতের সঙ্গে মীমাংসায় বসতে হবে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে ভারতের তরফে এই প্রস্তাব রাখা হোক,—জম্মু ও কাশ্মীর ভূখণ্ডের ৭৪° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা বরাবর উভয়রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সীমারেখা করা এবং পাকিস্তানেরও তা মেনে নেওয়া উচিত।

আপোস মীমাংসা দ্বারা অথবা যুদ্ধ দ্বারা যেভাবেই ভারত-পাক সীমানা পুনঃ নির্দিষ্ট হোক, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ যে সমস্ত আফগান ও বালুচ উদ্বাস্তু এবং পাক নাগরিক পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছে, তারা ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবে কিনা এবং আনুগত্য স্বীকার করবে কিনা—সেটি বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে। সীমানা সংক্রান্ত রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেও ঐ স্থানে বসবাসকারীদের দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ও সামাজিক সমস্যাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবার আশংকা থাকবে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের সংগে পুনর্বাসন সমস্যাটিরও যুগপৎ সমাধান করতে হবে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের হিন্দু নাগরিকদের সঙ্গে বিনিময় করে নেওয়াটাই সর্বোত্তম পন্থা হবে। চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণ সাপেক্ষে উদ্বাস্তু আফগান ও বালুচ এবং পাকিস্তানিদের ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত করলেও বা তারা অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হলেও তাদের মানসিক একান্ত আনুগত্য থাকবে পাকিস্তানের প্রতি অথবা লক্ষ্য থাকবে সার্বভৌম স্বাধীনতার প্রতি। এটা উলঙ্গ সত্য। সেক্ষেত্রে ভারতের প্রতি অনুরূপ মানসিক আনুগত্যপূর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে বিনিময়ই একমাত্র সমাধানসূত্র হওয়া উচিত।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষজ্ঞ যেমন শ্রীযুক্ত কুলদীপ নায়ার[৪] এবং শ্রীযুক্ত এ. জি. নুরানী[৫] কাশ্মীরকে এক পক্ষ ধরে অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান ও কাশ্মীর—এই ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সিমলা চুক্তির কার্যকারিতাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা যদি আর একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন বর্তমানে এ সমস্যার মধ্যে আর একটি পক্ষ অদৃশ্যভাবে এসে পড়তে চাইছে—সে হচ্ছে আমেরিকা। আমি সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। উভয় বিশেষজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই আমি তাঁদের সঙ্গে সহমত হতে পারছি না। পারছি না, তার কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ—

১। সিমলা চুক্তি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি,—যেটি তার মর্যাদা হারাবে [যদিও আমি পূর্বে দৃঢ়ভাবে বলেছি যে সিমলা চুক্তিতে কাশ্মীর বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ভারত সরকারের অদূরদর্শিতার অন্যতম স্বাক্ষর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যেহেতু তা করা হয়ে গেছে, তাকে মেনে চলতে ভারত বাধ্য]।

২। কাশ্মীরকে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে দেখার অর্থ, তার ভারতভুক্তির বৈধতাকে অস্বীকার করা এবং আমেরিকার সহকারী বিদেশ সচিব শ্রীমতী রবিন রাফায়েলের মন্তব্য ("We view Kashmir as a disputed territory"[৬])-কে

মেনে নেওয়া।

৩। এ যদি সেই সমস্যার মীমাংসা হয়, যে সমস্যা ভারত অন্তর্গত কাশ্মীরে বর্তমান,—সেক্ষেত্রে মীমাংসা হবে ভারত এবং তার অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের সঙ্গে; সেখানে পাকিস্তানের পক্ষ হবার কোনও অধিকার নেই,—সিমলাচুক্তির অন্তর্নিহিত অর্থও তা নয়। আর, এ যদি সেই সমস্যার মীমাংসা হয়, যে সমস্যা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের, সেখানে মীমাংসা হবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি অনুযায়ী। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের প্রশ্ন আসে না, প্রয়োজনও নেই। বরং তা করতে গেলে সমস্যাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা হবে।

৪। একথা সত্য যে, কাশ্মীর বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি স্বাধীন ভারতের ইংরেজ বড়লাট ভারতের দুষ্টগ্রহ নেহেরু বন্ধু মাউন্টব্যাটেন দিয়েছিলেন। ২৬।১০।৪৭ তারিখে মহারাজার পত্রের উত্তরে ২৭।১০।৪৭ তারিখে ভারতভুক্তি স্বীকার করে নিয়ে বড়লাট সাহেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা এই প্রকার, "It is my Government's wish that as soon as law and order have been restored in Kashmir and her soil cleared of the invaders, the question of the State's accession should be settled by a reference to the people..."[১] কিন্তু একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিলে দেখা যাবে যে, সে ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে তখনই, যখন—

(ক) আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, এবং (খ) হানাদারেরা কাশ্মীরের মাটি থেকে সরে যাবে।

সুতরাং একমাত্র এরকম পরিস্থিতিতেই কাশ্মীরবাসীদের পক্ষ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, তার আগে নয়। অর্থাৎ কাশ্মীরবাসীদের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য হানাদারদের উপস্থিতি, বর্তমান উগ্রপন্থী কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক মোড়লদের মোড়লিপনা যতক্ষণ থাকবে,—ততক্ষণ কাশ্মীরীদের মতামতে স্বাধীন চিন্তার প্রতিফলন থাকবে না। কোন কোন প্রাজ্ঞ প্রশ্ন তুলবেন যে, ভারতের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও তো কাশ্মীরীরা প্রভাবিত হতে পারে? সেক্ষেত্রে তাঁদের মনে রাখতে হবে ইতিহাসকে যে, ভারত কাশ্মীরে দখলকারী নয়। কাশ্মীর স্বেচ্ছায় ভারতে যোগদান করায় ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে সেখানে ভারতীয় প্রশাসন বলবৎ আছে ও থাকবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সারা পৃথিবী তা মেনে নিতে বাধ্য।

সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙে যাওয়ার ফলে পৃথিবী তার শক্তির ভারসাম্য হারিয়েছে। এখন পৃথিবীর একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা আমেরিকা। পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকে যেমনই পেয়েছে ধনতান্ত্রিক আমেরিকা ও ব্রিটিশের অকৃপণ সাহায্য ও সমর্থন, তেমনই সে সংগ্রহ করেছে সমাজতান্ত্রিক চিনের সহানুভূতি ও

সমর্থন। সুতরাং সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পর আজ ভারত একঘরে ও অসহায়। এজন্য তার পররাষ্ট্র নীতি বহুলাংশে দায়ী। চীনের দিক থেকেও সে কোন সহযোগিতা পাবে না ; কারণ সে নিজেই সেখানে ভারত ভূখণ্ডে আকসাই চিনের ও অরুণাচলের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে রেখেছে। সুতরাং কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমেরিকা নিজের হাতে নিতে চাইছে। কারণ, আমেরিকা বর্তমানে চাইছে কাশ্মীর রাজ্য ভারত বা পাকিস্তান কোনও রাষ্ট্রেরই অঙ্গরাজ্য না হয়ে তার তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠুক। শ্রীমতী রবিন রাফায়েলের মন্তব্য এজন্যই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কাশ্মীরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে না গড়ে তুলতে পারলে সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণ রোধে রাষ্ট্রগ্রন্থি কাশ্মীরকে ব্যবহার করা যাবে না। সেজন্য কাশ্মীরের সার্বভৌম স্বাধীনতা এখন আমেরিকার কাছে একান্ত কাম্য। সুতরাং পাকিস্তান যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়, তাহলে সিমলা চুক্তিকে সম্মান দেখিয়ে এবং আমেরিকা ও ব্রিটিশের কূট চালে বেশি করে জড়িয়ে পড়বার পূর্বেই ভারতের সঙ্গে পাক দখলীকৃত কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা করে নেওয়া দরকার। নতুবা দুই বিড়ালকেই পরে আফসোস করতে হবে।

পাকিস্তানের সঙ্গে মীমাংসা হয়ে যাবার পর ভারত সরকারের উচিত হবে চিনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় বসা। চিনও আকসাই চিনসহ অরুণাচল পর্যন্ত ভারতের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড জবরদখল করে আছে। শক্তিমানের অন্যায় গণনীয় হয় না, বিশেষ যদি সে আবার মোড়ল হয়। কি দাবির ভিত্তিতে চিন ভারত ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা জবরদখল করে আছে, তার বিবরণ দেশবাসীকে জানানো হোক। ১৯১৩ সালে সিমলায় ভারত, স্বাধীন তিব্বত এবং চিন—এই ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে সীমান্ত নির্ধারিত হয়। ঐ বৈঠকে তৎকালীন ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব ম্যাকমেহন প্রতিনিধিত্ব করায় উক্ত সীমান্ত 'ম্যাকমেহন লাইন' নামে পরিচিত হয়। কিন্তু পররাজ্যলোভী চিন ১৯৫০ সালে তিব্বত দখল করে নিলে পৃথিবীতে একটুও উচ্চবাচ্য হল না,—কারণ সে শক্তিমান, কারণ সে মোড়ল। সেই স্বাধীন তিব্বতের রাষ্ট্রপ্রধান আজও ভারতে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছেন। তারপর ১৯৫৪ সালে চৌ এন লাই যখন ভারত সফরে এসেছিলেন, সে সময় তাঁকে বলা হয় যে, চিন তার মানচিত্রে ভারতের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল চিনের বলে দেখিয়েছে। হিন্দী-চিনী ভাই-ভাই, পঞ্চশীল ইত্যাদির গালভরা কথায় ভুলিয়ে রেখে এবং সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৬২ সালে ভাইয়ের বুকে ছুরি চালিয়ে আকসাই চিনের ১৪ হাজার বর্গমাইল সহ অরুণাচল পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল ভারত ভূখণ্ড চিন গ্রাস করে নেয়। চিন যুদ্ধের পর যে নিয়ন্ত্রণরেখা [Line of Actual Control বা LAC] সৃষ্টি হল তার ওপারে রয়ে গেল ভারত ভূখণ্ডের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল। এদিকে পাকিস্তান দখল করে আছে কাশ্মীরের ৩৩ হাজার বর্গমাইল ; অর্থাৎ চিন ও পাকিস্তান

মিলে ভারতের প্রায় ৮৩ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড গ্রাস করে বসে আছে,—যা উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনাই ভারত সরকার সৃষ্টি করতে পারেনি। যেহেতু ভারতের ভূখণ্ড দুটি দেশ জবরদখল করে আছে, তা তাদের অধিকারে রাখবার জন্য রাজনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে দুই দেশ দুই মেরুতে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাদের অশুভ আঁতাত নজর কাড়ার মতো। চিনের জবরদখলকৃত ভূখণ্ড উদ্ধারের কোন প্রচেষ্টা ভারত করতে তো পারেইনি, বরং গত ৭।৯।৯৩ তারিখে ভারত-চিন নিয়ন্ত্রণরেখাকে উভয় দেশের সীমান্ত বলে স্বীকার করে নিয়ে খসড়া চুক্তিপত্রে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও স্বাক্ষর করে এসে ভারতের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড চিনকে দান করে এসেছেন।[৮]

চিনের এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে ভারতে যাঁরা চিন-রাশিয়ার সাম্যবাদের মহান বাণী প্রচারের ব্রত কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাঁরা একটি টুঁ শব্দও করেননি। এমনকি ঐ যুদ্ধে ভারতই যে মূঢ় আক্রমণকারী ছিল, এই তত্ত্ব প্রচারেও তাঁরা প্রয়াস চালিয়েছেন। যাঁরা পররাজ্যলোভী ও তাদের সমর্থনকারী হয়, তাঁরা আর যাই হোক, প্রকৃত সাম্যবাদী নন। কাগজে কলমে পঞ্চশীল নীতিতে স্বাক্ষর করব, আর কালি শুকোতে না শুকোতে হিন্দী-চিনী ভাই ভাই বলতে বলতে ভাইয়ের ভূখণ্ডে কামড় বসাবো—এ প্রতারণার কোন উদাহরণ নেই।

যদি চিনের এই দাবি হয় যে, লাদাক বা লাদাকের অংশবিশেষ এবং ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করে ভারত ভূখণ্ডের আরও কিছু অংশ চিনের কোনকালে ছিল, যেজন্য তাদের তা চাই ; এবং রাষ্ট্রের ভাঙাগড়া মূলে গড়ে ওঠা পুনর্গঠন যদি সে না মানে, তাহলে ভারতও বলতে পারে একদা আফগানিস্তান থেকে ব্রহ্মদেশ সীমান্ত পর্যন্ত এবং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পাণ্ডব সাম্রাজ্য বা অশোকের সাম্রাজ্য ছিল, সুতরাং ভারতও আফগানিস্থান থেকে ব্রহ্মদেশ সীমান্ত পর্যন্ত দখল করে নেবে,—যেহেতু ঐ সমস্ত দেশগুলির চেয়ে তার গায়ের জোর বেশি আছে বলে? রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়েও ভারতের লাভ হবে না ; কারণ চিন সে বৈঠকখানার অন্যতম মোড়ল। সুতরাং প্রথমে আপোস-মীমাংসা মূলেই সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। অবশেষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলে করতে হবে। কারণ অন্যায় প্রশ্রয়কে তো মেনে নেওয়া যেতে পারে না। আজ রক্তমুখী ড্রাগন ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করে ভারত ভূখণ্ডের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল এলাকায় থাবা বসিয়েছে ; কাল সে গাড়োয়াল, বা হিমাচল প্রদেশ বা সিকিম বা অরুণাচল প্রদেশের আরো খানিকটা করে অংশে থাবা বসাতে চাইবে। আগ্রাসী পররাজ্যলোভীদের ছলের অভাব হবে না কোনদিন, আর তাদের ঐ জঘন্যতম কাজকে সমর্থন করার মতো দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদেরও অভাব হবে না কোনদিন।

ছিন্ন অঙ্গ ভারতমাতা আজ পুনরায় বিপন্না। পরদেশী শয়তানেরা আজ তাঁর মস্তকে ক্ষত সৃষ্টি করতে চাইছে এবং সেইসঙ্গে তাঁর গাত্রে বিস্ফোটক সৃষ্টি করে

চলেছে। আমি ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে একটু চক্ষুষ্মান হতে আহ্বান করছি। দলের উন্নতির মধ্যে দেশের উন্নতি নিহিত আছে, আমি স্বীকার করি ; কিন্তু অগণিত দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নয়। অগণিত দল যদি দলীয় উন্নতিতে নিযুক্ত থাকে —থাকবেই, তাহলে দেশের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য যদি হয় দেশজননীর উন্নতি, সেক্ষেত্রে একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হয়ে ছোট ছোট দল এবং আঞ্চলিক দলগুলি বড় দলের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে সারা ভারতে দুটি কি তিনটি দল গঠন করা যায় না, যেমন বাণিজ্য জোট গঠিত হয় ;—ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ? লক্ষ্য তো একটাই—একের রাজনৈতিক, অন্যের বাণিজ্যিক। আমার যে কণা পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আছে, তা দিয়ে আমি দেখতে ও বুঝতে পারছি,—অফুরন্ত সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ার এবং পররাষ্ট্র নীতিতে ব্যর্থ হওয়ার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ অসংখ্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলীয় অস্তিত্ব ও উন্নতির চেয়ে দেশজননীর অস্তিত্ব ও উন্নতি কি অধিক কাম্য নয় ? অসংখ্য দলের অগণিত নেতৃবৃন্দ সকলেই কেউ জাত-পাত, কেউ ধর্ম, কেউ বর্ণ ইত্যাদিকে উপলক্ষ করে ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে গিয়ে কেউই অভিন্ন ও অভ্রান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছেন না ; তার মূল্য দিতে হচ্ছে দেশজননীকে।

হে ভারতমাতার সন্তান ভেবে দেখুন, কেউই ফোঁটা কি টিকি, দাড়ি কি সুন্নত, পৈতে কি গেরুয়া প্রভৃতি চিহ্নে ভূষিত হয়ে জননী জঠর থেকে পৃথিবীর আলো দেখেননি ; এই চিহ্নগুলি আমরা মানুষই সৃষ্টি করেছি—কোনটি ত্যাগের, কোনটি তিতিক্ষার, কোনটি বৈরাগ্যের, কোনটি সেবার স্মারক হিসাবে। আরও ভেবে দেখুন, আপনি যিশুর ভজনা করবেন কিম্বা মুসার, বুদ্ধের কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের,—কেউ আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি করিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠাননি ; তার কারণ, এঁরা ভিন্ন নামে একই ঈশ্বর,—মহাসমুদ্রে মিলিত এঁরা একই উৎস থেকে উৎসারিত বিভিন্ন স্রোতধারা মাত্র। কিন্তু আমাদের দেশ একটাই,—সেই সোনার দেশ, সেই রূপকথার দেশটির নাম ভারত ; আমরা সেই অদ্বিতীয় দেশের গর্বিত অধিবাসী,—যাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় কোন চিহ্নে কিম্বা কোন ধর্মে কিম্বা কোন গোষ্ঠীতে নয়,—সে পরিচয় আমাদের ভারতীয়ত্বে। তাই সদর্পে মহামিলনের মহামন্ত্র উচ্চারণ করে বলুন,—ভারতের মাটি আমাদের জননী-জঠর, ভারতের বাতাস আমাদের নিঃশ্বাস, ভারতের নদ-নদী আমাদের ধমনী, ভারতের জলবায়ু আমাদের প্রাণ,—আমরা অমৃতের সন্তান। আমরা ভারতবাসী।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১. কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ / শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ / পঞ্চম সংস্করণ—১৩৯১ / পৃ ৫৯।

২. The Kashmir Tangle / Rajesh Kadian / Vision Books / New Delhi 1992 / p 50.
৩. আনন্দবাজার পত্রিকা / ৭-১১-৯৩ / পৃ ৫।
৪. The Statesman / 3.11.93 / p 8.
৫. ibid / 12,12.93 / p 8.
৬. ibid / 30.10.93 / p 1.
৭. The Kashmir Question / K. Sarwar Hasan / Pakistan lustitnte of International Affairs / Karachi 1966 / p 57.
৮. বর্তমান / ১৭-৯-৯৩ / পৃ ৪।

পরিশিষ্ট (ক)

[ঘটনাপঞ্জী : রাজ্যাধিকার কেন্দ্রিক]

২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ (প্রায়) : অর্জুন কর্তৃক কাশ্মীর বিজয় এবং অঙ্গরাজ্য হিসাবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি।

২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ—৩২৭ খ্রীঃ পূঃ : পাণ্ডব ও পৌরব বংশের অধীনে গোনর্দ (বা গোনন্দ) বংশের অধিকার।

৩২৬ খ্রীঃ পূঃ—৩২১ খ্রীঃ পূঃ : সেকেন্দার শাহের কাশ্মীর অধিকার।

৩২০ খ্রীঃ পূঃ—১৮৭ খ্রীঃ পূঃ : মৌর্য অধিকার / কাশ্মীর থেকে অশোকের বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার শুরু।

১৮৬ খ্রীঃ পূঃ—১৪ খ্রীঃ : ব্যাকট্রিয় গ্রীক অধিকার।

১৫ খ্রীঃ—৩৫০ খ্রীঃ : কুশাণ অধিকার / কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন।

৩৫১ খ্রীঃ—৬০০ খ্রীঃ : হূন অধিকার / মিহিরগুল কর্তৃক কাশ্মীর উপত্যকায় অকথ্য অত্যাচার।

৬০০ খ্রীঃ—৮৫৫ খ্রীঃ : কারকোট (নাগ) বংশের অধিকার / ললিতাদিত্য মুক্তা-পীড়ের সুশাসন।

৮৫৫ খ্রীঃ—৯৩৯ খ্রীঃ : উৎপল রাজবংশের অধিকার।

৯৩৯ খ্রীঃ—১০০৩ খ্রীঃ : যশস্কর রাজবংশের অধিকার।

১০০৩ খ্রীঃ—১১৭২ খ্রীঃ : লোহার রাজবংশের অধিকার।

(১১৫০ খ্রীঃ : রাজতরঙ্গিণীর রচনা সমাপ্ত।)

১১৭২ খ্রীঃ—১৩৩৮ খ্রীঃ : দেববংশের অধিকার।

(১৩১৩ খ্রীঃ : শাহমীরের কাশ্মীর আগমন। কাশ্মীরে প্রথম ইসলাম অনুপ্রবেশ।)

(১৩১৫ খ্রীঃ : শাহমীরের কাশ্মীর রাজদরবারে চাকরিলাভ।)

(১৩১৫ খ্রীঃ—১৩৩৮ খ্রীঃ : শাহমীরের উত্থান।)

১৩৩৮ খ্রীঃ : রানী কোটাদেবীকে হত্যাপূর্বক শাহমীরের কাশ্মীর সিংহাসন দখল।

১৩৩৮ খ্রীঃ—১৫৬১ খ্রীঃ : শাহমীরের বংশের শাসন (মধ্যে ১৩৯৪—১৪১৬ খ্রীঃ সেকেন্দার খাঁর হিন্দু নিধন এবং ১৪২০—১৪৭০ খ্রীঃ প্রজাবৎসল জয়নাল আবেদিনের সুশাসন)।

১৫৬১ খ্রীঃ—১৫৮৯ খ্রীঃ : গাজী শাহ বংশের শাসন।

১৫৮৯ খ্রীঃ (৮।৮।৮৯)—১৭৫২ খ্রীঃ : মোগল রাজ বংশের শাসন।

(১৫৮৬ খ্রীঃ—১৬০৭ খ্রীঃ : আইন-ই-আকবরীর রচনাকাল।)

১৭৫২ খ্রীঃ—১৮১৯ খ্রীঃ : আফগান অধিকার।

১৮১৯ খ্রীঃ—১৮৪৫ খ্রীঃ : শিখ অধিকার।

১৮৪৫ খ্রীঃ (১৬।৩।১৮৪৬)—১৮৪৬ খ্রীঃ : বৃটিশ অধিকার।

১৮৪৬ খ্রীঃ (১৬।৩।১৮৪৬)—১৯৪৭ খ্রীঃ—(২৭।১০।১৯৪৭) : হিন্দু ডোগরা বংশের অধিকার।

১৯৪৭ খ্রীঃ (২৭।১০।১৯৪৭)—আজ পর্যন্ত : ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার।

পরিশিষ্ট (খ)

[ঘটনাপঞ্জী : কাশ্মীর প্রশ্নে রাজনৈতিক ঘটনাকেন্দ্রিক]

১৬।৩।১৮৪৬ : মহারাজা গোলাব সিংহের কাশ্মীর রাজ্য লাভ।

১৮৭১ খ্রীঃ : স্যার উইলিয়াম হাণ্টার রচিত 'Indian Musalmans' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৮৮ খ্রীঃ : স্যার সৈয়দ আহম্মদ কর্তৃক প্রথম দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রচার।

১৯০৬ খ্রীঃ : 'Indian Musalmans' গ্রন্থের ভাবধারা এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভাবধারা অবলম্বনে ঢাকায় মুসলীম লীগের জন্ম।

২৮।১।৩৩ : কেম্ব্রিজ গ্রুপ কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত 'Now or Never' পত্রিকাতে PAKISTAN শব্দের প্রথম ব্যবহার ও ব্যাখ্যা।

১৯৩৩ খ্রীঃ : চৌধুরী রহমত আলীর সভাপতিত্বে কেম্ব্রিজ গ্রুপ কর্তৃক 'পাকিস্তান ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট' গঠন।

২০।৩।৩৭ : জিন্নাকে ইকবালের পত্র। পত্রে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক ইউনিট গঠনের সুপারিশ। জিন্না কর্তৃক দ্বি-জাতি তত্ত্বকে মনেপ্রাণে গ্রহণ।

১৯৩৮ খ্রীঃ : ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ কর্তৃক 'The Cultural Future of India' নামক পুস্তকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

১৯৪০ খ্রীঃ : করাচীতে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল মুভমেন্ট'-এর সভায় কেম্ব্রিজ গ্রুপের মতবাদ ব্যাখ্যা।

২৪।৩।৪০ : লাহোরে 'সারা ভারত মুসলিম লীগ'-এর সভায় পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি গৃহীত, যা লাহোর প্রস্তাব বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে খ্যাত হয়।

১৯৪২ খ্রীঃ (মার্চ—এপ্রিল) : ক্রীপস মিশন ব্যর্থ।

জুলাই, ১৯৪২ : 'ভারত ছাড়' আন্দোলন।

২৫।৬।৪৫ : সিমলা গোলটেবিল ব্যর্থ।

১৫।৩।৪৬ : ভারতে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের জন্য হাউস অব কমন্স কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত।

২৩।৩।৪৬ : ক্যাবিনেট মিশনের ভারতে আগমন।

১৬।৫।৪৬ : ১. ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা প্রকাশ।
২. লর্ড লরেন্সের বেতার ভাষণ।

২২।৫।৪৬ : দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মেমোরেন্ডাম প্রকাশ।

৫।৬।৪৬ : নতুন দিল্লীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় জিন্নার সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি।

৬।৬।৪৬ : পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী অক্ষুন্ন রেখে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনানুযায়ী 'কোয়ালিশান সরকারে' মুসলীম লীগের যোগদানের সিদ্ধান্ত।

১০।৬।৪৬ : ১. সারা ভারত দেশীয় রাজ্য সম্মেলন।

২. বোম্বাইতে প্রেস কনফারেন্সে নেহেরুর অপরিণামদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী বিবৃতি।

২৯.৭.৪৬ : নেহেরুর প্রেস কনফারেন্সে বিবৃতিতে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৬।৮।৪৬ : প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতায় ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ : কোয়ালিশন সরকার গঠন / লীগের যোগদান।

২৯।১০।৪৬ : কোয়ালিশন সরকারে মুসলিম লীগকে অর্থ দফতর দেওয়ার কংগ্রেসের অদূরদর্শী ও নির্বোধ সিদ্ধান্ত।

১১।১২.৪৬ : কনস্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলীর প্রথম অধিবেশন।

২৪।৩।৪৭ : ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট হিসাবে মাউন্টব্যাটেনের শপথ গ্রহণ।

মে, ১৯৪৭ : ভারত-পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর বিল পাশ।

১৪।৬।৪৭ : নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্তৃক ভারত-ভাগের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

জুলাই, ১৯৪৭ : কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় বাদে দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর।

১৪।৮।৪৭ : নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

১৫।৮।৪৭ : ১. খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

২. স্বাধীন ভারতের বড়লাট হিসাবে মাউন্টব্যাটেনের নিযুক্তি।

৩।১০।৪৭ : রাওয়ালপিণ্ডিতে সর্দার মহম্মদ ইব্রাহিমের প্রধানমন্ত্রীত্বে আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠন।

২২।১০।৪৭ : হানাদারের বকলমে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ।

২৫।১০।৪৭ : ১. পাকিস্তান বাহিনীর সদর দফতর কর্তৃক নয়াদিল্লীকে টেলিগ্রাম—উপজাতীয় হানাদাররা কাশ্মীর আক্রমণ করেছে।

২. দেশরক্ষা কমিটি কর্তৃক কাশ্মীরের ভারতে যোগদান সাপেক্ষে সৈন্য সাহায্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২৬।১০।৪৭ : ১. কাশ্মীরের জনপ্রতিনিধিগণ ও মহারাজার অনুরোধে অঙ্গরাজ্য হিসাবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি।

২. তদনুযায়ী চুক্তি সম্পাদিত।

২৭।১০।৪৭ : ১. কাশ্মীরে হানাদারদের রুখতে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ।

২. জিন্না কর্তৃক প্রধান সেনাপতি গ্রেসীকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার

নির্দেশ। পরে অকিনলেকের পরামর্শে প্রত্যাহার।

৩।১১।৪৭ : লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে রেডিও বক্তৃতায় নেহেরু কর্তৃক কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় গণভোটের প্রতিশ্রুতি।

৪।১১।৪৭ : গিলগিটে ব্রিটিশ সেনাপতি মেজর উইলিয়াম ব্রাউন কর্তৃক পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন।

১০।১১।৪৭ : পাকিস্তান টাইমস-এর অভিযোগঃ মাউন্টব্যাটেনই কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পরিচালনায় প্রত্যক্ষ কম্যান্ড গ্রহণ করেছেন।

২৬।১১।৪৭ : ১. শেখ আবদুল্লা কর্তৃক কাশ্মীরে গণভোটের অপ্রয়োজনীয়তা ঘোষণা। নেহেরুর প্রতিবাদ।

২. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভেঙে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠন।

১।১২।৪৭ : ভারতত্যাগী মুসলমানদের ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরোধ।

১১।১২।৪৭ : ১. কাশ্মীরে হিন্দু নির্যাতনের সংবাদে দেশরক্ষা কমিটির উদ্বেগ এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ।

২. মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক বিরোধ মীমাংসায় রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হবার সুপারিশ।

১।১।৪৮ : মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের এবং মধ্যস্থতা প্রার্থনা।

৫।১।৪৮ : রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) গঠন।

১২।১।৪৮ : গান্ধীজীর আমরণ অনশন সত্যাগ্রহ শুরু।

১৮।১।৪৮ : গান্ধীজীর অনশনভঙ্গ।

৩০।১।৪৮ : গান্ধীহত্যা।

৬।২।৪৮ : UNCIP কর্তৃক—

—(ক) কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার,

—(খ) কাশ্মীরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন,

—(গ) সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ তদারকিতে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৪।২।৪৮ : নির্বান্ধব ও নিঃসঙ্গ জিন্না সাহেবের ক্যানসার রোগে মৃত্যু।

১৭।২।৪৮ : বৃটিশ প্রতিনিধি কর্তৃক রাষ্ট্রপুঞ্জে আপত্তির ফলে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে বিপত্তি ; ভারতীয় জনসাধারণের ক্ষোভ।

মার্চ, ১৯৪৮ : শেখ আবদুল্লার কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ।

২১।৩।৪৮ : ভারতের আপত্তিতে কাশ্মীরে কিছু ভারতীয় সৈন্য রাখতে UNCIP-

এর সংশোধিত সিদ্ধান্ত :

১৩।৮।৪৮ : UNCIP কর্তৃক যুদ্ধবিরতির পর গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত।

১।১।৪৯ : যুদ্ধবিরতি ঘোষণা।

২৯।৭।৪৯ : যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৭।১০।৪৯ ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারা প্রবর্তন।

২৬।১।৫০ : ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম।

সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ : ১. নির্বাচনে শেখ আবদুল্লার ন্যাশান্যাল কনফারেন্স প্রার্থীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ।

২. কাশ্মীরে রাজতন্ত্রের অবসান।

এপ্রিল, ১৯৫২ : আবদুল্লা কর্তৃক কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের সীমাবদ্ধতার যুক্তি উত্থাপন।

২৪।৭।৫২ : দিল্লী চুক্তি (নেহেরু-আবদুল্লা চুক্তি)।

২৩।৬।৫৩ : কাশ্মীর জেলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রহস্যজনক মৃত্যু।

৯।৮।৫৩ : সহকারী প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ কর্তৃক ক্ষমতা দখল এবং শেখ আবদুল্লার কয়েদ।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ : কাশ্মীর কর্নস্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলী কর্তৃক ভারতভুক্তির বৈধতার চূড়ান্ত অনুমোদন।

১০।১২।৫৫ : শ্রীনগরে ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন কর্তৃক ঘোষণা : রাজ্যের জনগণ ইতিমধ্যেই তাঁদের মতামত জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা ভারতে থাকতে চান।

৩০।১০।৫৬ : ১. সংবিধানের ৭ম সংশোধনীতে 'B States'-এর অবলুপ্তি। অন্যান্য রাজ্যের সমপর্যায়ে কাশ্মীরকে Article I-এর অন্তর্ভুক্তিকরণ, যদিও ৩৭০ ধারা বলবৎ।

২. উক্ত সংশোধনীতে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে ঘোষণা।

১৯৫৮ : গণভোটের দাবিতে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ আবদুল্লার পুনরায় কয়েদ।

১৯৬২ : ভারত-চিন যুদ্ধ।

১১।১০।৬৩ : বক্সী গোলাম মহম্মদের প্রধানমন্ত্রীত্বের অবসান; সামসুদ্দিনের শপথ গ্রহণ।

২৬।১২।৬৩ : হজরতবাল অপহরণ।

৩।১।৬৪ : হজরতবাল পুনরুদ্ধার।

৮।৪।৬৪ : ১. গোলাম মহম্মদ সাদিকের প্রধানমন্ত্রীত্বে শেখ আবদুল্লার মুক্তি।

২. শেখ আবদুল্লার 'ভারতীয় নাগরিকের' পরিবর্তে 'কাশ্মীরী মুসলমান' হিসাবে পাশপোর্ট লাভ।

২৭।৫।৬৪ : ১. নেহেরুজীর মৃত্যু।

২. লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভ।

২২।৯।৬৪ : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের কয়েদ।

২।৩।৬৫ : জম্মু এবং কাশ্মীর জাতীয় কনফারেন্সের নাম পরিবর্তন করে 'জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস পার্টি' নাম গ্রহণ।

১০।৪।৬৫ : সরকারের প্রধানকে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের প্রধানকে রাজ্যপাল বলে গণ্য করা হবে এবং রাজ্যপাল নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি এই মর্মে নতুন বিধি।

১।৯।৬৫ : পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক ছাম্বের কাছে আন্তর্জাতিক সীমা পার হয়ে বিনা প্ররোচনায় ভারত আক্রমণ।

৬।৯।৬৫ : লাহোর ও শিয়ালকোট অবরোধ (ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক)।

২৩।৯।৬৫ : ভারত-পাক যুদ্ধবিরতি।

১০।১ ৬৬ : তাশখন্দ চুক্তি।

৬।১১।৬৭ : জম্মু অটোনমী ফোরামের দাবি বিবেচনার জন্য গজেন্দ্র গদকর কমিশন নিয়োগ।

১৪।১।৭১ : শেখ আবদুল্লার গণভোটের দাবি অগ্রাহ্য।

৩।১২।৭১ : পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ।

১২।১২।৭১ : গোলাম মহম্মদ সাদিকের মৃত্যুতে সৈয়দ মীরকাশীম মুখ্যমন্ত্রী।

১৭।১২।৭১ : ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও ভারত-পাক যুদ্ধবিরতি চুক্তি।

২।৭।৭২ : ভারত-পাক সিমলাচুক্তি স্বাক্ষরিত।

২৫।২।৭৪ : মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শেখ আবদুল্লার শপথ গ্রহণ।

৫।৭।৭৪ : গণভোট মোর্চার অবলুপ্তি এবং শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কনফারেন্স দলের পুনর্গঠন।

২৭।৩।৭৭ : কংগ্রেস দল সমর্থন প্রত্যাহার করায় শেখ আবদুল্লার পদত্যাগ; সংসদ বাতিল।

৩০।৬।৭৭ : নির্বাচনে ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

৪।৭।৭৭ : শেখ আবদুল্লা মুখ্যমন্ত্রী।

৮।৯।৮২ : সেখ আবদুল্লার মৃত্যু। পূর্বমনোনয়ন অনুসারে পুত্র সেখ ফারুক আবদুল্লার মুখ্যমন্ত্রীত্বের শপথ।

২।৭।৮৪ : ফারুক মন্ত্রীসভা বরখাস্ত। গোলাম মহম্মদ শাহের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ।

১৫।৮।৮৫ : ভারত বিরোধী মিছিলে পুলিশের গুলিচালনা।

৭।৩।৮৬ : শাহ মন্ত্রীসভা বরখাস্ত।

৭।১১।৮৬ : কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনে ফারুকের পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীত্বের শপথ।

২৩।৩।৮৭ : বিধান সভার নির্বাচন। মুসলীম ইউনাইটেড ফ্রন্ট এর নেতাদের কয়েদ।

৭।৫।৮৯ : JKLF কর্তৃক চারদিনের হরতালের ডাক।

১১।৭।৮৯ : জেনারেল কে ভি. কৃষ্ণরাও এর রাজ্যপাল হিসাবে শপথ।

১৫।৮।৮৯ : ভারতের স্বাধীনতা দিবসে কাশ্মীর বনধ।

৪।১১।৮৯ : J. K. L. F.-এর প্রতিষ্ঠাতা মকবুল ভটের মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী প্রাক্তন জজ নীলকান্ত গাঞ্জুকে হত্যা।

৮।১২।৮৯ : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সৈয়দের কন্যা রুবাইয়া সৈয়দকে J K L F কর্তৃক অপহরণ।

১৩।১২।৮৯ : ৫ জন J K L F বন্দীর মুক্তির বিনময়ে রুবাইয়ার মুক্তি।

১৯।১।৯০ : ১. জগমোহনের রাজ্যপাল হিসাবে শপথ।

২. ফারুকের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা।

৩. কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন।

২০।১।৯০ : নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ঘরে ঘরে অনুসন্ধান। শ্রীনগরে ৩৫ জনের গুলিতে মৃত্যু। অনির্দিষ্ট কালের জন্য সান্ধ্য আইন।

৯০—৯১ : উগ্রপন্থী কার্যকলাপে (আন্দোলনকারীদের ভাষায় 'মুক্তি যুদ্ধের প্রয়োজনে) উপত্যকায় মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

২৬।১।৯২ : লালচক, শ্রীনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP-র) একতাযাত্রা।

১১।২।৯২ : J K L F প্রধান আমানুল্লা কর্তৃক পাক অধিকৃত কাশ্মীরে শান্তি মিছিল।

৩০।৩।৯২ : ভারত সীমান্ত অতিক্রম রুখতে ৫০০ J K L F কর্মীদের পাক বাহিনীর হাতে বন্দী।

১৫।৭।৯২ : J K L F এবং হিজাবুল-মুজাহিদিন দলের মধ্যে একতা চুক্তি।

৭।১।৯৩ : সোপোরে ৪০ জনের মৃত্যু (উগ্রপন্থী আক্রমণে)।

১২।৩।৯৩ : Gen. K. V. Krishna রাজ্যপাল নিযুক্ত।

১।৫।৯৩ : সোপোরে B S F এবং উগ্রপন্থীদের গুলিবিনিময়।

অক্টোবর, ১৯৯৩ : ১. হজরতবাল মসজিদে উগ্রপন্থীদের আত্মগোপন।

২. ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মসজিদ অবরোধ।

৯।১১।৯৩ : হজরতবাল মসজিদে আত্মগোপনকারী উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ।

১৬।১১।৯৩ : হজরতবাল মসজিদে আত্মগোপনকারী উগ্রপন্থীদের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ।

৪।১।৯৪ : ইসলামাবাদে ভারত-পাক বৈঠক ব্যর্থ।

২৪।১।৯৪ : কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ভারত কর্তৃক ছয় দফা প্রস্তাবপ্রেরণ।

৫।২।৯৪ : কাশ্মীরে গণভোটের দাবিতে পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর পাকিস্তান বন্ধের ডাক।

২২।২।৯৪ : ভারতের পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে দলমত নির্বিশেষে সর্বসম্মতভাবে

কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ঘোষণা এবং পাকিস্তানকে অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সরে যেতে নির্দেশ।

৯।৩।৯৪ : জেনেভায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কর্তৃক অভিযোগ উত্থাপনের প্রস্তাব নিঃশর্ত প্রত্যাহৃত।

১১।৫।৯৫ : পাকিস্তানী উগ্রপন্থী কর্তৃক ৫০০ বছরের চারার-এ-শরীফ ভস্মীভূত।

পরিশিষ্ট (গ)

[দলিল-পত্রাদি]

TREATY BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND MAHARAJAH GOLAB SINGH OF JUMMOO

Done at Umritsur, 16th March, 1846.

Article I.—The British government transfers and makes over forever, independent possession, to Maharajah Golab Singh and the heirs male of his body, all the hilly or mountainous country, situated to the eastward of the River Indus and westward of the River Ravee, including Chumba and excluding Lahul, being part of the territories ceded to the British government by the Labore State, according to the provisions of Article IV, of the Treaty of Lahore, dated 9th March, 1846.

Article II.—The eastern boundary of the tract transferred by the foregoing Article to Maharajah Golab Singh shall be laid down by Commissioners appointed by the British government and Maharajah Golab Singh respectively for that purpose and shall be defined in a separate engagement after survey.

Article III.—In consideration of the transfer made to him and his heirs by the provision of the foregoing Articles, Maharajah Golab Singh will pay to the British Government the sum of Rupees (Nanukshahee) fifty lakhs to be paid on, ratification of this Treaty, and twenty five lakhs on or before the first October of the current year, A. D. 1846.

Article IV—The limits of the territories of Maharajah Golab Singh shall not be at any time changed without the concurrence of the British Government.

Article V.—Maharajah Golab Singh will refer to the arbitration of the British Government any disputes or questions that may arise between himself and the Government of Lahore

or any other neighbouring State, and will abide by the decision of the British Government.

Article VI.—Maharajah Golab Singh engages for himself and heirs to join, with the whole of his Military Force, the British troops, when employed within the hills, or in the territories adjoining his possessions.

Article VII.—Maharajah Golab Singh engages never to take or retain in his service, any British subject, nor the subject of any European or American State, without the consent of the British Government.

Article VIII. Maharajah Golab Singh engages to respect, in regard to the territory trasferred to him, the provisions of Articles V, VI, and VII of the separate Engagement between the British Government and the Lahore Durbar, dated March 11th, 1846.

Article IX—The British Government will give its aid to Maharajah Golab Singh in protecting his territories from external enemies.

Article X—Maharajah Golab Singh acknowledges the supremacy of the British Government, and will in token of such supremacy present annually to the British Government one horse, twelve perfect shawl goats of approved breed (six male and six female), and three pair of Cashmere shawls.

(*Signed*)
H. HARDINGE

(*Signed*)
F. CURRIE
H. M. LAWRENCE

By order of the Right Honourable the Governor-General of India.

(*Signed*)
F. CURRIE
Secretary to the Government of India.
with the Governor-General

2

INSTRUMENT OF ACCESSION OF JAMMU AND KASHMIR STATE

The following is the text of the Instrument of Accession executed by the Ruler of Jammu and Kashmir State on 26 October 1947.

Whereas the Indian Independence Act, 1947, provides that as from the fifteenth day of August 1947, there shall be set up an independent Dominion known as India, and that the Government of India Act, 1935, shall, with such omissions, additions, adaptations and modifications as the Governor-General may by order specify be applicable to the Dominion of India :

And whereas the Government of India Act, 1935, as so adapted by the Governor-General provides that an Indian State may accede to the Dominion of India by an Instrument of Accession executed by the Ruler thereof :

Now, therefore,

I, Shriman Indar Mahandar Rajrajeshwar Maharajadhiraj Shri Hari Singhji, Jammu Kashmir Naresh Tatha Tibbet adi Deshadhipathi, Ruler of Jammu and Kashmir State, in the exercise of my sovereignty in and over my said State Do hereby execute this my Instrument of Accession and

1. I hereby declare that I accede to the Dominion of India with the intent that the Governor-General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for purposes of the Dominion shall, by virtue of this my Instrument of Accession, but subject always to the terms thereof, and for the purposes only of the Dominion, exercise in relation to the State of Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as "this State") such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act, 1935, as in force in the Dominion of India on the

15th day of August 1947 (which Act as so in force is hereafter referred to as "the Act").

2. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within this State so far as they are applicable therein by virtue of this my Instrument of Accession.

3. I accept the matters specified in the Schedule hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for this State.

4. I hereby declare that I accede to the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor-General and the Ruler of this State whereby any functions in relation to the administration in this State of any law of the Dominion Legislat re shall be exercised by the Ruler of this State, then any such agreement shall be deemed to form part of this Instrument and shall be construed and have effect accordingly.

5. The terms of this my Instrument of Accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act, 1947, unless such amendment is accepted by me by an Instrument supplementary to this Instrument.

6. Nothing in this Instrument shall empower the Dominion Legislature to make any law for this State authorising the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion for the purposes of a Dominion law which applies in this State deem it necessary to ac uire any land, I will at their request acquire the land at their expenses or if the land belongs to me transfer it to them on such terms as may be agreed, or, in default of agreement, determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India.

7. Nothing in this Instrument shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements

with the Government of India under any such future constitution.

8. Nothing in this Instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this State, or, save as provided by or under this Instrument, the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as Ruler of this State or the validity of any law at present in force in this State.

9 I hereby declare that I execute this Instrument on behalf of this State and that any reference in this Instrument to me or to the Ruler of the State is to be construed as including a reference to my heirs and successors.

Given under my hand this twenty-sixth day of October, nineteen hundred and forty-seven.

Hari Singh
Maharajadhiraj of Jammu and Kashmir State

ACCEPTANCE OF INSTRUMENT OF ACCESSION OF JAMMU & KASHMIR STATE BY THE GOVERNOR-GENERAL OF INDIA

I do hereby accept this Instrument of Accession.
Dated this twenty-seventh day of October, nineteen hundred and forty-seven.

Mountbatten of Burma
Governor-General of India

3

SCHEDULE OF INSTRUMENT OF ACCESSION THE MATTERS WITH RESPECT TO WHICH THE DOMINION LEGISLATURE MAY MAKE LAWS FOR THIS STATE

A, Defence

1. The naval, military and air forces of the Dominion and any other armed forces raised or maintained by the Dominion; any armed forces, including forces raised or maintained by an

acceding State, which are attached to, or operating with, any of the armed forces of the Dominion.

2. Naval, military and air force works, administration of cantonment areas.

3. Arms, fire-arms, ammunition.

4. Explosives.

B. EXTERNAL AFFAIRS

1. External affairs ; the implementing of treaties and agreements with other countries ; extradition, including the surrender of criminals and accused persons to parts of His Majesty's Dominions outside India.

2. Admission into, and emigration and expulsion from, India, including in relation thereto the regulation of the movements in India of persons who are not British subjects domiciled in India or subject of any acceding State ; pilgrimages to places beyond India.

3, Naturalisation.

C. COMMUNICATIONS

1. Posts and telegraphs, including telephones, wireless, broadcasting and other like forms of communication.

2. Federal railways ; the regulation of all railways other than minor railways in respect of safety, maximum and minimum rates and fares, station and services terminal charges, interchange of traffic and the responsibility of railway administrations as carriers of goods and passengers ; the regulation of minor railways in respect of safety and the responsibility of the administrations of such railways as carriers of goods and passengers.

3. Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters ; Admiralty jurisdiction.

4. Port quarantine.

5. Major ports, that is to say, the declaration and delimitation of such ports, and the constitution and powers of Port Authorities therein.

6. Aircraft and air navigation ; the provision of aerodromes ; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes.

7. Lighthouses, including lightships, beacons and other provisions for the safety of shipping and aircraft.

8. Carriage of passengers and goods by sea or by air.

9. Extension of the powers and jurisdiction of members of the police force belonging to any unit to railway area outside that unit.

D. ANCILLARY

1. Election to the Dominion Legislature, subject to the provisions of the Act and of any Order made thereunder.

2. Offences against laws with respect to any of the aforesaid matters.

3. Inquiries and statistics for the purposes of any of the aforesaid matters.

4. Jurisdiction and powers of all courts with respect to any of the aforesaid matters but, except with the consent of the Ruler of the acceding State, not so as to confer any jurisdiction or powers upon any courts other than courts ordinarily exercising jurisdiction in or in relation to that State.

REPLY OF 27 OCTOBER 1947 FROM LORD MOUNTBATTEN TO MAHARAJA SIR HARI SINGH

My dear Maharaja Sahib,

Your Highness' letter dated 26 October 1947 has been delivered to me by Mr. V. P. Menon. In the circumstances mentioned by Your Highness, my Government have decided to accept the accession of Kashmir State to the Dominion of India. In consistence with their policy that in the case of any State where the issue of accession has been the subject of dispute, the question of accession should be decided in accordance with the wishes of the people of the State, it is my Government's wish that, as soon as law and order have been restored in Kashmir and its soil cleared of the invader, the

question of the State's accession should be settled by a reference to the people.

Meanwhile, in response to Your Highness' appeal for military aid, action has been taken today to send troops of the Indian Army to Kashmir, to help your own forces to defend your territory and to protect the lives, property, and honour of your people. My Government and I note with satisfaction that Your Highness has decided to invite Sheikh Abdullah to form an interim Government to work with Your Prime Minister.

Mountbatten of Burma

4

INDIAN COMPLAINT TO THE SECURITY COUNCIL LETTER DATED 1 JANUARY 1948 FROM THE REPRESENTATIVE OF INDIA TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL

(S/628)

The Government of India have instructed me to transmit to you the following telegraphic communication :

1. Under Article 35 of the Charter of the United Nations. any Member may bring any situation whose continuance is likely to endanger the maintenance of international peace and security to the attention of the Security Council. Such a situation now exists between India and Pakistan owing to the aid which invaders. consisting of nationals of Pakistan and of tribesmen from the territory immediately adjoining Pakistan on the north-west, are drawing from Pakistan for operations against Jammu and Kashmir, a State which has acceded to the Dominion of India and is part of India. The circumstances of accession, the activities of the invaders which led the Government of India to take military action against them, and the assistance which the attackers have received and are still receiving from Pakistan are explained later in this memo-

randum. The Government of India request the Security Council to call upon Pakistan to put an end immediately to the giving of such assistance, which is an act of aggression against India. If Pakistan does not do so, the Government of India may be compelled, in self defence to enter Pakistan territory, in order to take military action against the invaders. The matter is, therefore, one of extreme urgency and calls for immediate action by the Security Council for avoiding a breach of international peace.

2. From the middle of September 1947, the Government of India had received reports of the infiltration of armed raiders into the western parts of Jammu province of Jammu and Kashmir State ; Jammu adjoins West Punjab, which is a part of the Dominion of Pakistan. These raiders had done a great deal of damage in that area and taken possession of part of the territory of the State. On 24 October, the Government of India heard of a major raid from the Frontier Province of the Dominion of Pakistan into the Valley of Kashmir. Some two thousand or more fully armed and equipped men came in motor transport, crossed over to the territory of the State of Jammu and Kashmir, sacked the town of Muzaffarabad, killing many people and proceeded along the Jhelum Valley road towards Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir State. Intermediate towns and villages were sacked and burnt, and many people killed. These raiders were stopped by Kashmir State troops near Uri, a town some fifty miles from Srinagar, for some time, but the invaders got around them and burnt the power house at Mahora, which supplied electricity to the whole of Kashmir.

3. The position, on the morning of 26 October, was that these raiders had been held by Kashmir State troops and part of the civil population, who had been armed, at a town called Baramulla. Beyond Baramulla there was no major obstruction up to Srinagar. There was immediate danger of these raiders reaching Srinagar, destroying and massacring large numbers of

people, both Hindus and Muslims. The State troops were spread out all over the State and most of them were deployed along the western border of Jammu province. They had been split up into small isolated groups and were incapable of offering effective resistance to the raiders. Most of the State officials had left the threatened areas and the civil administration had ceased to function. All that stood between Srinagar and the fate which had overtaken the places en route followed by the raiders was the determination of the inhabitants of Srinagar, of all communities, and practically without arms, to defend themselves. At this time Srinagar had also a large population of Hindu and Sikh refugees who had fled there from West Punjab owing to communal disturbances in that area. There was little doubt that these refugees would be massacred if the raiders reached Srinagar.

4. Immediately after the raids into Jammu and Kashmir State commenced, approaches were informally made to the Government of India for the acceptance of the accession of the State to the Indian Dominion. (It might be explained in parenthesis that Jammu and Kashmir from a State whose ruler, prior to the transfer of power by the United Kingdom to the Dominions of India and Pakistan had been in treaty relations with the British Crown, which controlled its foreign relations ceased with the transfer of power on 15 August last, and Jammu and Kashmir like other States acquired the right to accede to either Dominion.)

5. Events moved with great rapidity, and the threat to the Valley of Kashmir became grave. On 26 October, the ruler of the State, His Highness Maharaja Sir Hari Singh, appealed urgently to the Government of India for military help. He also requested that the Jammu and Kashmir State should be allowed to accede to the Indian Dominion. An appeal for help was also simultaneously received by the Government of India from the largest popular organization in Kashmir, the National Conference, headed by Sheikh

Mohammed Abdullah. The Conference further strongly supported the request for the State's accession to the Indian Dominion. The Government of India were thus approached not only officially by the State authorities, but also on behalf of the people of Kashmir, both for military aid and for the accession of the State to India.

6. The grave threat to the life and property of innocent people in the Kashmir Valley and to the security of the State of Jammu and Kashmir that had developed as a result of the invasion of the Valley demanded immediate decision by the Government of India on both the requests. It was imperative on account of the emergency that the responsibility for the defence of Jammu and Kashmir State should be taken over by a Government capable of discharging it. But, in order to avoid any possible suggestion that India had utilised the State's immediate peril for her own political advantage, the Government of India made it clear that once the soil of the State had been cleared of the invader and normal conditions restored, its people would be free to decide their future by the recognized democratic methods of a plebiscite or referendum which, in order to ensure complete impartiality, might be held under international auspices.

7 The Government of Indian felt it their duty to respond to the appeal for armed assistance because :

(1) They could not allow a neighbouring and friendly State to be compelled by force to determine either its internal affairs or its external relations ;

(2) The accession of Jammu and Kashmir State to the Dominion of India made India really responsible for the defence of the State.

8. The intervention of the Government of India resulted in saving Srinagar. The raiders were driven back from Baramulla to Uri and are held there by Indian troops. Nearly 19,000 raiders face the Dominion forces in this area. Since operations in the Valley of Kashmir started, pressure by the

raiders against the western, and south-western border of Jammu and Kashmir State had been intensified. Exact figures are not available. It is understood, however, that nearly 15,000 raiders are operating against this part of the State. State trops are besiezed in certain areas. Incursions by the raiders into the State territory, involving murder, arson, loot and the abduction of women continue. The booty is collected and carried over to the tribal areas to serve as an inducement to the further recruitment of tribesmen to the ranks of the raiders. In addition to those actively participating in the raid, tribesmen and others, estimated at 100,000 have been collected in different places in the districts of West Punjab bordering Jammu and Kashmir State, and many of them are receiving military training under Pakistani nationals, including officers of the Pakistan Army. They are looked after in Pakistan territory, fed, clothed, armed and otherwise equipped, and transported to the territory of Jammu and Kashmir State with the help, direct and indirect, of Pakistani officials, both military and civil.

9. As already stated, the raiders who entered the Kashmir Valley in October came mainly from the tribal areas to the north-west of Pakistan and, in order to reach Kashmir, passed through Pakistan territory. The raids along the south-west border of the State, which had preceded the invasion of the valley proper, had actually been conducted from Pakistan territory, and Pakistan national had taken part in them. This process of transmission across Pakistan territory and untilisation of that territory as a base of operations against Jammu and Kashmir State continues. Recently, military operations against the western and south-western borders of the State have been intensified, and the attackers consist of nationals of Pakistan as well as tribesmen. These invaders are armed with modern weapons, including mortars and medium machine-guns, wear the battle dress of regular soldiers and, in recent engagements, have fought in regular battle formation and are

using the tactics of modern warfare. Man pack wireless sets are in regular use and even mark V mines have been employed For their transport the invaders have all along used motor vehicles. They are undoubtedly being trained and to some extent led by regular officers of the Pakistan Army. Their rations and other supplies are obtained from Pakistan territory.

10 These facts point indisputably to the conclusion :

(a) that the invaders are allowed transit across Pakistan territory ;

(b) that they are allowed to use Pakistan territory as a base of operations ;

(c) that they include Pakistan nationals ;

(d) that they draw much of their military equipment, transportation, and supplies (including petrol) from Pakistan ; and

(e) that Pakistan officers are training, guiding, and otherwise actively helping them.

There is no source other than Pakistan from which they could obtain such quantities of modern military equipment, training or guidance. More than once, the Government of India had asked the Pakistan Government to deny to the invaders facilities which constitute an act of aggression and hostility against India, but without any response. The last occasion on which this request was made was on 22 December, when the Prime Minister of India handed over personally to the Prime Minister of Pakistan a letter in which the various forms of aid given by Pakistan to the invaders were briefly recounted and the Government of Pakistan were asked to put an end to such aid promptly ; no reply to this letter has yet been received in spite of a telegraphic reminder sent on 26 December.

11. It should be clear from the foregoing recital that the Government of Pakistan are unwilling to stop the assistance in material and men which the invaders are receiving from

Pakistan territory and from Pakistan nationals, including Pakistan Government personnel, both military and civil. This attitude is not only un-neutral, but constitutes active aggression against India, of which the State of Jammu and Kashmir forms a part.

12. The Government of India have exerted persuasion and exercised patience to bring about a change in the attitude of Pakistan. But they have failed, and are in consequence confronted with a situation in which their defence of Jammu and Kashmir State is hampered and their measures to drive the invaders from the territory of the State are greatly impeded by the support which the raiders derive from Pakistan. The invaders are still on the soil of Jammu and Kashmir and the inhabitants of the States are exposed to all the atrocities of which a barbarous foe is capable. The presence, in large numbers, of invaders in those portions of Pakistan territory which adjoin parts of Indian territory other than Jammu and Kashmir State is a menace to the rest of India. Indefinite continuance of the present operations prolongs the agony of the people of Jammu and Kashmir, is a drain on India's resources and a constant threat to the maintenance of peace between India and Pakistan. The Government of India have no option, therefore, but to take more effective military action in order to rid Jammu and Kashmir State of the invader.

13. In order that the objective of expelling the invader from Indian territory and preventing him from launching attacks should be quickly achieved, Indian troops would have to enter Pakistan territory; only thus could the invader be denied the use of bases and cut off from his sources of supplies and reinforcements in Pakistan. Since the aid which the invaders are receiving from Pakistan is an act of aggression against India, the Government of India are entitled, under international law, to send their armed forces across Pakistan territory for dealing effectively with the invaders. However, as such action might involve armed conflict with Pakistan,

the Government of India, ever anxious to proceed according to the principles and aims of the Charter of the United Nations, desire to report the situation to the Security Council under Article 35 of the Charter.) They feel justified in requesting the Security Council to ask the Government of Pakistan.

(1) to prevent Pakistan Government personnel, military and civil from participating or assisting in the invasion of Jammu and Kashmir State ;

(2) to call upon other Pakistani nationals to desist from taking any part in the fighting in Jammu and Kashmir State ,

(3) to deny to the invaders : (a) access to any use of its territory for operations against Kashmir, (b) military and other supplies, (c) all other kinds of aid that might tend to prolong the present struggle.

14. The Government of India would stress the special urgency of the Security Council taking immediate action on their request They desire to add that military operations in the invaded areas have, in the past few days, been developing so rapidly that they must, in selfdefence, reserve to themselves the freedom to take at any time when it may become necessary, such military action as they may consider the situation requires

15 The Government of India deeply regret that a serious crisis should have been reached in their relation with Pakistan. Not only is Pakistan a neighbour but, in spite of the recent separation, India and Pakistan have many ties and many common interests. India desires nothing more earnestly than to live with her neighbour-State on terms of close and lasting friendship. Peace is to the interest of both States ; indeed to the interests of the world. The Government of India's approach to the Security Council is inspired by the sincere hope that, through the prompt action of the Council, peace may be preserved.

16. The text of this reference to the Security Council is being telegraphed to the Government of Pakistan.

5

AGREEMENT BETWEEN MILITARY REPRESENTATIVES OF INDIA AND PAKISTAN REGARDING THE ESTABLISHMENT OF A CEASE-FIRE LINE IN THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR (ANNEX 26 OF UNCIP THIRD REPORT-S/1430 ADD 1 TO 3)

29 July, 1949

I. Introduction

A. The military representatives of India and Pakistan met together in Karachi from 18 July to 27 July 1949 under the auspices of the Truce Sub-Committee of the United Nations Commission for India and Pakistan.

B. The members of the Indian delegation were : Lieutenant-General S. M. Shrinagesh, Major-General K. S. Thimayya, Brigadier S. H. F. J Manekshaw. As observers : Mr. H M. Patel, Mr. V. Sahay.

C. The members of the Pakistan delegation were : Major-General W. J. Cawthorn, Major General Nazir Ahmed, Brigadier M. Sher Khan. As observers : Mr. M. Ayub, Mr. A. A. Khan.

D. The members of the Truce Sub Committee of the United Nations Commission for India and Pakistan were : Mr. Hernando Samper (Colombia), Chairman ; Mr. William L. S. Williams (United States) ; Lieutenant-General Maurice Delvoie, Military Adviser, Mr. Miguel A. Marin, Legal Adviser.

II Agreement

A. Considering :

1. That the United Nations Commission for India and Pakistan, in its letter dated 2 July, 1949, invited the Govern-

ments of India and Pakistan to send fully authorised military representatives to meet jointly in Karachi under the auspices of the Commission's Truce Sub-Committee to establish a cease fire line in the State of Jammu and Kashmir, mutually agreed upon by the governments of India and Pakistan ;

2. That the United Nationals Commission for India and Pakistan in its letter stated that "The meeting will be for military purposes ; political issues will not be considered," and that "They will be conducted without prejudice to negotiations concerning the truce agreement" ;

3. That in the same letter the United Nations Commission for India and Pakistan further stated that "The cease-fire line is a complement of the suspension of hostilities, which falls within the provisions of Part I of the resolution of 13 August, 1948 and can be considered separately from the questions relating to Part II of the same resolution" ;

4. That the governments of India and Pakistan, in their letters dated 7 July, 1949, to the Chairman of the Commission, accepted the Commission's invitation to the military conference in Karachi.

B. The delegations of India and Pakistan, duly authorised, have reached the following agreement :

1. Under the provision of part 1 of the resolution of 13 August, 1948, and as a complement of the suspension of hostilities in the State of Jammu and Kashmir on 1 January, 1949, a cease-fire line is established.

2. The cease-fire line runs from Manawar in the south, north to Keran and from Keran east to the glacier area, as follows :

(a) The line from Manawar to the south bank of Jhelum River at Urusa (inclusive to India) is the line now defined by the factual positions about which there is agreement between both parties. Where there has hitherto not been agreement, the line shall be as follows :

(i) in the Patrana area : Kohel (inclusive to Pakistan)

north along the Khuwala Kas Nullah up to Point 2276 (inclusive to India), thence to Kirni (inclusive to India).

(ii) Khambha, Pir Satwan Point 3150 and Point 3606 are inclusive to India thence the line runs to the factual position at Bagla Gala, thence to the factual position at Point 3300.

(iii) In the area south of Uri the positions of Pir Kanthi and Ledi Gali are inclusive to Pakistan.

(b) From the north bank of the Jhelum River the line runs from a point opposite the village of Urusa (NL 972109), thence north following the Ballaseth Da Nar Nullah (inclusive to Pakistan), upto NL 973140, thence north-east to Chhota Qazinag (Point 10657 inclusive to India, thence to NM 010180, thence to NM 037210, thence to Point 11825 (NM 025354, inclusive to Pakistan), thence to Tutmari Gali (to be shared by both sides, posts to be established 500 yards on either side of the Gali), thence to the north-west through the first "R" of Burji Nar to north of Gadori, thence straight west to just north of point 9870, thence along the black line north of Bijidhar to north of Batarasi, thence to just south of Sudhpura, thence due north to the Kathaqazinag Nullah, thence along the Nullah to its junction with the Grangnar Nullah, thence along the latter Nullah to Kajnwala Pathra (inclusive to India), thence across the Danna ridge (following the factual positions), to Richmar Gali (inclusive to India), thence north to Thanda Katha Nullah, thence north to the Kishanganga River. The line then follows the Kishanganga River up to a point situated between Fargi and Tarban, thence (all inclusive to Pakistan) to Bankoran, thence north-east to Khori, thence to the hill feature 8930 (in Square 9053), thence straight north to Point 10164 (in Square 9057), thence to Point 10323 (in Square 9161), thence north-east straight to Guthur, then to Bhutpathra, thence to NL 980707, thence following the Bugina Nullah to the junction with the Kishanganga River at Point

4739. Thereafter the line follows the Kishanganga River to Keran and onwards to Point 4996 (NL 975818).

(c) From Point 4996 the line follows (all inclusive to Pakistan) the Famgar Nullah eastward to Point 12124, to Katware, to Point 6678, then to the north-east to Sarian (Point 11279), to Point 11837, to Point 13090 to Point 12641, thence east again to Point 11142, thence to Dhakki, thence to Point 11415, thence to Point 10301, thence to Point 7507 thence to Point 10685, thence to Point 8388, thence south-east to Point 11812. Thence the line runs (all inclusive to India), to Point 13220, thence across the river to the east to Point 13449 (Durmat), thence to Point 14586 (Anzbari), thence to Point 13554, thence to Milestone 45 on the Burzil Nullah, thence to the east to Ziankal (Point 12909), thence to the south-east to Point 11114, thence to Point 12216, thence to Point 12867, thence to the east to Point 11264, thence to Karo (Point 14985), thence to Point 14014, thence to Point 12089, thence following the track to Point 12879. From there the line runs t Point 13647 (Karobal Gali, to be shared by both sides). The cease-fire line runs thence through Retagah Chhish (Point 15316), thence through Point 15889, thence through Point 17392, thence through Point 16458, thence to Marpo La (to be shared by both sides), thence through Point 17561, thence through Point 17352, thence through Point 18400, thence through Point 16760, thence to (inclusive to India) Dalunang.

(d) From Dalunang eastwards the cease-fire line with follow the general line p int 15495, Ishman, Manus, Gangam, Gunderman, Point 3620, Funkar (Point 17628), Marmak, Natsara, Shangruti (Point 1 531) Chorbat La (Point 16700), Chalunka (on the Shyok River), Khor, thence north to the glaciers. This portion of the cease-fire line shall be demarcated in detail on the basis of the factual position as of 27 July, 1949, by the local commanders assisted by United Nations military observers.

C. The cease-fire line described above shall be drawn on a one-inch map (where available) and then be verified mutually on the ground by local commanders on each side with the assistance of the Unied Nations military observers, so as to eliminate any no-man's land. In the event that the local commanders are unable to reach agreement, the matter shall be reffered to the Commission's Military Adviser, whose decision shall be final. After this verification,

Done in Karachi on 27 July, 1949
For the Government of India ·

S. M. Shrinagesh

For the Government of Pakistan :

J. Cawthorn
Major-General

For the United Nations Commission for India and Pakistan :

Hernando Samper
M Delvoie

6

SECTION 370 OF THE INDIAN CONSTITUTION

370[1] Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir—(1) Notwithstanding anything in this Constitution. —

(a the provision of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir,

1. In exercise of the powers conferred by this article the President, on the recemmondation of the Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir, declared that, as from the 17th day of November, 195?, the said art. 370 shall be operative with the modification that for the Explanation cl. (1) thereof, the following Explanation is substituted namely :

"Explanation ; For the purpose of this article, the Government of the State means the person for that time being recognised by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the Sadarii-Riyasat of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office,'

(b) the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to—

(i) those matters in the Union List and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State ; and

(ii) such other matters in the said Lists, as, with the concurrence of the Government of the State, the President may by order specify.

Explanation—For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President as the Maharaja of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers for the time being in office under the Maharaja's Proclamation dated the fifth day of March, 1948 ;

(c) the provisions of article 1 and of this article shall apply in relation to that State :

(d) such of the other provisions of this Constitution shall apply in relation to that State subject to such exceptions and modifications as the President may by order[2] specify :

Provided that no such order which relates to the matter specified in the Instrument of Accession of the State referred to in paragraph (i) of sub-clause (b) shall be issued except in consultation with the Government of the State :

Provided further that no such order which relates to matters other than those referred in the last preceding proviso shall be issued except with the concurrence of that Government.

(2) If the concurrence of the Government of the State referred to in paragraph (ii) of sub-clause (b) of clause

2. See the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, (C.O. 48) as amended from time to time in Appendix 1.

(1) or in the second proviso to sub-clause (d) of that clause be given before the Constituent Assembly for the purpose of framing the Constitution of the State is convened, it shall be placed before such Assembly for such decision as it may take thereon.

(3) Notwithstanding anything in the foregoing provision of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify :

Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification.

7

THE TASHKENT DECLARATION

10 January 1966

The Prime Minister of India and the President of Pakistan, having met at Tashkent and having discussed the existing relations between India and Pakistan, hereby declare their firm resolve to restore normal and peaceful relations between their countries and to promote understanding and friendly relations between their peoples. They consider the attainment of these objectives of vital importance for the welfare of the 600 million people of India and Pakistan.

(1) The Prime Minister of India and the President of Pakistan agree that both sides will exert all efforts to create good neighbourly relation between India and Pakistan in accordance with the United Nations Charter. They reaffirm their obligation under the Charter not to have recourse to force and to settle their disputes through peaceful means.

They considered that the interests of peace in their region and particularly in the Indo-Pakistani sub-continent and, indeed, the interests of the peoples of India and Pakistan were

not served by the continuance of tension between the two countries. It was against this background that Jammu & Kashmir was discussed, and each of the sides set forth its respective position.

Trops Withdrawal

(II) The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that all armed personnel of the two countries shall be withdrawn not later than February 25, 1966, to the position they held prior to August 5, 1965, and both sides shall observe the cease-fire terms of the cease-fire line.

(III) The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that relations between India and Pakistan shall be based on the principle of non-interference in the internal affairs of each other.

(IV) The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that both sides will discourage any propaganda directed against the other country. and will encourage propaganda which promotes the development of friendly relations between the two countries.

(V) The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that the High Commissioner of India to Pakistan and the High Commissioner of Pakistan to India will return to their posts and that the normal functioning of diplomatic missions of both countries will be restored. Both Governments shall observe the Vienna Convention of 1961 on diplomatic intercourse.

Trade Relations

(VI) The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed to consider measures towards the restoration of economic and trade relations, communications, as well as cultural exchanges between India and Pakistan, and to take measures to implement the existing agreements between India and Pakistan.

(VII) The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that they give instructions to their respective authorities to carry out the repatriation of the prisoners of war.

(VIII) The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed both sides will continue the discussions of questions relating to the problems of refugees and eviction of illegal immigration. They also agreed that both sides will create conditions which will prevent the exodus of people. They further agreed to discuss the return of the property and assets taken over by either side in connection with the conflict

Soviet Leaders Thanked

(IX) The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that both sides will continue meetings both at the highest and at other levels on matters of direct concern to both countries. Both sides have recognised the need to set up joint Indo-Pakistani bodies which will report to their Governments in order to decide what further steps should be taken.

(X) The Prime Minister of India and the President of Pakistan record their feelings of deep appreciation and gratitude to the leaders of the Soviet Union, the Soviet Government and personally to the Chairman of the Council of Ministers of the USSR for their constructive. friendly and noble part in bringing about the present meeting which has resulted in mutually satisfactory results. They also express to the Government and friendy people of Uzbekistan their sincere thankfulness for their overwhelming reception and generous hospitality. They invite the Chairman of the Council of Ministers of the USSR to witness this declaration.

8

THE SIMLA AGREEMENT

The Government of Pakistan and the Government of India are resolved that the two countries put an end to the conflict and confrontation that have hitherto marred their relations and work for the promotion of a friendly and harmonious relationship and the establishment of durable peace in the subcontinent, so that both countries may henceforth devote their resources and energies to the pressing task of advancing the welfare of their peoples.

In order to achieve this objective, the Government of Pakistan and the Government of India have agreed as follows :

(i) That the principles and purposes of the Charter of the United Nations shall govern the relations between the two countries :

(ii) That the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon between them. Pending the final settlement of any of the problems between the two countries, neither side shall unilaterally alter the situation and both shall prevent of organisation, assistance and encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relations :

(iii) That the prerequisite for reconciliation, good neighbourliness and durable peace between them is a commitment by both the countries to peaceful co-existence, respect for each others territorial integrity and sovereignty and non interference in each other's internal affairs, on the basis of equality and mutual benefit ;

(iv) That the basic issues and causes of conflict which have bedevilled the relations between the two countries for the last 25 years shall be resolved by peaceful means :

(v) That they shall always respect each other's national

unity, territorial integrity, political independence and sovereign equality ;

(vi) That in accordance with the Charter of the United Nations they will refrain from the threat of use of force against the territorial integrity or political independence of each other.

Both Governments will take all steps within their power to prevent hostile propaganda directed against each other. Both countries will eoconrage the dissemination of sush information as would promote the development of friendly relations between them.

In order progressively to restore and normalise relations between the two countries step by step, it was agreed that :

(i) Steps shall be taken to resume communications, postal, telegraphic, sea, land including border posts, and air links including overflights.

(ii) Appropriate steps shall be taken to promote travel facilities for the national of the other country.

(iii) Trade and cooperation in economic and other agreed fields will be resumed as far as possible.

(iv) Exchange in the fields of science and culture will be promoted.

In this connection delegations from the two countries will meet from time to time to work out the necessary details.

In order to initiate the process of the establishment of durable peace, both the Governments agree that :

(i) Pakistani and Indian forces shall be withdrawn to their side of the international border.

(ii) In Jammu and Kashmir, the Line of Control resulting from the ceasefire of December 17, 1971, shall be respected by both sides without prejudice to the recognised position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally irrespective of mutual differences and legal interpretations. Both sides further undertake to refrain from threat or the use of force in violation of this Line.

(iii) The withdrawals shall commence upon entry into force

of this agreement and shall be completed within a period of 30 days thereof.

This agreement will be subject to ratification by both countries in accordance with their respective constitutional procedures, and will come into force with effect from the date on which the instruments of ratification are exchanged.

Both Governments agree that their respective Heads will meet again at a mutually convenient time in the future and that in the meanwhile, the representatives of the two sides will meet to discuss further the modalities and arrangements for the establishment of durable peace and normalisation of relations including the question of repatriation of prisoners of war and civilian internees, a final settlement of Jammu and Kashmir and the resumption of diplomatic relations.

ZULFIKAR ALI BHUTTO,
President, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN.
Simla, the 2nd July, 1972.
INDIRA GANDHI,
Prime Minister. REPUBLIC OF INDIA.

পরিশিষ্ট (ঘ)

[অতিরিক্ত আকর গ্রন্থের তালিকা]

1. Jammu and Kasmir—a select and annotated bibliography of manuscripts, books and articles.—Ramesh Chander Dogra /Ajanta Books International/1—UB, Jawahar Nagar, Bungalow Road, Delhi 110007.
2. Birth pangs of new Kashmir/ N. S. Phadke/ Hind Kitabs Ltd. – 1948.
3. Issues in Kashmir/A Thornor/Far Eastern Survey—Vol. 17/ Aug. 11, 1948.
4. The Kashmir dispute/Mark Finley/National Review—Vol. 133/October 1949.
5. Kashmir conflict/A. Thornor/Middle East Journal/Vol.—3/ January 1949.
6. Kashmir dispute and the Communist drive : a cloud on the international horizon/Frank Brown/Commonwealth and Empire Review/ Vol 84/April 1950.
7. The Kashmir Problem/Nawaz M. Khader/Indian Year Book of International Affairs/Vol. 2/1953.
8. Kashmir/Sudhansu Bimal Mukherjee/Modern Review/Vo . 98(5)/Nov, 1955.
9. The Kashmir deadlock : suggestions for a solution/Charles Lewis/ New Commonwealth/3 Feb 1958.
10. Mountbatten and Kashmir/Mainstream/ Vol. 2 (25)/Feb 22 1964.
11. Kashmir : Peace at what price/K. R. Sunder Rajan/New Statesman/Vol 95/14 March 1975.
12. Accession of Kashmir to India (the inside story)/ Mehr Chand Mahajan/Sholapur Institute of Public Administration—1950.

13. Looking back/Mehr Chand Mahajan/London, Asia Publishing House—1963.
14. The Kashmir Question to-day/Sisir Gupta/International Studies/Vol. 6(3) Jan. 1965.
15. Objects behind the invasion of Kashmir/Nanimadhav Choudhuri/Modern Review/Vol. 82/Dec. 1947.
16. I report on Kashmir'/J. K. Banerjee/The Republic Publications—1948/Calcutta.
17. 'Kashmir ; alternative solution'/B. Shivarao/Swarajja/Vol 8 (50)/13 June, 1964.
18 What is wrong with Kashmir Policy ?'/Balraj Puri/Sarva Seva Sangh-Newsletter/Vol 2(3)/March 1968.
19. Kasmira gras Karar Janya Pakistaner nutan Prachesta/ Translated from English into Bengali/Ministry of Information and Broadcasting Publications Division 1965/Delhi.
20. Kashmir (Problem)/General Sir Frank Messervy/Asiatic Review/Vol 45/Jan 1949. (The Author was the Commander-in-chief of Pakistan Army upto '48)
21. Story of Kashmir—1947-65/Deptt. of Films and Publications, 1965/Pakistan.
22. Indian conflict comes before Council/United Nation News (New York) Vol 3/Feb '47.
23. The Struggle for Kashmir/Michael Bveacher/ New York : Oxford University Press. 1953.
24. Kashmir : A Study in Indo-Pakistan Relations/Sisir Gupta/ New Delhi : Asia Pub. House 1966.
25. Counter Terrorism : The Pakistan Factor/Major General Afsir Karim/New Delhi : Lancer International, 1991.
26. The Kashmir Problem ; A Historical Survey/A Lastair Lamb/New York and Washington : Praeger, 1966.
27. The Hindu History of Kashmir Susil Gupta/Calcutta 1960.
28. Gulab Sing : The Founder of the Kashmir State/K. M. Pannikar.
29. The Emergence of Pakistan/Choudhuri Mohammed Ali/ New York : Columbia University Press 1967.

30. Ancient Monuments of Kashmir/Ram Chandra Kak, London 1933.
31. Essential Documents & Notes on Kashmir/P. L. Lakanpal/ International Publications/New Delhi—1958.
32. Kalhana, Rajatarangini, Ed. M.A. Stein, Bombay, 1892.

পরিশিষ্ট (ঙ)

[নামসূচি]

পরিশিষ্ট (ছ)

[সংশোধনী]

পৃষ্ঠা	লাইন (উপর থেকে)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১	পৌর বংশ	পৌরব বংশ
৭২	৩২	১৮১৬ খ্রীষ্ট্যব্দ	১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ
৮৭	৩২	সংখ্যাকোষ	মংখ্যাকোষ
৯৪	২২, ২৩	পারিপার্বিক	পারিপার্শ্বিক
৯৭	৩১	হেমিসে	হেমিস
৯৮	১১	দিলেন	ছিলেন
১০৮	২১	তুষাঅনলে	তুষানলে
১২৫	১৭	দেশীর	দেশীয়
১৩২	২০	নিশ্চিন্ত	নিশ্চিত
১৩৬	২০	খোক্ষস	খোক্কস
১৪২	৩৩	হিন্দুর	হিন্দু

[সংযোজনী]

২৩ (ক) সিন্ধবংশ শেষে নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত হবে ঃ

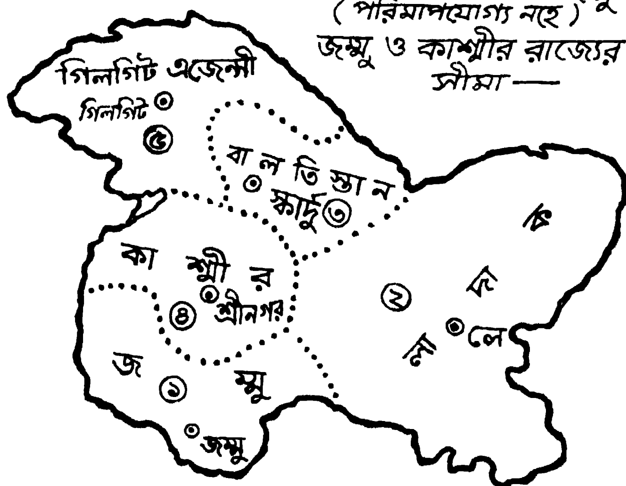
"(৯) বসুনন্দ (১০) নর দ্বিতীয় (১১) অক্ষ (১২) গোপাদিত্য (১৩) গোকর্ণ (১৪) নরেন্দ্রাদিত্য (১৫) যুধিষ্ঠির।"


মহাভারতীয় যুগ
পাণ্ডব সাম্রাজ্য
আনু: ২৪০০ খ্রী: পূ:
রাজধানী: ইন্দ্রপ্রস্থ
(পরিমাপযোগ্য নহে)
গান্ধার
কাশ্মীর
কেকয়
কিম্পুরুষবর্ষ
মদ্র
কুরু
সিন্ধু
মৎস
ইন্দ্রপ্রস্থ
কোশল
অঙ্গ
বঙ্গ
তাম্রলিপ্ত
কামরূপ
ভোজ
উৎকল
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
কেরল
পাণ্ড্য
পাণ্ডব
সাম্রাজ্যের সীমা —
মানচিত্র নং ১


মৌর্য যুগ
অশোকের সাম্রাজ্যের অধীনে
কাশ্মীর
আনু: ২৭২ খ্রী: পূ: —২৩৩ খ্রী: পূ:
রাজধানী : পাটলিপুত্র
(পরিমাপযোগ্য নহে)
ব্যাকট্রিয়া
কাশ্মীর
কান্দাহার
মাকরান
ইন্দ্রপ্রস্থ
পাটলিপুত্র
উজ্জয়িনী
তাম্রলিপ্ত
সৌরাষ্ট্র
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
কেরল
চোল
পাণ্ড্য
মানচিত্র নং ২
অশোকের
সাম্রাজ্যের সীমা


মোঘল যুগ
ঔরঙ্গজীবের সাম্রাজ্যের
অধীনে কাশ্মীর
১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ
রাজধানী: দিল্লী
(পরিমাপযোগ্য নহে)
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
লাহোর
যোধপুর
দিল্লী
সিন্ধু
গুজরাট
বিহার
বাংলা
মাণ্ডু
উড়িষ্যা
বেরার
বিজাপুর
ভেলোর
ঔরঙ্গজীবের
সাম্রাজ্যের সীমা —
মানচিত্র নং ৩

ডোগরা হিন্দু অধিকারে কাশ্মীর
১৮৬৪ — ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ
রাজধানী : শ্রীনগর ও জম্মু
(পরিমাপযোগ্য নহে)



① ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোলাব সিং কর্তৃক মহারাজা রণজিৎ সিং-এর নিকট জায়গীর হিসাবে প্রাপ্ত।

② রাজা গোলাব সিং কর্তৃক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত।

③ রাজা গোলাব সিং কর্তৃক ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত।

④ রাজা গোলাব সিং কর্তৃক ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর চুক্তিমূলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যে খরিদ।

⑤ মহারাজা প্রতাপ সিং কর্তৃক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত।

মানচিত্র নং ৪



পাক ও চিন অধিকৃত
ভারত
(পরিমাপযোগ্য নহে)
১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ
চিন
অধিকৃত
ভারত
শ্রীনগর
সিন্ধু
চন্দ্রভাগা
পাক
জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমা ——
পাক যুদ্ধবিরতি রেখা -•-•-•-•
চিন যুদ্ধবিরতি রেখা ------

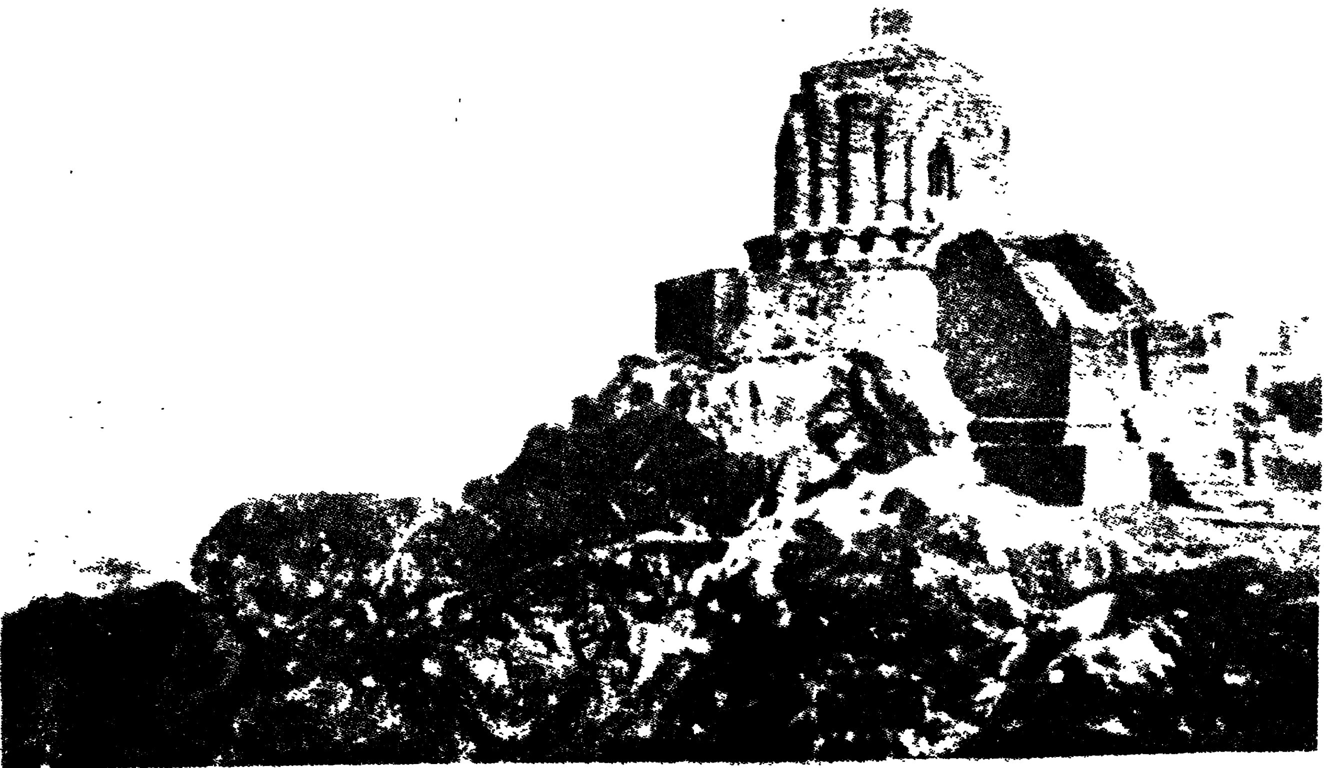
মানচিত্র নং ৫

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের
আন্তর্জাতিক অবস্থান
(পরিমাপযোগ্য নহে)



মানচিত্র নং ৬

আন্তর্জাতিক
সীমারেখা —



১. শঙ্করাচার্য মন্দির, তখ্‌ত-ই-সুলেমান পর্বত।



২. সিদ্ধার্থের জন্ম, পাণ্ড্রে থান



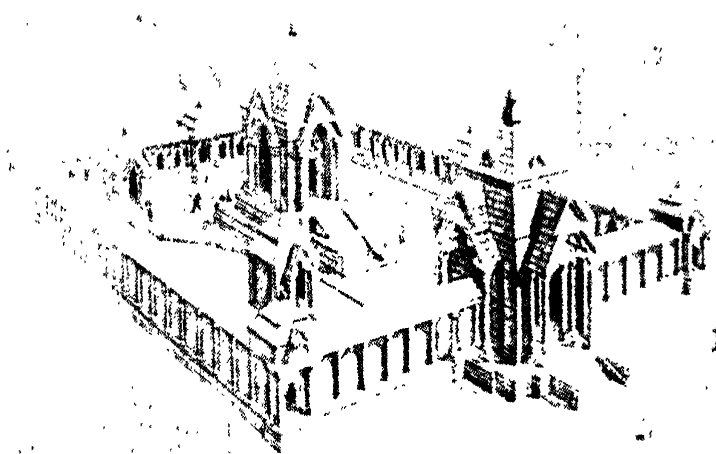
৩. রতি ও প্রীতির মধ্যে উপবিষ্ট কামদেব, অবন্তিপুর



৩. মার্তণ্ড মন্দির, মাতং



৫. অবন্তিস্বামীর মন্দির, অবন্তিপুর।



৬. অবন্তিস্বামী মন্দিরের নক্সা।



৭. মাউন্টব্যাটেনের ভারতে আগমন, (বাঁদিক থেকে—মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু ও লিয়াকৎ আলী)।



৮. ১৫ আগস্টের অনুষ্ঠানে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পাশে রাজেন্দ্রপ্রসাদ।



৯. ১৪ আগস্টে পাকিস্তানের জন্মদিনে লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেন এবং জিন্না ও ফতিমা জিন্না।



১০. লর্ড মাউন্টব্যাটেন, গান্ধী ও লেডি মাউন্টব্যাটেন।